علامہ اقبال

(مجموعہ مقالات)

1

(بنگالی)

19>9

علامہ اقبال

আল্লামা ইকবাল

NOV. 1989

(1)

GIFT

আল্লামা ইকবাল
علامہ اقبال

নবেম্বর ১৯৮৯ نومبر ۱۹۸۹

সম্পাদনা কমিটি مجلس ادارت

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (চেয়ারম্যান) ڈاکٹر سید سجاد حسین

অধ্যাপক শাহেদ আলী شاہد علی

এস. মুজিবউল্লাহ ایس ایم مجیب اللہ

প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমান کے اے رحمن

প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ حسین احمد

সৈয়দ তোসারফ আলী سید تشرّف علی

আবদুল ওয়াহিদ عبدالواحد

মূল্যঃ ৫০ টাকা
২ ডলার

প্রকাশনায়

আল্লামা ইকবাল সংসদ
১০৯, নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা

IQBAL ACADEMY PAKISTAN LIBRARY. LAHORE. Acc No. 30997

মাসরো প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৪৩/১, আরামবাগ হতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

পৃষ্ঠা

১. আমাদের কথাঃ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ৫
২. ইকবাল দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তা ঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ৬
৩. আল-কুরআনের দৃষ্টিতে ইকবালের দর্শনঃ ডঃ আবু সাঈদ নুরুদ্দীন ১২
৪. ইকবাল দর্শনের একটি দিকঃ আবদুল মান্নান তালিব ২১
৫. বিশ্বমানবতার কবি ঃ নূরুয্যমান ২৩
৬. ইকবালের কাব্য দর্শন ঃ প্রফেসরঃ আঃ আঃ আজিজ উল্যাহ ২৮
৭. ইকবালের দৃষ্টিতে পরাধীনতা প্রফেসর ঃ এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ ৩৪
৮. আমরা ইকবালকে বুঝতে চাই ঃ সৈয়দ তোশারফ আলী ৩৮
৯. স্যার সৈয়দ আহমদ ও ডঃ ইকবাল ঃ কানিজ-ই-বাতুল ৪২
১০. ইকবাল সাহিত্যে নও-মুসলিম প্রসঙ্গ ঃ মোহাম্মদ সাখি মিঞা ৪৮
১১. ইকবাল দর্শনের কয়েকটি দিক ঃ সৈয়দ নসরুল আহসান ৫৪
১২. মোজাদ্দেদে আলফেসানী ও ইকবালের চিন্তার সামঞ্জস্যতা ঃ মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহ ৫৬
১৩. ইকবালের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ ঃ এ. বি. এম. সালেহ উদ্‌দীন ৫৮
১৪. পস্‌চহ্ বায়দ্ করদ্ ...এডভোকেট এ.এম.এম আবদুল জলীল ৭১

অনুবাদ প্রবন্ধ

১৫. ইকবাল ও আধুনিক শিক্ষা ৭৫
মূলঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী
প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমান অনূদিত
১৬. ইকবাল কাব্যঃ আল-কোরআনের ব্যাখ্যা ৮৫
মূলঃ ডক্টর মুহাম্মাদ বাকের
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম অনূদিত

অনুবাদে ইকবাল

১৭. আবদুস সাত্তারঃ সৌন্দর্যের মর্মকথা ৯৪
১৮. ফারূক মাহ্‌মুদ ঃ যরব-ই-কালীম থেকে ৯৫
x জওয়াবে শেকোয়া ঃ গোলাম মোস্তফা অনূদিত

পুনর্মুদ্রণ

১৯. ইকবাল-প্রসঙ্গ ঃ ফররুখ আহমদ ৯৬
২০. রেনেসাঁ আন্দোলনঃ ইকবাল-নজরুলের প্রভাব ঃ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্যাহ ১০৩
২১. ঐক্য, সংহতি ও সংগঠন মূলঃ ডঃ মুহাম্মদ ইকবালঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত ১১২

সাক্ষাৎকার

২২. আবুল হোসেনের দৃষ্টিতে ইকবাল ১৩০

২৩. ইকবাল প্রসঙ্গঃ তালিম হোসেনের মুখোমুখী ১৩৬

English Articles

24. TWO-NATION THEORY ১৪২
Advocate Mujibur Rahman

25. English Abstract of Articles in Bengali ১৫৯
Dr. Syed Sajjad Husain

রিপোর্ট

২৬. আল্লামা ইকবাল সংসদ [১৯৮৬–১৯৮৯] –আবদুল ওয়াহিদ ১৬১

পুস্তক সমালোচনা

২৭. মহানবী হযরত মুহাম্মদ ১৭৩
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
রচনাঃ আল মাহমুদ
সমালোচনাঃ মোজ্জাম্মেলুল হক

২৮. ফররুখ আহমদ ১৭৪
রচনাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ
সমালোচনাঃ শরীফুল মুজাহিদ

যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনঃ উপদেষ্টা, চেয়ারম্যান, সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফঃ সংসদ সভাপতি, বিশিষ্ট দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, লেখক ও বুদ্ধিজীবী

ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীনঃ ইকবাল স্কলার সংসদ উপদেষ্টা

আবদুল মান্নান তালিবঃ সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী ও কলম

নূরুযযমানঃ প্রবীণ সাংবাদিক, প্রবন্ধকার

প্রফেসর আঃ আঃ আজিজ উল্যাহঃ লেখক, শিক্ষাবিদ

প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদঃ সংসদ সহসভাপতি,

সহযোগী অধ্যাপক, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

মোহাম্মদ সাবি মিঞাঃ সমাজসেবী, ব্যবসায়ী

কানিজ-ই-বাতুলঃ লেকচারার, উর্দু ডিপার্টমেন্ট. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সৈয়দ নসরুল আহসানঃ ইঞ্জিনিয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক, ইকবাল সংসদ

মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহঃ ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ. বি. এম. সালেহ উদ্দীনঃ অনুবাদক, প্রবন্ধকার ও সমালোচক

সৈয়দ তোসারফ আলীঃ সংসদ উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক

প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমানঃ লেখক, অনুবাদক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সংসদ উপদেষ্টা

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামঃ এসিষ্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

আব্দুল ওয়াহিদঃ সেক্রেটারী জেনারেল আল্লামা ইকবাল সংসদ, ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফররুখ আহমদঃ মরহুম, রেনেসাঁসের কবি, নকীব

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহঃ কবি, লেখক, অনুবাদক, পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট

সৈয়দ আবদুল মান্নানঃ মরহুম, লেখক, অনুবাদক

আবদুস সাত্তারঃ কবি, লেখক, অনুবাদক

ফারুক মাহমুদঃ কবি, লেখক, অনুবাদক

তালিম হোসেনঃ কবি, লেখক, অনুবাদক, চেয়ারম্যান, নজরুল একাডেমী

আবুল হোসেনঃ কবি, লেখক, অনুবাদক, কো-অর্ডিনেটর, ডায়াবেটিক হাসপাতাল

Mujibur Rahman: Senior Advocate, Bangladesh Supreme court

Dr. Syed Sajjad Husain: Former vice-chancellor, Rajshahi and Dacca universities.

মোজ্জাম্মেলুল হকঃ ইকবাল সংসদ অফিস সেক্রেটারী, ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শরীফুল মুজাহিদঃ অনুবাদক, লেখক, সমালোচক, ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের কথা

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

আল্লামা ইকবাল সংসদ-এর গত সংখ্যা (এপ্রিল ১৯৮৯) প্রকাশনা [Iqbal Studies] ইংরেজিতে প্রকাশ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বহির্বিশ্বকে বাংলাদেশে ইকবাল চর্চা সম্বন্ধে অবহিত করা। আমরা যে সাড়া পেয়েছি তাতে সংসদের উদ্যোক্তারা খুবই উৎসাহিত বোধ করেছেন। অনেক অভিনন্দন পাওয়া গেছে। ধারণা করা অসঙ্গত হবেনা যে, সংসদের কর্মসূচীতে বহু ব্যক্তির নৈতিক সমর্থন আছে। ইকবাল এবং তাঁর সাহিত্য ও দর্শন যে রাজনৈতিক বা অন্য কোন প্রকারের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে একথা এদেশে আগে যেমন অনুভব করতেন এখনও অনেকে করেন।

বর্তমান সংখ্যার বিশেষ উদ্দেশ্য তরুণ বাংলাভাষী পাঠক যারা ইংরেজি ভালো করে বুঝতে পারেন না তাদের কাছে ইকবাল সাহিত্যের মর্ম উপস্থাপিত করা।

ইকবালের মত কবির সাহিত্য কর্ম বহু দিক থেকে বিবেচনা করা সম্ভব এবং সঙ্গতও। তিনি কবিতাকে তাঁর দর্শনের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন, একথা সত্য হলেও কবি হিসাবে তাঁর যে পরিচয় সেকথা কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তাঁর কাব্য সম্যকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে ফারসী এবং উর্দূ কাব্যের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে সজাগ হওয়া প্রয়োজন। সে ঐতিহ্য, বিশেষ করে ফাসীর ক্ষেত্রে বহুদূর প্রসারিত। বর্তমান যুগে যাঁরা ফার্সী পাঠ ছেড়ে দিয়েছেন–এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁরা যে দৃষ্টিতে ইকবালকে বিচার করেন সেটা অবশ্যম্ভাবীরূপে খণ্ডিত দৃষ্টি।

ইংলন্ড বা ফ্রান্সে কবি-সাহিত্যিক যাঁরা গ্রীক, ল্যাটিন চর্চা করতেন তাদের ইংরেজি বা ফরাসী রচনা যেমন নানা ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ তেমনি, ইকবালের কবিতায় বহু ইঙ্গিত উপস্থিত যার অর্থ শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিরা উদ্ধার করতে পারেন। এটা গ্রীক এবং রোমান পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিতের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয় উপমা-উৎপ্রেক্ষায় শব্দ চয়নের মধ্যে ক্লাসিকাল কাব্যের ছায়া এসে তাকে নতুন ব্যঞ্জনায় আলোকিত করে। মিলটনের বা শেলির *কাব্য* যাঁরা পড়েছেন অথবা ড্রাইডেন এবং পৌপের ব্যঙ্গ কবিতা বা satire-এর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে, এ সমস্ত রচনায় এমন অনেক শব্দ বা উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে যার মধ্যে প্রাচীন কবিদের পদধ্বনি শোনা যায়। যাঁরা সে সম্বন্ধে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল নন তাঁরা এসব কবিতার রসও পুরাপুরি গ্রহণ করতে অপারগ। মিলটন এবং শেলী ELEGY বা মর্সিয়া লিখেছেন গ্রীক কবি BION-এর একটি এলিজিকে সামনে রেখে। অনুকরণ করেননি। কিন্তু BION-কে মজ্জাগত করে ইংরেজি শব্দের দ্বারা অনুরূপ এলিজি সৃষ্টি করেছেন।

এ রকমের বহু তুলনার সঙ্গে সকলেই পরিচিত। বাংলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ইকবালের পেছনে রয়েছে ফার্সী কাব্যের প্রভাব। তিনি নিজেও ফার্সীতে কাব্য চর্চা করেছেন রুমী, হাফিজ ও সাদী প্রমুখ কবিরা যে সমস্ত শব্দকে নতুনভাবে বাঙময় করে তুলেছিলেন সেগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে তাঁর রচনার গভীরতর স্তরে যে অর্থ নিহিত তা আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। এই অর্থ উন্মোচিত করে সাধারণ পাঠককে সচেতন করার দায়িত্ব পণ্ডিতবর্গের।

আল্লামা ইকবাল সংসদ-এর প্রকাশনার মাধ্যমে তাঁরা এ কাজ করতে এগিয়ে আসছেন-এটা সংসদের জন্য যেমন শ্লাঘার কথা তেমনই সাহিত্য ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যে অবিরাম সংগ্রামের প্রয়োজন সে সংগ্রামে সাফল্যের পথ এই প্রক্রিয়ায় সুগম হচ্ছে।

আমরা আশা করি, আল্লামা ইকবাল সংসদ এ ব্যাপারে সাহিত্যিক এবং সাহিত্য রসিক সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করবে।

ইকবাল দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তা

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

আধুনিক জগতে রয়েছে এক মস্ত বড় দ্বন্দ্ব। একালে বিজ্ঞানের গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কল্পিত রূপের সঙ্গে আদর্শিক জগতের দেখা দিয়েছে ভীষণ দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞান বা তার আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির দৌলতে মানব সভ্যতা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মানব জীবনকে আপাতত নানাবিধ সুখ-সমৃদ্ধি দানে মহাউল্লাসের সহিত সমর্থ হয়েছে। বিজ্ঞানের বা তার প্রয়োগের এ সাফল্য সম্পূর্ণই মানব-জ্ঞানের প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল। অথচ মানব জীবনে কতকগুলো ধারণা, আদর্শ বা মূল্যমান স্বীকার না করে এবং এদের কার্যকারিতাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ না করলে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো মানব জীবনে ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হতে পারে। এজন্য আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল মানব-সভ্যতার উদ্দেশ্যে একটা অমূল্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

"বিজ্ঞানকে জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত মনে করলে অবশ্য তাকে মূল্যমানের ক্ষেত্রে স্থান দান করা যায় বটে, তবে মূল্যমানের ক্ষেত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে বহির্ভূত। শক্তির অন্বেষা হিসাবে বিজ্ঞানের পক্ষে মূল্যমানের পরিধিতে অনধিকার প্রবেশ উচিত নয় এবং বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল যদি মানব-জীবনকে সমৃদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে তার পক্ষে যে লক্ষ্যের সেবা করা উচিত তাকে ওজন করা কিছুতেই উচিত নয়"। *

এজন্যই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েছে এক বিপত্তি। ধর্ম ও নৈতিকতা মানব জীবনে যেসব মূল্যমানগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এখনও যেগুলোর কার্যকারিতা মানব জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলোর প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেই বিজ্ঞান তার আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তড়িৎ গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। অথচ সে মূল্যমানগুলোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অথচ এগুলো মানবজীবনের রক্ষক হিসাবেই অবশ্য প্রতিপালনীয়। এতেই দেখা দিয়েছে বর্তমান সভ্যতায় এক ভীষণ দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানের অবদানকে অস্বীকার করে জীবনে তার প্রয়োগ না করলে মানব সভ্যতায় এক স্থিতাবস্থা দেখা দেবে, আবার এগুলোর সঙ্গে যোগ রেখে বিজ্ঞান্ তার কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে না।

মূল্যমানগুলো আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। জ্ঞানকে একটা মূল্যমান হিসেবে বহু পূর্বেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুদূর অতীতে গ্রীক দর্শনের গুরু সক্রেটীস ঘোষণা করেছিলেন - Knowledge is virtue জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষ সমার্থবাচক। তার মতবাদ অনুসারে

* *Bertrand Russell - The Scientific Outlook - P 21-22*

জ্ঞানলাভ হলেই মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ লাভ হয়। এজন্য জ্ঞানকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞানের এ ব্যাপক অর্থের মধ্যেই ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শও বর্তমান। এ দুটো পরিধির অন্তর্গত মূল্যমান সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা, এগুলোকে মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আবার অপর একটা বিষয়ের আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। যেসব মূল্যমানের উল্লেখ করা হয়েছে– সেগুলো যদি সতত ও স্বাভাবিকভাবেই মানব জীবনে স্বতন্ত্র থেকে যায়– তাহলে তাদের একের পক্ষে অপরের প্রভাব বিস্তার কি করে সম্ভবপর হবে? পূর্বেই দেখা গেছে, দুটো বিষয়ই মানব জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানব জীবনের অগ্রগতি যেমন বিজ্ঞানের অনুশীলন ব্যতীত হতে পারে না– তেমনি মানব জীবনে নৈতিক বা ধর্মীয় মূল্যমানের স্বীকৃতি ব্যতীত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। এজন্য এ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভবপর কি–না এবং উভয়ের মধ্যে একটা সমঝোতা সম্ভবপর কি–না তাও ভেবে দেখবার বিষয়। ইকবালের জীবনে তাই দেখা দিয়েছিল একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা। আপাতঃদৃষ্টিতে এ দুনিয়ায় অবহেলিত ও অবজ্ঞাত মুসলিম সমাজের রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণের কবি হিসাবে দেখা দিলেও তাঁর জীবন বিকাশের পরিণতি তিনি এক মহান চিন্তা–নায়ক হিসাবে দর্শনের নানা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রেখে গেছেন। পূর্বোক্ত বিজ্ঞান ও নৈতিক জীবনের দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে তিনি প্রত্যক্ষ আত্মনিয়োগ না করলেও আদিসত্ত্বা জগৎ, মানবাত্মা ও জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ধারণার যে অবদান রেখে গেছেন, তা থেকে আমরা আমাদের জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে সফল হতে পারি। এসব ধারণার মধ্যেই রয়েছে নানাবিধ মূল্যমান– যেগুলোর স্বীকৃতি মানব সভ্যতা রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য।

আদি সত্ত্বা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণভাবে কুরআন–উল–করীম থেকে গৃহীত। পরম শক্তিশালী, পরম শুভানুধ্যায়ী, সর্বশক্তিমান এক, অদ্বিতীয় ও সার্বভৌম– এক অনন্ত সৃষ্টিধর্মী স্বজ্ঞান সত্তার যে ধারণা কুরআন–উল–করীমে ব্যক্ত হয়েছে এবং এ দুনিয়া সৃষ্টি করাতে তার উদ্দেশ্য স্বরূপ বলা হয়েছে– তিনি এ দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেই এ দুনিয়া তথা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এ ধারণার মধ্যে অনন্ত সৃষ্টিশীলতা বা এ দুনিয়ায় মানুষকে তার প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ধারণা সম্পূর্ণভাবে কুরআন–উল–করীম কর্তৃক এ দুনিয়ায় আনীত ও প্রচারিত হয়েছে। তার পূর্বে সেমেটীক ধর্মগুলোতে গড (God)-এর যে ধারণা ছিল তাতে তাকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে কর্মশীলতার ধারণাও যুক্ত ছিল– মানুষকে সৃষ্টি করা যে উদ্দেশ্যমূলক তা–ও ছিল। তবে, গ্রীক দর্শনের প্রভাবে সে ধারণার মধ্যে স্থানুত্ব বা staticity দেখা দিয়েছিল। অধ্যাপক আলেসেন্দ্রো বৌসানী সত্যিই বলেছেনঃ

(এরূপে) অর্থাৎ আল্লাহর আদর্শ বা (স্থান) গ্রহণ করে কোরআনের ভাষায়– *"পৃথিবীতেআল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হয়ে মানুষ বিপুল বিপ্লবী শক্তির বিকাশ সাধন করতে পারে এবং তা সত্ত্বেও নাস্তিক্য ও নৈরাজ্যমূলক আন্দোলনের প্রচন্ড দুষ্ট বিস্ফোরণ এড়িয়ে চলতে পারে। মানুষ এভাবে বিজ্ঞান সৃষ্ট মুল্যবোধের সভ্যতার বদলে মুল্যবোধের একটা সহজ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে পারে।"**

বর্তমানে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রয়োগের সঙ্গে মানব জীবনের স্থায়িত্বের যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে– তার নিরসনকল্পে আমরা কুরআন–উল–করীম থেকে গৃহীত ইকবালের এ সমাধানকে অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করতে পারি। কুরআন–উল–করীমে এ জগৎ ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, আল্লাহ এ দুনিয়ায় তার শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে তার প্রতিনিধি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার উপযুক্ত প্রতিনিধির গুণাবলী আত্মস্থ করা। এজন্য আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, '*তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ"*– আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও। আল্লাহর রয়েছে নিরানব্বই নাম– রাহমান, রাহীম, কারীম, জাব্বার, মালিক ইত্যাদি। এগুলোকে মানুষ তার জীবনে সম্পূর্ণভাবে না হোক আংশিকভাবেও একাত্ম করতে পারলে তার পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধিস্বরূপ এ বিশ্বে আল্লাহরই বিধানকে প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা সম্ভব। এ গুণাবলীগুলো মানুষ আয়ত্ত করতে সক্ষম হলে তার জীবনে দেখা দেবে করুণা, মমতা, দয়া, মায়া, ন্যায়বোধ প্রভৃতি গুণাবলী। সেগুলোর প্রতিষ্ঠা হলে মানুষের পক্ষে মানুষের জীবনে অমঙ্গলের কোন চিন্তাই আসতে পারে না। মানুষ মানুষকে কোন মতেই হিংসা বা বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখতে পারবে না। তাকে আপন ভাই– আপনজন বলেই গণ্য করবে। সে কুরআন–উল–করীমেই মানুষকে আল্লাহর নানাবিধ গুণাবলীর মধ্যে সতত সৃষ্টিশীলতামূলক এক গুণের অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। '*আল্লাহ এমন কোন ক্ষণ নেই– যে সময় তিনি সৃষ্টিতে বিরত রয়েছেন'।* আল্লাহর এ গুণ মানব–জীবনে আয়ত্ত হলে তাকেও আজীবন নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে সৃষ্টিকুশল হতে হবে। সে তার এ কুশলতা বিজ্ঞান, কলা, স্থাপত্য, শিল্প প্রভৃতি মানব–সংস্কৃতির নানাক্ষেত্রে প্রকাশ করবে। তবে যেহেতু তার মধ্যে কেবল সে সৃষ্টিকুশলতার গুণই বিকশিত হবে না– সঙ্গে সঙ্গে প্রেম, দয়া, মায়া, করুণা প্রভৃতি নানাবিধ গুণাবলী বিকশিত হবে, সে জন্য তার পক্ষে আল্লাহর সৃষ্ট নানা জাতীয় জীব, নানা শ্রেণীর বৃক্ষাদি, পশু–পক্ষী ও সর্বোপরি তার একই রক্তের মানুষের বিনাশে সে কিছুতেই অগ্রসর হবে না। এ দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে মানুষ তার সৃষ্টিকুশলতার গুণে যা কিছু সৃষ্টি করে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে মানুষ সেগুলোকে রক্ষা করবে। এভাবে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার জন্য তার জীবনে যদি সত্যিকার সাধনা দেখা দেয়, তাহলে আল্লার গুণাবলীকে তার জীবনে রূপায়িত করার সাধনার মধ্যেই তার পক্ষে একদিকে সৃষ্টিকুশলতা, অপরদিকে মূল্যবোধের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা দেখা দেবে। তার ফলে তার জীবনে বৈজ্ঞানিক

* *ইকবাল ঃ তার ধর্ম–দর্শন ও প্রতীচ্য– অধ্যাপক আলেসেন্দ্রো বৌসানী*

আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ যেমন সহজ হয়ে পড়বে, তেমনি সে আবিষ্কারগুলোকে সে কেবল মানব–জীবনের কল্যাণের জন্য নয়, আল্লাহর সৃষ্ট যাবতীয় বিষয়ের, সকল শ্রেণীর জীবের কল্যাণের জন্য তার প্রয়োগ করবে।

প্রকৃতপক্ষে মানব–জীবনের জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অত্যন্ত সংকোচিত করার দরুনই বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের, সৃষ্টির সঙ্গে তার প্রয়োগের এ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। দার্শনিক জগতে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে শুধুমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও যুক্তির পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ফলে প্রত্যক্ষের মধ্যে যা প্রতিভাত হয় এবং তার উপকরণের ভিত্তিতে যুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান যে পর্যন্ত বিস্তারিত হতে পারে, তাকেই জ্ঞানের একমাত্র পরিধি বলে গণ্য করে, মানব–মানস জীবনের উচ্চতর মানগুলো সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারে না। যে সত্তার বদৌলতে মানব–জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি সেগুলো সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যাই। পুরাকালীন দর্শনে প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বে তার আভাস পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে প্লাটিনামের দর্শনে সে স্বজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞান লাভের চেষ্টা ও অনুশীলন হলেও মধ্যযুগে পন্ডিতী বিদ্যার প্রাধান্যের সময় স্বজ্ঞা সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয়নি। আধুনিক দর্শনে স্পিনোজাই সর্বপ্রথম স্বজ্ঞাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেন। তার পরবর্তী দার্শনিক ক্যান্ট তাকে জ্ঞানের অপরিহার্য স্তর বলে স্বীকার করলেও সে সম্বন্ধে পৃথকভাবে কোন আলোচনা করেননি। অতঃপর ফিকটে, শেলিং প্রমূখ দার্শনিকগণ স্বজ্ঞাকে বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনিবার্যতা সম্বন্ধে ততো গুরুত্ব আরোপ করেননি। বিংশ শতাব্দীতে তাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তত্ত্বজ্ঞানী বের্গসঁ, ডীন ইং ও ক্রোচে। তাদের মধ্যে বের্গসঁ–ই স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের একটা পৃথক মাধ্যম বলে প্রদর্শন ক'রছেন এবং কিভাবে স্বজ্ঞার মাধ্যমে মানুষ কোন বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষাৎ সরাসরি ও বিশ্লেষণের অতীত জ্ঞান লাভ করতে পারে তার পদ্ধতিও প্রদর্শন করেছেন। ইকবাল বের্গসঁ'র সঙ্গে একমত হয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার কার্যকারিতা ও অপরিহার্যতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে সে সম্বন্ধে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বের্গসঁ'র মত স্বজ্ঞাকে মানব দেহেরই একটা জ্ঞানের মাধ্যম বলে স্বীকার করেননি; তার মতে, স্বজ্ঞার পটভূমি হল কল্ব বা হৃদয়। তাতেই একদিকে যেমন নিজের খুদী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়– তেমনি এ জগৎ ও স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ সম্বন্ধেও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হলে নিশ্চয়ই আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ হবে এবং সে গুণাবলীগুলো একাধারে আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের মাধ্যম ও মূল্যমানও বটে। কাজেই তার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হলে তার গুণাবলীর মাধ্যমে মানুষ মূল্যমান সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করে প্রকৃত মানুষ বা ইনসান–ই–কামিল হয়ে এ দুনিয়ায় সে মূল্যমানগুলো প্রতিষ্ঠিত করবে। তার ফলে বৈজ্ঞানিক বা যে কোন আবিষ্কার হোক না কেন– সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হলে, সে জ্ঞানকে মানুষ মানব–ধ্বংসী অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারবে না।

** Abul Hashim - As I see it, published by the Islamic Foundation, Dhaka.*

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরবের বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অপূর্ব অবদান। এ বিজ্ঞানের বদৌলতে প্রতীচ্য আজ বিশ্ব-নিখিলে তাদের জয়-গৌরব ঘোষণা করছে। তারা জগৎস্বামীকে তাদের কৃতকার্যের ফল প্রদর্শন করে স্থান-কালের ব্যবধানকে সংকোচিত করে প্রকৃতির উপর তাদের প্রাধান্য বিস্তার করছে। তাতে একদিক দিয়ে মানব-জীবনের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে। তবে, সে বিজ্ঞানের অবদানকে ইউরোপবাসী মানবকুল ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহার করছে। বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের শেষ সীমায় তারা মানব-ঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে বিজ্ঞানের অবদানগুলোর চরম অবমাননা করেছে। তাকে রোধ করতে হলে- মূল্যমান তথা মূল্যমানের আধার আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি প্রগাঢ় প্রত্যয়ের প্রয়োজন। আল্লাহর এ বিশ্ব-সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন। মানুষে মানুষে প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার মূল্যমানগুলোর প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইকবাল আজীবন তাঁর নানাবিধ কবিতায় ও গদ্য রচনায় সে মানব প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

জনাব মুহাম্মদ আলী আল হাবরূখ সত্যিই বলেছেন, 'বর্তমান ইউরোপীয়রা জীবনের বস্তুধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আচ্ছন্ন। তাদের মধ্যে মানবাত্মাও অন্তরানুভূতির আকুতি মৃতপ্রায়। তারা কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ স্বীকার করে না। কারণ তারা মনে করে যে, এসব ব্যাপার নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। চিন্তার রাজ্যে আজকের ইউরোপবাসী নিজের মধ্যে এবং অন্যের রাজ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্বে কালহরণ করছে।' সে আজ নিজের স্বার্থ এবং পাশবিক আনন্দের প্রবণতাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সে আজ বস্তু বৈভবে সম্মোহিত এবং বাস্তবের প্রসাদ লাভ করবার প্রয়াস তাকে পদে পদে দুঃখ ও দুর্দশার আবর্তে আপতিত করছে*-এমানবঘাতী পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে ইকবালের জীবন দর্শন গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি তাঁর কলব বা ফুয়াদে প্রকটিত সত্যের যে সন্ধান পেয়েছিলেন- তাতে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে গ্রহণ করেছিলেন। হাদীসে কুদসিতে মানুষকে বলা হয়েছে- আশরাফ-উল-মাখলুকাত- সৃষ্টির সেরা জীব। এ সেরা জীব হওয়ার ফলেই তার পক্ষে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে এ দুনিয়ায় আল্লাহর গুণাবলীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রয়েছে প্রচেষ্টা। মানুষের জীবনে এ ইনসানিয়াতের প্রতিষ্ঠা হলে- মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, তাকে শ্রদ্ধা করবে, তার মঙ্গলের জন্য সতত সচেষ্ট থাকবে। তাই, মানুষকে তার আদি সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে আদমিয়তের মূল্যমানগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। "এ মানবিকতার অমৃত লোকে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী নির্বিশেষে 'মানুষ' প্রাণী মাত্রেরই সমানাধিকার এখানে ভেদাভেদের প্রাচীর নেই।"

** কায়রোর আল-জমহুরিয়াহ পত্রিকায় (১-৩-৬৬) জনাব আলী আল-হাবরূখ কর্তৃক ইকবাল সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ- ইকবাল ঃ দেশে-বিদেশে, ইকবাল একাডেমী ঢাকা-করাচী, প্রকাশকঃ ইকবাল একাডেমী, প্রথম সংস্করণ বাং ৬০।*

ইকবাল উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেন ঃ

আদমিয়ত কী–মানুষেরে সম্মান করা
মানুষের মর্যাদা সম্যক শিক্ষা করো
একটাও কঠোর কথা বলা পাপ
কারণ কাফের ও মোমেন সবাই খুদার দাস–

* * * * *

হৃদয় পানি–মাটির জিন্দানে বন্দী থাকলেও
এই বিশাল বিশ্ব বিরাট হৃদয়ের সাম্রাজ্য

এই হৃদয়বৃত্তির বিশালতায় ও উদারতায় ছিল ইকবালের অগাধ বিশ্বাস এবং এই হৃদয় কন্দরেই তিনি মানবীয় মহিমার চরম বিকাশের ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছেন। *

এ হৃদয় বিকশিত হলেই মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন আল্লাহর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হবে, তেমনি আল্লাহর গুণাবলী বা মূল্যমান সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ হবে– মানুষ মানুষকে লক্ষ্য (end) হিসাবে গণ্য করবে, তাকে উপায় হিসাবে গণ্য করবে না। তাই, মানব–জীবনের এ মহাসংকটকালে ইকবাল দর্শনের পাঠ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তাঁর মতবাদের আলোকে জীবন–দর্শনের পুনর্গঠন করেই মানব সভ্যতা টিকে থাকতে পারে– অন্যথায় মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে যে শক্তি আয়ত্ত করবে তাকে অপ–প্রয়োগ করে তার ধ্বংস ডেকে আনবে।

প্রমাণপঞ্জী ঃ

১. Bertrand Russell - The Scientific Outlook - P- 21-22
২. অধ্যাপক আলেসেন্দ্রো বৌসানী – ইকবাল ঃ তার ধর্ম–দর্শন ও প্রতীচ্য
৩. আল্লামা আবুল হাশিম–As I see it
৪. জনাব আলী আল–হাবরুখ – ইকবাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ
৫. বিচারপতি আব্দুল মওদুদের উদ্বোধনী ভাষণ

** বিচারপতি আব্দুল মওদুদের ঢাকাতে ইকবাল একাডেমী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ (৩–৬–৬৭ ইং) ইকবালঃ দেশে–বিদেশে, প্রকাশকঃ ইকবাল একাডেমী, ৪ নং পুরানা পল্টন, ঢাকা–১ম সংস্করণ–আশ্বিন ১৩৭৪ পৃঃ ২৫৭–থেকে গৃহীত*

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে ইকবাল দর্শন

ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন

বর্তমান বিশ্বে আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন যেভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হচ্ছে তা তার বাস্তবতা ও সত্যতারই সাক্ষ্য বহন করে। সে বাস্তবতা ও সত্যতা আল-কুরআনের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। মানব জীবনে তার মূল্য অপরিসীম। জীবনের এই মূল্যবোধকে কেউ সহজে উপেক্ষা করতে পারেনা।

আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপলক্ষ্য করে এক অপূর্ব রহমত হিসাবে ও ধরাবাসীর কল্যাণার্থে অবতরণ করা হয়েছে। যারা এ অমূল্য বাণী পালন করে ও মেনে নিয়ে তার অনুসারী হয়েছে তারা মুসলমান জাতি হিসাবে পরিগণিত এবং তারাই আল্লাহ পাকের কাছে বরণীয় ও সম্মানিত। আর যারা এটা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অমুসলিম। তাদের অনেকেই হয়ত বা আল-কুরআনের উপর সরাসরি বিশ্বাস স্থাপন না করলেও পূর্বেকার ঐশী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অল্প বিস্তর জ্ঞান রাখে। তবে, সত্যিকারের ঈমান বা আল্লাহ তা'য়ালার উপর সর্বোতোভাবে বিশ্বাস স্থাপনের যেসব শর্তাবলী ইসলামে দেয়া হয়েছে তারা তা পালন করতে অক্ষমনয়।

আল-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। শুধু পার্থিব জীবনের জন্যই নয়; বরং, পরকালের জীবনের জন্যও। পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্বের আদিকথা ও পরকালে স্থায়ী জীবনের ইতিহাস ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য সনাতন। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী রাসুলে করীম (সঃ) পর্যন্ত অগণিত নবী-রাসূলের ধর্ম মূলতঃ একই, যার নাম 'ইসলাম' সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নিষেধ যুগে যুগে সময় ও সমাজের তাকিদে পরিবর্তিত হয়েছে বটে, কিন্তু আসল ধর্ম অর্থাৎ আল্লাহ পাকের *'একত্ববাদ'* সর্বযুগে একই রয়েছে। তা আমরা আল-কুরআন ও রাসুলের বাণীর মাধ্যমে অবহিত হই।

আল্লামা ইকবাল *"আসরারে খুদী"* ও *"রুমুযে বেখুদী"* কাব্যদ্বয় সমন্বিত *"আসরার ও রুমূয"* নামক ফারসী গ্রন্থে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ জীবন দর্শন খুদী সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে ও কাব্য মহিমায় বর্ণনা করেছেন। জীবন সম্পর্কে আর সব মতবাদ তাঁর অন্যান্য উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর গ্রন্থসমূহ উর্দুর তুলনায় ফারসীতে বেশী। কারণ, ফারসী সাহিত্যে জীবন দর্শন ব্যাখ্যার উপযোগী শব্দ ও পরিভাষা সম্ভারে উর্দুর তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিকতায় বেশী অগ্রগামী।

আল্লামা ইকবাল "আসরার ও রুমুয" গ্রন্থের শেষের দিকে "রহমাতুল্লিল আলামীন সমীপে গ্রন্থকারের নিবেদন" শিরোণামে হযরত রিসালাতে মা'ব (সঃ)-কে উদ্দেশ্য করে যে কাব্য খন্ডটি রচনা করেছেন, তাতে তিনি অতি বিনীতভাবে অথচ অত্যন্ত প্রত্যয় সহকারে বলেছেনঃ

যদি আমার হৃদয় হয় মূল্যহীন দর্পণ
অথবা আমার কবিতায় কুরআনের ব্যতিক্রম কিছু থাকে
পুনরুত্থান দিবসে আমায় করুন লাঞ্ছিত ও অপমানিত
আমায় বঞ্চিত করুন আপনার পদ চুম্বনের সৌভাগ্য থেকে
খচিত করে থাকি যদি কুরআনের রহস্যাবলীর মুক্তো
মুসলিমদের সাথে বলে থাকি যদি সত্য কথা
সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আবেদন করুন
আমার প্রেম যেন হয় কর্মের সাথে সামঞ্জস্যময়

অর্থাৎ, উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন, তাঁর জীবন দর্শন 'খুদী' সম্পূর্ণরূপে আল-কুরআনের শিক্ষা মোতাবেক। পরিপন্থী যদি কিছু থাকে তবে পুনরুত্থান দিবসে তিনি তার জন্য দায়ী থাকবেন। এটি নিঃসন্দেহে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা।

অনেকেই অবহিত আছেন, ইকবাল দর্শন বলতে আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন "খুদী"-কেই বোঝানো হয়। সুতরাং এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আল-কুরআন তথা ইসলামের দৃষ্টিতে ইকবাল দর্শন-এর উপর আলোচনা করার প্রয়াস পাবো, যাকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্যান্য মতবাদও পেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর সত্তা সর্বকালীন ও সর্বত্র বিরাজমান। এইমর্মে আল-কুরআনে এত সব উক্তি ও আয়াত রয়েছে, যাতে সাধারণতঃ ধারণা জন্মে যে, মানুষ বুঝি বা একটি পুতুলতুল্য এবং আল্লাহ থেকে তার পৃথক কোন সত্তাই নেই। প্রাচীন গ্রীকদর্শনঃ প্যানটিইজম বা সর্বেশ্বরবাদ-এর প্রভাবে তার উক্ত ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রবেশ ঘটে ইসলামের বহুল প্রচলিত সুফী মতবাদঃ *"ওয়াহদাতুল ওজুদ"* বা এক অস্তিত্ব নামে। এরই অনুকরণে ফারসী পরিভাষা *"হামা উস্ত"* অর্থাৎ সবই '*তিনি*'-এর উৎপত্তি। তাই এর উপর ভিত্তি করেই প্রায় সমস্ত ফারসী গ্রন্থে সুফী মতবাদসমূহের বিকাশ ঘটে। এমনকি তার প্রভাব উপমহাদেশে ছড়িয়েপড়ে।

মানব-দানবসহ আল্লাহ পাকের যাবতীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখ্যতঃ যা আমরা একটি হাদীসে কুদসী থেকে অবগত হতে পারিঃ আমি এক গুপ্ত ধন ছিলাম, তৎপর অভিপ্রায় হলো পরিচিতি

লাভ করি, তাই আমার যাবতীয় সৃষ্টি কর্ম। এ হাদীসের সারমর্ম পূর্ণভাবে অনুধাবন করা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই আমরা বরং কুরআনে পাকে বর্ণিত আরেকটি বাণী নিয়ে আলোচনা করতে পারি, যা শুধু মানব–দানব সম্পর্কীয় ও খানিকটা সহজবোধ্য।

আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "*আমি মানব–দানবকে শুধু আমার ইবাদাত বা বন্দেগী করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। এবং যে ইবাদাত দ্বারা তারা নিজেরাই লাভবান ও উপকৃত হবে। আল্লাহ পাকের প্রয়োজন বা তাকিদে নয়।* এই বাণীতে কিন্তু আমরা স্রষ্টা থেকে সৃষ্টির পৃথক সত্তার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত খুঁজে পাই। অন্য কথায়, যাকে বলা যেতে পারে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এ থেকে উৎপত্তি হয় বাধ্যতা অবাধ্যতার কথা, ভাল–মন্দের বিবেচনা, পুরস্কার বা শাস্তি পাবার বিধান; এভাবে আরো অনেক অনেক বিষয় যা মানব জীবনের পার্থিব ও পরকাল উভয় জগৎ সম্পর্কিত। বিষয়টিকে আরো একটু সহজ করার জন্য দানব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমাদের আলোচনা শুধু মানব সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। "*ওয়াহদাতুল ওজুদ*" মতবাদের উর্ধ্বে এখানে মানবসত্তার পৃথক অভিব্যক্তি দেখা যায় যা আল্লামা ইকবালের "খুদী" দর্শনের ভিত্তি।

হযরত আদম (আঃ)–কে সৃষ্টি করার পর একটি বিশেষ গাছের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তিনি তা ভক্ষণ করলেন। পরিণাম কি হলো তা সবাই অবগত আছেন। আল্লামা ইকবাল কিন্তু ঐ ঘটনা বা দুর্ঘটনাতে তাঁর "খুদী" দর্শনের সমর্থন পেলেন। তাঁর মতে, হযরত আদম (আঃ) স্বেচ্ছায় ঐ নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে তাঁর খুদী সত্তারই পরিচয় দিলেন। আল্লামা ইকবাল তাঁর বক্তৃতামালা সম্বলিতঃ "*দ্য রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থটস ইন ইসলাম*" নামক ইংরেজী গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেনঃ এটাই ছিল মানব জাতির সর্বপ্রথম খুদীর প্রয়োগ। আল্লাহ পাক থেকে পৃথক সত্তা ও অধিকার না থাকলে তিনি ঐ কাজ করতে সক্ষম হতেন না। তদুপরি, তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ পাকের খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে। এই বিরাট গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য তাঁর কিছু এখতিয়ার বা অধিকার অবশ্যই থাকতে হবে।

অতএব, খুদী আল্লামা ইকবালের নিকট একটি এমন সৃষ্টি বা কর্মের মাধ্যমে চিরস্থায়ী হতে পারে। যেহেতু স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন সত্তা রয়েছে, সৃষ্টি তথা মানব প্রাচীন গ্রীক দর্শনে প্রভাবান্বিত সুফী মতবাদ অনুসারে স্বীয় সত্তাকে ফানা বা বিলীন করে স্রষ্টার সাথে একাত্ম হতে পারে না। তর্কের খাতিরে যদিও বা আল্লাহকে চেনা বা মা'য়ারেফত লাভের উদ্দেশ্যে ফানা ফিল্লাহ ও বকা বিল্লাহ (আল্লাহতে বিলুপ্তি সাধন করে আল্লাহতেই স্থায়িত্ব লাভ)–এর প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তবু আল্লাহ ও মানবের মধ্যে পার্থক্য থেকেই যায়; এবং এই পার্থক্যই আল্লামা ইকবালের নিকট উত্তম। তাই তিনি তাঁর ফারসী গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেনঃ

খূদীর জীবন হলো অন্যের সৃষ্টি
আরেফ মারুফ মাঝে পার্থক্যই শ্রেয়

এ কারণেই তিনি উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ও মহান সাধক হযরত শেখ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দেদে আলফে সানী রহমতুল্লাহর মতবাদের সাথে একমত যে, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হলোঃ *'আবদিয়ত'।* অর্থাৎ মানুষ হলো আবদ–বান্দা, আর আল্লাহ হলেন মা'বুদ বা পূজনীয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির এক পর্যায়ে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে যে একাত্মতা অনুধাবন করা হয় তা শেষ ধাপ নয়। ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থার অবসান ঘটলে আবদ বা বান্দা তার আসল রূপে ফিরে আসে এবং পৃথক সত্তায় পরিণত হয়। আল্লামা ইকবাল পারস্য কবি মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর বিশ্ব বিখ্যাত মসনবী থেকেও খূদী দর্শনের সমর্থন লাভ করেন। যদিও মাওলানা রুমী মুখ্যতঃ সর্বেশ্বরবাদ–এর প্রচারক ছিলেন, তবু তাঁর কাব্যে মানুষের পৃথক সত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। তিনি তাঁর কাব্যের এক স্থানে আল্লাহর সাথে মানুষের একাত্মতার বিশেষ অবস্থাকে কামারের উত্তপ্ত লোহার সাথে তুলনা করে বলেন যে, উত্তপ্ত লোহার চরম পর্যায়ে তাকে যদি অগ্নি বলা হয় তবে অযৌক্তিক হবে না। কারণ, তখন অগ্নি ও লোহা একই রূপ ধারণ করে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে লোহাকে যখন শীতল করা হয়, তখন তার পৃথক সত্তা প্রকাশ হয়ে যায়। আল্লামা ইকবাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গোটা জ্ঞান ভান্ডারের বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা ও সমালোচনার পরই তাঁর খূদী দর্শন বিশ্ববাসী সমক্ষে পেশ করেন। তাঁর মতে, জীবন সম্পূর্ণ ব্যক্তিধর্মী। *'আসরারে খূদী'*–এর সর্বপ্রথম ও একমাত্র অনুবাদক ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আর. এ. নিকলসনকে খূদীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি ইংরেজীতে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেনঃ সর্বেশ্বরবাদ ভিত্তিক ইউনিভার্সেল বা সার্বজনীন জীবন বলতে কিছুই নেই। আল্লাহ স্বয়ং একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তবে, তাঁর ব্যক্তিত্ব একটি বিরল ব্যক্তিত্ব। মানব জীবনের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। আল্লামা ইকবালের এই বলিষ্ঠ মতবাদের সমর্থন আল–কুরআনের সর্বত্র বিদ্যমান। তাতে সাধারণভাবে গোটা মানবগোষ্ঠীকে এবং বিশেষভাবে মুমিন মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে যেসব আদেশ–নিষেধ ও সতর্কবাণী বিবৃত হয়েছে তা সবই মানবের স্বাধিকারের জ্বলন্ত প্রমাণ। এর জন্য উদাহরণ পেশ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মানবের পার্থিব জীবনের উপর ভিত্তি করেই পরকালে জান্নাত বা জাহান্নামের সিদ্ধান্ত হবে। মানব সত্তার পৃথক অস্তিত্ব ও অধিকার না থাকলে আল–কুরআনে এসব আদেশ–নিষেধ ও সতর্কবাণী জারি করার ও তা মান্য, না মানা এবং গ্রাহ্য–অগ্রাহ্য করার প্রশ্নই উঠতো না।

খূদীর সত্তাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লামা ইকবাল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও কাব্য জীবন ব্যয় করে নানাবিধ পন্থায় ও ভঙ্গিমায় কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিস্তারিত

আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। খুদী দর্শনকে বিশ্ববাসী সমক্ষে তুলে ধরতে ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে স্বভাবতইঃ গ্রীক দর্শন সর্বেশ্বরবাদ-এর প্রধান প্রচারক প্লেটো ও তাঁর শিষ্য এ্যরিষ্টোটল-এর মতবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত পূর্ববর্তী মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও উচ্চ পর্যায়ের সুফী সাধকদের তিনি তাঁর প্রথম ফারসী কাব্যগ্রন্থ আসরারে খুদীর প্রথম সংস্করণে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পর্যালোচনা ও সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে, এ উদ্দেশ্যে তিনি প্লেটো ও পারস্য কবি হাফেজকে প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছেন, যাঁদের একজন ছিলেন উক্ত দর্শনের প্রধান প্রচারক ও অপরজন ছিলেন মুখ্য বাহক।

আমাদের উপমহাদেশে প্লেটোকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। সুতরাং তাঁর সমালোচনায় কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। গোলমাল বাধলো কবি হাফেজকে নিয়ে । কারণ, আমাদের এ অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগী ছিলো, তারা হাফেজের বিরুদ্ধে আল্লামা ইকবালের কঠোর ভাষায় সমালোচনা বরদাশত করতে পারছিলেন না। সুতরাং, পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তিকায় বিতর্কের এক তুমুল ঝড় বয়ে গেলো। আল্লামা ইকবালও তাতে বিচলিত না হয়ে থাকতে পারলেন না। তাই তিনি কতিপয় হিতৈষীর উপদেশে আসরারে খুদীর পরবর্তী সংস্করণে
থাকতে পারলেন না। তাই তিনি কতিপয় হিতৈষীর উপদেশে আসরারে খুদীর পরবর্তী সংস্করণে
মূল বক্তব্যকে অক্ষুন্ন রেখে ভাষার তীব্রতা ও কঠোরতাকে কিছুটা নমনীয় করে একটি বিকল্প অধ্যায় রচনা করেন, যা বর্তমানে প্রাপ্ত *"আসরার ও রুমুয"* গ্রন্থেসন্নিবেশিতআছে।

আল্লাহ পাক মানুষকে বিশেষ করে, মুসলমানদেরকে নামাজ-রোজা ইত্যাদি যথা বিহিত পালন করতে ও বিনম্র চিত্তে নিয়মিত প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সবের আসল তাৎপর্য কি ? যদি মানবের পৃথক সত্তা না থাকে ও তাঁর নিজের অস্তিত্বকে পৃথকভাবে টিকিয়ে না রেখে সর্বেশ্বরবাদ-এর সাগরে বিলীন হয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য হয়। তবে, তা হবে যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগী ও ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং তদুপরি প্রার্থনা দ্বারা কিছু প্রাপ্তির আশা করা হবে নিরর্থক। রাসূলে পাক (সঃ)-এর বাণীঃ *ভাগ্যের পরিবর্তন সাধিত হয় না, কিন্তু প্রার্থনা দ্বারা তা সম্ভব।* ইসলামের এসব মর্ম কথাকেই সামনে রেখে আল্লামা ইকবাল দীপ্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেনঃ

তুমি তোমার খুদী সত্তাকে এতো উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত কর
খোদা নিজেই যেন বান্দাকে জিজ্ঞাস করেন, বল, কিসে তোমার সন্তুষ্টি!

খুদী দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথে আল্লামা ইকবাল তাকদীর বা ভাগ্য সম্পর্কীয় ইসলামের অতি জটিল ও বহু বিতর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন হন। এই গ্রন্থী না খোলা পর্যন্ত তার যাত্রাপথ সুগম হয় না। তাই তিনি এ সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁর চিন্তা-ভাবনা পেশ করেছেন ও নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করে কবিতা রচনা করেছেন।

মানুষের ভাগ্যে কি লিপিবদ্ধ আছে, তা প্রকাশ হবার পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত কেউ জানে না। উল্লেখযোগ্য যে, এ প্রশ্ন নিয়ে বিগত পনেরোশত বছর ধরে বহু গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু, আজ পর্যন্ত কেউ এর কোন সন্তোষজনক ও পূর্ণ সমাধান দিতে পারেনি। কারণ, বিষয়টি অদৃশ্য এবং আল্লাহ পাকের গোপন রহস্য। তবে, মানুষকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমল বা কাজ করে যেতে। তার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, ফেরেশতা, পরকালের জীবন, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদির উপরও বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ দেয়া হয়েছে।

ভাগ্যে যা আছে, তা কর্মের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় এবং রাসূলে পাকের এক উক্তি অনূযায়ী তাও আবার স্বল্প প্রয়াসে। ভাগ্যের লিখন ফলদায়ক হবার ব্যাপারটিকে আল্লাহ পাক সহজ করে দেন। কিন্তু যা ভাগ্যে নেই তা শত চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না। সব চেষ্টাই বিফলে যায়। উপরোক্ত প্রসঙ্গে একটি হাদীসের কথা মনে পড়ছে, এতে রাসূলে পাক (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ *ভাগ্য ও কর্ম পাশাপাশি অবস্থিত। অর্থাৎ, ভাগ্যের লিখন কর্মের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।* এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবেই কর্মপন্থা দিয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্ম
পায়। এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবেই কর্মপন্থা দিয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্ম
থেকে আরম্ভ করে উপজীবিকা অন্বেষণ ও আহরণসহ অন্যবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের মধ্যে এক তীব্র ও অদম্য তাড়না বিদ্যমান। এই তাড়নাই হলো তার প্রধান চালিকাশক্তি। এর মাধ্যমেই সে সব কিছু লাভ করে। সৃষ্টির প্রবল তাকিদে সে পৃথিবীতে সে মানব জীবনধারাকে অব্যাহত রেখেছে আল্লাহ পাকেরই ইচ্ছায়। ক্ষুধার তাড়নায় সে উপজীবিকা আহরণে সদা ব্যস্ত, সমাজে বিকশিত হয়ে প্রভাব বিস্তার, যশ ও সুনাম অর্জনে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঐকান্তিকতার সাথে তার প্রচেষ্টার অন্ত নেই।

এই কর্মপন্থার তাড়নায় সে সঠিক পক্ষেও যেতে পারে আবার বিপথগামীও হতে পারে। এখানেই তার মহত্ব ও সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব। সৎ কর্ম করে বাহ্যতঃ কিছু লাভ হোক বা না হোক, তার সুফল ইহকাল বা পরকালে অবশ্যই আছে। মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সব সময় তা ধরা পড়ে না। অনুরূপভাবে অসৎ কর্মের ফল পৃথিবীতেই হোক বা পরকালে, সে ভোগ করবেই। ভাল মন্দ সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। মানুষের কোন কিছু করার ইচ্ছা-তা ভাল হোক বা মন্দ, যখন সংকল্পে পরিণত হয় তখন তা আল্লাহ পাক তার জন্য সৃষ্টি করে দেন। তাই ভাগ্যে কি লিপিবদ্ধ আছে, তার কোন ভাবনা-চিন্তা না করে কাজ করে যাওয়াই হলো মর্দে মুমিনের কর্তব্য। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে মানবের সহজাত প্রবৃত্তি। যেহেতু আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সেহেতু মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে ও তার সামগ্রিক কল্যানার্থে নির্ধারিত কাজটি তার দ্বারাই তিনি সম্পাদন করিয়ে নেন। এটা আল্লাহ পাকের সংরক্ষিত ক্ষমতা। জীবন পরিচালনার পথে প্রায় সবাই এই মর্মটি একটু চিন্তা করলেই অনুধাবন করতে

পারেন। সে যা–ই হোক, কথা হচ্ছিল কর্মের। আল–কুরআনে অতি জোরালো ভাষায় ঘোষিত হয়েছেঃ *নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য সচেষ্ট না হয়, [সুরা রা'দ ১১ নং আয়াত দ্রষ্টব্য]।* এ'ই হলো মানুষের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সমস্ত কার্যক্রমের মর্মকথা। এই মর্ম কথাটি যেমনভাবে একটি জাতির জন্য প্রযোজ্য, তেমনি ব্যক্তি–বিশেষের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। জীবন মৃত্যুসহ মানব জীবনের বহু কিছু আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন, যাতে মানুষের কোন কিছু করণীয় না থাকে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, তা বাধ্যতামুলক। বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ক্ষমতার প্রয়োগ আল্লাহ তা'য়ালার জন্য অপরিহার্য। এজন্য ওসব এখতিয়ার বহির্ভূত কথার জন্য মানুষের কোন দায়–দায়িত্ব নেই। বিচার–আচার ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে শুধু ওসব ব্যাপারেই, যাতে মানুষকে করা না করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

ক্ষেতে–খামারে নিয়মিত চাষাবাদ ও বীজ বপন করতে হবে। তবেই শস্য উৎপন্ন হবে। বৃক্ষ রোপণ করলেই ফল পাওয়া যাবে; নতুবা নয়– এই নীতি মানব জীবনের এখতিয়ারভূক্ত। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। কাজ সম্পন্ন হওয়া বা শস্য অথবা ফল লাভ করা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের হাতে। মুসলমানগণ তাই আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কাজ করে। মানব জীবনে কর্মের গুরুত্ব সমধিক। এই অর্থেই আল্লামা ইকবাল স্বীয় ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন এভাবেঃ

কর্ম দ্বারাই জীবন গড়ে, জান্নাত–জাহান্নাম সবই
এই মৃত্তিকার মানব জন্মগতভাবে বেহেশতীও নয়, দোযখীও নয়।

তাই, মানব জীবনে কর্মবিমুখতা বা অলসতার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সব কথার উর্ধ্বে এ কথাও অকাট্য সত্য যে, আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতা রয়েছে যা পূর্বেও বলা হয়েছে। তিনি জগতে যা চান, যখন, যেখানে ও যার জন্য কিছু সংঘটিত করতে চান, তা তিনি সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে করে থাকেন, তা মানব এখতিয়ারভূক্তই হোক না কেন। তিনি সর্বময় কর্তা। এতে কারো কিছু বলার অধিকার নেই, তিনি সদা জীবিত ও বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ কর্তা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আল্লামা ইকবালের খুদী দর্শন শক্তি সঞ্চয় করে ঐশী প্রেম হতে। পারস্য মহাকবি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমীও তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে যাকে '*মসনবী*' বলা হয়। এই ঐশী প্রেমেরই গুণ–কীর্তন করেছেন। আল্লামা ইকবাল তাঁরই অনুসরণে প্রেমের উপর–সমধিক গুরুত্ব আরোপকরেছেন।

তিনি এক স্থানে বলেছেনঃ

আল্লামা ইকবাল

নূর এর বিন্দু যার নাম খুদী
মাটির মানুষের মধ্যে জীবন স্পন্দন
প্রেমের মধ্যদিয়ে তা হয় স্থিতিশীল
অতি জীবন্ত, অতি জ্বলন্ত, অতি উজ্জ্বল।

অন্যত্রবলেছেনঃ

মরদে খোদার কর্ম প্রেম দ্বারা হয় বিকশিত
প্রেমই হলো আসল জীবন, মৃত্যু তার জন্য হারাম

তবে ঐ প্রেম অবশ্যই রাসূল পাকের পদাংক অনুসরণের মাধ্যমেই হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ

মুসলিম এর হৃদয়ে রয়েছে মুস্তাফার স্থান
আমাদের সম্ভ্রম মুস্তাফার নামেই নিহিত
মুস্তাফার প্রেম হয় যার সম্পদ
জল স্থল সবই তার করতলে

অন্যত্রবলেছেনঃ

নিজেকে মুস্তাফার স্থানে পৌঁছাও, কেননা তিনিই ধর্মের সব
যদি তাঁতে না পৌঁছাও তবে সবই আবু লাহাবের বিপর্যয়।

কেননা, আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- *"হে রাসূল! আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস , তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন"।* অর্থাৎ, আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা যেন একসূত্রে গাঁথা। তাই রাসূলকে বাদ দিয়ে আল্লাহর ভালবাসা পাবার আশা বৃথা। এই উক্তিকে কেন্দ্র করে বহু জীবন জিজ্ঞাসার উৎপত্তি হয়, যা নিয়ে সুফিয়ায়ে কেরাম ও খোদাভক্তগণ আজীবন সাধানায় ব্যাপৃত রয়েছেন।

আল্লাহর পক্ষে প্রেমই সব কিছু। এতে যুক্তি-তর্কের বিশেষ গুরুত্ব নেই। পাশ্চাত্য দর্শন খোদাকে বুঝবার জন্য যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিয়েছে, আর তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তার বিপরীতে প্রাচ্য তথা মুসলিম দর্শন প্রেম ও ভালবাসাকে অবলম্বন করে আল্লাহকে পাবার প্রচেষ্টা করেছে, যা ফলপ্রসূ হয়েছে।

আল্লাহকে সত্যিকারভাবে বুঝতে ও জানতে পেরেছে যা মানব জীবনের পরম চাওয়া ও পাওয়া। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবাদ আছেঃ *ভক্তিতে মিলে ভগবান, তর্কে বহু দূর।* আল্লামা ইকবালের ভাষায়ঃ

নিদ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়লো নমরূদের অগ্নিকুন্ডে প্রেম
বিবেক এখনো কুন্ড পাশে অবাক তাকিয়ে

প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা অসাধ্য সাধন হতে পারে, বিবেক দ্বারা নয়। তাই ইসলামে ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসার স্থান সর্বোপরি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, আল্লামা ইকবালের জীবন-দর্শন খুদী তাঁর দাবী অনুসারে সম্পূর্ণ ইসলাম তথা আল-কুরআনভিত্তিক। যেমন-পূর্বেও বলা হয়েছে, মানবজাতি সমস্ত সৃষ্টিকুলের সেরা। তাই বিশ্বে তার অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আল্লামা ইকবাল তার জীবন দর্শনে একান্ত প্রয়োজন ও জরুরী বোধ করেছেন। এই পটভূমিতেই তিনি এক পত্রে উল্লেখ করেছেনঃ

"আমার পূর্ব পুরুষগণ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা তাঁদের জীবন এই ভাবনাতে উৎসর্গ করেছেন যে, খোদা কি? আর আমি এ চিন্তায় মগ্ন যে, মানব কি?"

আল্লামা ইকবালের খুদী দর্শনের সূত্র আমরা তাঁর এই উক্তিতেই পাই। তাঁর খুদী দর্শন আজ বিশ্বে ক্রমবর্ধমানভাবে সমাদৃত ও গৃহীত হচ্ছে। যদিও এসব চিন্তাধারা সত্যি কথা বলতে কি, অনেক উঁচু স্তরের এবং একমাত্র বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও সুফী সাধকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামান না। তাদের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। তবে, তার খুদী দর্শনপ্রসূত বহু কবিতা যে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা তাতে চিন্তার খোরাক ও কর্মোদ্দীপনার উপাদান খুঁজে পান। তাই, ইকবালকাব্য প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সর্বত্র চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সুফীসাধাক ও সাধারণ মানুষ সবাইকে সমভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণও মূলত এখানেই।

শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া

১

দিল্ থেকে যদি আসে কোন বাণী, প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চিয়
পাখনা না থাক্ তবুও তাহার উর্ধ্বে উড়ার তাকৎ রয়।
পাক্ বিহিশ্‌তে তবুও তাহার, টান থাকে তার তাই সেথায়,
ধুলার ধরায় রয় নাক' বাঁধা-নীল - আকাশের গান সে গায়।
প্রেম ছিল মোর বেয়াড়া ভীষণ, কোঁদল-পাকানো সভাব তার
বাগ মানিল না, তীব্র গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ-পার।

ইকবাল চিন্তার একটি দিক

আবদুল মান্নান তালিব

ইকবাল শুধু একজন কবিই নন, একজন দার্শনিক এবং চিন্তাবিদও। কিশোর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। প্রথম বয়সে তাঁর চিন্তায় যে অপরিপক্কতা ছিল তাঁর সে সময়কার কবিতাগুলোয়ও তার ছাপ রয়েছে। ধীরে ধীরে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত এবং ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনের সাথে সাথে তাঁর চিন্তা পাকাপোক্ত হতে থাকে এবং জীবন, জগৎ, মানুষ, সৃষ্টি, কর্ম ও কর্মফল ইত্যাদি জীবনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হতে থাকে।

জীবন তাঁর কাছে এমন শক্তির নাম যা অনবরত গতিশীল থাকে। আর গতিশীলতার মধ্যদিয়েই সে উন্নতির সোপান অতিক্রম করতে থাকে। কিন্তু যে শক্তিটি জীবনকে গতিশীল রাখে এবং তার অস্তিত্বকে অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে বের করে এনে জীবনের ক্রমোন্নতির পর্যায় অতিক্রম করায় সেটি হচ্ছে তার খুদী বা অহংবোধ। ইকবাল চিন্তার দ'ুটি কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে, মানুষের জীবনের সীমাহীন সম্ভাবনা এবং বিশ্বজাহানের ওপর মানুষের প্রাধান্য। আর এ দু'টিরই পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে তার খুদী। মানুষের এই খুদীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে আল্লাহ কুরআন মজীদে এভাবে ঘোষণা করেছেনঃ *"খালাকনাল ইন্‌সানা মিন নুত্‌ফাতিন ফাইযা হুয়া খাসীমুম্ মুবীন।"* অর্থাৎ, মানুষকে আমি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি তার পর কালক্রমে সে হয়ে উঠেছে একজন প্রচন্ড বিতর্ককারী। এর মানে হচ্ছে, নিজের বক্তব্য সুস্পষ্ঠভাবে তুলে ধরা, নিজের কথা ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বীকৃতি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে নেয়া এবং প্রতিপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা তার রয়েছে। মানুষের এসব আভ্যন্তরীণ গুণাবলী ও শক্তি মূলত তার খুদীরই অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইকবাল কাব্য চিন্তার নায়ক যে মানুষ তার মধ্যে তিনি এই ধরনের খুদীর শক্তি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি মানুষের ভেতরের শক্তিকে সচেতন করে তাকে দুনিয়ার এই কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজে লাগাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, শুধুমাত্র এই দুনিয়ায় জন্ম নেবার কারণেই কেউ জীবন লাভের হকদার হয়ে যায় না; বরং, তাকে নিজের শক্তি ব্যবহার করে এই দুনিয়ায় নিজের স্থান করে নিতে হয়। এভাবে সে নিজের জীবন লাভের প্রমাণ দেয়। তুচ্ছ বালুকণাও যদি প্রেমের পাঠ গ্রহণ করে জীবন সচেতন হয় তাহলে তার আভায় চন্দ্র ও সূর্যের ঔজ্জ্বল্যও নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

" প্রেমের অক্লান্ত প্রয়াস যাকে দেয় উড়ে বেড়াবার স্বাদ
সে তুচ্ছ বালুকণাও করতে পারে চন্দ্র ও সূর্যকে বিধ্বস্ত।"

ইকবালের মতে, জীবন হচ্ছে আশা-আকাঙ্ক্ষার আর এক নাম। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন আশার জন্ম দেয়াই জীবনের কাজ। আশার জন্ম ব্যাহত হলে জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। আর এই জীবনের মূল পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে খুদী। খুদী হচ্ছে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। খুদী আল্লাহর নূর। অলস মানুষকে সে দান করে স্বাধীন কর্মক্ষমতা। তবে, এই খুদীকে যথাযথভাবে লালন করতে হবে। তাকে জীবনের পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত করার জন্য তার লালনকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করতে হবে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে আনুগত্য, দ্বিতীয় পর্যায় আত্মসংযম এবং তৃতীয় পর্যায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব। পার্থিব জীবনে আল্লাহর বিধান পুরোপুরি মেনে চলে খুদীকে এই পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে।

খুদীর সাথে সাথে ইকবাল "*ফকর*"-কেও গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, খুদীর উন্নয়ন এবং তার পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছুনো ফকর ছাড়া সম্ভবপর নয়। ফকরের একটি মানে দারিদ্র্য এবং এর দ্বিতীয় মানে আল্লাহনির্ভরতা। অর্থাৎ, অভাব বোধ না করা এবং তা দূর করার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ইকবাল একে বলেছেন ইসলামের প্রাণ। আর এই প্রাণ বস্তুটিই খুদীকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়। ফকরকে তিনি বলেছেণ '*যিকির*' ও 'ফিকির' -এর সমষ্টি। অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্য এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার শাসন দন্ড লাভ করা। এভাবে ফকর যখন খুদীকে পূর্ণতার পর্যায়ে উন্নীত করবে তখন ঃ

"খুদীর তরবারি চড়ে যখন ফকরের শাসপ্রস্তরে
এক সিপাহীর আঘাত করে কাজ সিপাহসালারের।"

খুদীকে যদি তলোয়ার ধরে নেয়া যায় তাহলে সেই তলোয়ারের শাসপ্রস্তর হচ্ছে তওহীদ। লাইলাহা ইল্লাল্লাহর শাস প্রস্তরে ঘসে খুদীতে পূর্ণতা দান করতে হবে। এই লাইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা তাওহীদকেই কবি ফকর হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কারণ, লাইলাহার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুমিন দুনিয়া ও আখেরাতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর সকল শক্তিকেই অস্বীকার করে। দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করে এবং তাঁরই ওপর ভরসা করে। আর কোনো শক্তিকে সে ভরসার যোগ্য মনে করে না। এই ফকরের শক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার অসভ্য, বর্বর, অশিক্ষিত জাতির পুরোধায় অবস্থানকারী আরবরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দুনিয়ার শাসকে পরিণত হয়ে গেলো এবং তারা বিশ্ববাসীকে সভ্যতার শিক্ষা দান করলো।

বিশ্বমানবতার কবি
মুহাম্মদ নূরুযযমান

আল্লামা ইকবাল–মহাকবি। তাঁর প্রতিভা গগনচুম্বী। তাঁর পয়গাম শাশ্বত। তাঁর নিজের ভাষায় *'বাংগেদারা গোয়া'*–এ যেন যুগের আওয়ায।

আল্লামা ইকবাল প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে এ নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। কিন্তু, তার কর্ম বিগত দিনের ন্যায় আজও আলোকোজ্জ্বল এবং আগামী কালও অনুরূপভাবে উজ্জ্বল থাকবে। তাঁর কর্ম ও প্রতিভা অবিনশ্বর।

মহাকবি ইকবালের বাণী কোন স্থান ও কালের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। কোন বিশেষ ভাষাভাষীর জন্য তিনি কিছু লেখেননি। কোন বিশেষ ভৌগোলিক এলাকার মানুষের জন্য তিনি কবিতা রচনা করেননি বা বিশেষ কোন যুগের জন্য তাঁর কবিতা নিবেদিত নয়। তিনি আন্তর্জাতিক এবং তার ভাবধারা চিরন্তন ও শাশ্বত। সাধারণত কাব্য–সাহিত্যে যুগের ঘাত–প্রতিঘাত প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তি মানুষের হাসি–কান্না চিত্রিত হয় অথবা কবি চিত্তবিনোদনের জন্যে বা সুন্দরের পূজারী হিসেবে সাহিত্য চর্চা করেন। ইকবাল Art for Art sake-শিল্পের খাতিরে শিল্প–নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ঘুমন্ত মানবতাকে জাগ্রত করার সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি আত্মসত্তা বিলুপ্ত মানবতাকে সফলতার স্বর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য দিনের পর দিন রাতের পর রাত কোশেশ করেছেন। বিনিদ্র রজনী তিনি যাপন করেছেন। নিশিথ রাতে সৃষ্টি যখন ঘুমের ঘোরে অবচেতন তখন তিনি স্রষ্টার চোখে সৃষ্টির ব্যথা বেদনা অবলোকন করেছেন। তিনি লিখেনঃ

প্রাচীন দিনের কিস্‌সাগুলো আবার আমি বলছি হেন।
নতুন করে রক্ত করে তোমার বুকের যখম যেন।
আত্মসত্তা বিষয়ে অজ্ঞ ঘুমন্ত এই জাতির তরে,
যাঞ্চা করি–দাওহে খুদা সবল, সকল জীবন তারে,
অর্ধ রাতে নিযুমক্ষণে বিলাপ করি করুণ স্বরে,
'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন' বক্ষ ভাসাই নয়ন–সোরে।

আল্লামা ইকবাল মুক্তি পাগল মানবতার বন্ধু। তিনি শৃঙ্খলিত ও নিপীড়িত মানবতার মূল সমস্যা চিহ্নিত করলেন। নির্যাতিত মানবতার মূল সমস্যা হলো মানুষের প্রভুত্বের নিকট মানুষের আত্মসর্পণ প্রভাব–প্রতিপত্তির অধিকারী মানুষ যখন নিজেকে খোদার আসনে অধিষ্টিত করে দুর্বল মানুষকে শৃংখলিত করে তখন মানবতা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। প্রেম-প্রীতি,–ভালবাসা পদদলিত হয়, জীবনের যা সুন্দর ও মহৎ তা বিনষ্ট হয়, ন্যায়, ইনসাফ

বিঘ্নিত হয়। যে মানবতা ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে দুনিয়ার আলো-বাতাসকে জান্নাতের পরিবেশে পরিণত করতে পারতো তা মেকী প্রভুদের দাপটে মরু শাহারায় পরিণত হয়। মেকী প্রভুদের দুর্বিষহ বোঝার দুরন্ত চাপে মানবতার অপমৃত্যু হয়, মানবতার ফুল কুসুমে ঝরে পড়ে, দুনিয়ার যাবতীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন এক উৎস থেকে উৎসারিত-- যারা ধর্মের অঙ্গনে পাপ পুরোহিত, যারা রাজনীতির ক্ষেত্রে উজির, নাজির প্রেসিডেন্ট বা রাজা বাদশাহ এবং যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহাজন ও ইজারাদার তারা তাদের নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে মানবতাকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে। এ গোলামী থেকে মুক্তি পাগল মানুষকে রক্ষা করার কি কোন পথ নেই? তাদেরকে বহু খোদার গোলামীর নির্মম লৌহ বাঁধন থেকে মুক্ত করা কি সম্ভবপর নয়? এক স্রষ্টার প্রতি উদাসীন থাকা থেকে যে আত্মবিস্মৃতি উৎসারিত হয় তা মানুষকে অন্য মানুষের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে, পীর পুরোহিতের খোদাবিরোধী হুকুম মানতে ক্ষুব্ধ করে এবং রাজনৈতিক নেতার যাবতীয় যুলম, বিপর্যয়, শোষণ এবং প্রতারণা শিকারে পরিণত করে। আল্লামা ইকবাল নির্যাতিত মানবতার চিত্র এভাবে অংকিত করেছেনঃ

মানব ছিল মানব-পূজক গগন তলে
তুচ্ছ হেয় নিপীড়িত চরণ তলে।

কিসরা-গীযর দস্যু প্রতাপ সুযোগ-জেদে,
হস্তপদে শিকল বাঁধন রাখত বেঁধে।
গণক ঠাকুর বাদশাহ্ আমীর পূজারী পোপ
সব শিকারী এক শিকারে মারত যে কোপ।
প্রতাপশালী বাদশাহ এবং ভক্ত পূজক
পতিত জমির কর আদায়ে কঠোর শাসক
গির্জা মাঝে বিশপ বেচে বর যুদার
শিকার তরে ফন্দী হীন স্কন্ধে তার,
ব্রহ্ম করে কুঞ্জ হতে পুষ্প চয়ন
অগ্নি পূজক শস্য তাহার করে দাহন।

নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নিয়ে এলেন মানবতার মুক্তি। বহু খোদার খোদায়ীর আসন অবসান ঘোষণা করলেন। শিকল পরা মানুষকে তিনি মুক্ত ও আযাদ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যিনি স্রষ্টা তিনিই উপাস্য। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই বিধান দিবেন। আর কারও বিধানের আনুগত্য করা যাবে না। তিনি যুগ-যুগান্তের বাঁধন খুলে দিলেন। যে বোঝা মানুষের পিঠ আড়ষ্ট করে দিয়েছিল তা তিনি তাদের পিঠ থেকে অপসারিত করলেন। বেঁকে যাওয়া মানুষ আল্লাহর যমিনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সম্ভাবনার সকল বদ্ধ দরজা খুলে গেল। তৌহিদের পরশ

পাথরের স্পর্শে অবহেলিত মানুষ সফলতার রাজ তোরণে পদার্পণ করলো। মানবতার এ মহান আযাদী, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব কবি ইকবালের *'রেসালতে মোহাম্মদীর মকসুদ'* শীর্ষক কবিতায় এভাবে অংকিত হয়েছেঃ

শ্রমিকজনের মান–মর্যাদা বৃদ্ধি পায়,
অত্যাচারীর কর্তাগিরি লুপ্ত হয়।
শক্তি তাহার মূর্তি প্রাচীন চূর্ণ করে
নির্মাণ করে কিল্লা নব মানব তরে।
আদম– দেহে নূতন জীবন প্রদান করে,
দাস্য মুছি বন্দী নরে মুক্ত করে।
প্রাচীন ধরার মৃত্যু হানে জন্ম তার
মূর্তি পূজার অগ্নি পূজার সংস্কার।

রেসালাতে মোহাম্মদীর পয়গাম শাশ্বত ও চিরন্তন বিধায় তা জাতি–ধর্ম ও কাল, নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয়স্পর্শী করে। সকল মানুষকে পথের সন্ধান দেয় রেসালাতে মোহাম্মদী আরব আযমকে একত্রিত করে দিয়েছে। লাল কালোর পার্থক্য মুছে দিয়েছে।

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। আরবের লৌহ মানব উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আফ্রিকার ক্রীতদাস বিলাল (রাঃ)–কে সম্বোধন করেন সায়্যিদিনা বিলাল– আমাদের নেতা বিলাল। রাষ্ট্রপ্রধান ও তার ক্রীতদাসের অধিকার সমান। উমর (রাঃ) ও তাঁর দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রেসালাতে মোহাম্মদীর দৃশ্য অভিনব। মোহাম্মদী সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব অতুলনীয়। ক্রীতদাসের উটের রশি টেনে চলছেন দেশের সর্বোচ্চ মানুষ উমর। শ্রেষ্ঠ খান্দানের মেয়ে যয়নব বিন জাহাশকে বিয়ে দিচ্ছেন আযাদকৃত দাস যায়েদ বিন হারিসের নিকট। ইয়েমেনের আবু হোরায়রা, ইরানের সালমান ফারসী, রোমের সোহায়েব এবং আরবের শরীকদের মিশ্রণে যে আন্তর্জাতিক মিল্লাতের জন্ম হল তার নাম মিল্লাতে ইবরাহীমী– ইসলামী মিল্লাত। এ আন্তর্জাতিক মিল্লাতকে ইকবাল তাঁর কাব্যে এভাবে চিত্রিত করেছেনঃ

'সত্তা মোদের একদেশেতে বদ্ধ নয়,
মদ্য কড়া এক পিয়ালায় বদ্ধ নয়।
টুকরো মোদের পান–পিয়ালার হিন্দী চীন
তুরকী শামী মোদের দেহের মৃত্তি চিন।
অন্তর মম হিন্দী শামী নয় রুমী
ইসলাম ছাড়া নাই আমাদের জন্মভূমি।'

মুসলিম তুমি হৃদয় রুদ্ধ করোনা দেশে
হয়োনা লুপ্ত নশ্বর এই বিশ্বে শেষে।
মুসলিম কভু ধরেনা কোন দেশ সীমায়,
হৃদয়ে তার শাম আর রোম হারিয়ে যায়।
অন্তর ধর, কেননা বিশাল বক্ষে তার
লয় হয় এই মৃত্তি পানির ঘর দুয়ার।'

এ আন্তর্জাতিক দ্যোতি নিজেকে কোন খন্ডিত ভূখন্ডের মধ্যে সীমিত রাখে না। তার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। সে শাহীন পাখীর ন্যায় অল্পে সন্তুষ্ট নয়। শাহীন কোন বিশেষ ভূখন্ডের আকাশসীমায় নিজেকে বন্দী করে রাখে না। সারা নভোমন্ডলে তার অবাধ গতি। তার কর্মক্ষেত্র সারা নভোমন্ডল। সে রূপে আন্তর্জাতিক ইসলামী মিল্লাত একটি আদর্শবাদী আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দল বিশ্বমানবতার মুক্তি সাধনের জন্য তার সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করার দুর্বার সংগ্রামে সে লিপ্ত। দুনিয়াকে নতুন রঙ্গে সে রঞ্জিত করতে চায়। সমগ্র ভূখন্ড ইসলামী মিল্লাতের বিচরণ ক্ষেত্র। কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য সে নিবেদিত নয়। গোটা বিশ্বের জন্য সে নিবেদিত, গোটা মানবতার কল্যাণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তৌহিদের সোনালী চাবি দিয়ে সে সফলতার বদ্ধ দরজা খুলে দিতে চায়। 'তওহীদ ও রেসালাতের ভিত্তিতে গঠিত মিল্লাতে মোহাম্মদী কোন ভূখন্ডে সীমিত নয়' শীর্ষক কবিতায় আল্লামা ইকবাল ইসলামী মিল্লাতের বিচরণ ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেনঃ

নদীর মত বৃষ্টি জলে পুঁজি না চাও,
নিঃসীম হও, সীমার পাদে কভু না ধাও।
তিক্ত মুদী সাগর ছিল মুক্ত খল,
গ্রহণ করি তীর সে লাজে হইল বদল।
দিগ্বিজয়ী হইতে যদি চাও তুমি
করতে নত সবায় যদি চাও তুমি–
মাছের মত অথৈ জলে বিহার কর,
স্থানের ছোট বাঁধন শিকল ছিন্ন কর।
যে জন দিকের বাঁধন হতে মুক্ত হয়
আকাশ সম সর্ব দিকে ব্যাপ্ত হয়।
গোলাপ গন্ধ যখন ছড়ায় পুষ্পদল
ব্যাপ্ত হয়ে মত্ত করে কানন–তল।
কুঞ্জকোণে তোমায় যদি বন্ধ বান
বুলবুল সম একটি ফুলেই তুষ্ট থাক।

মলয়–সম তুষ্টি– বোঝা সোপণ কর
আলিঙ্গনে পুষ্প কানন গ্রহণ কর।
নবীন যুগে বঞ্চন থেকে সতর্ক হও,
তস্কর হতে পথিক ওগো সতর্ক হও।"

ইকবাল যে ইসলামী সমাজের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, যে সমাজের অবর্তমানে নিশীথ রাতে চোখের পনিতে বুক ভিজিয়েছেন, সে সমাজ যে দিন প্রতিষ্ঠিত হবে– সেদিন ইকবালের সাধনা বাস্তবায়িত হবে। যেদিন সুলতান মাহমুদ ও তাঁর ভৃত্য আয়ায সমাজের এক সারিতে দাঁড়াতে পারবে––সেদিন ইকবালের স্বপ্ন সার্থক হবে।

আল্লামা ইকবাল কাব্যের জগতে শাহীন। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট নন। তাঁর দৃষ্টি নীল দিগন্তে বিলীন। তিনি কোন খন্ডিত ভূখন্ডের কবি নন। সারা বিশ্ব মানবতার জন্য তাঁর কবিতার অর্ঘ্য।

প্রকাশনা প্রসঙ্গ

এ সংখ্যার বিন্যাস কিছুটা আলাদা করা হয়েছে। আমরা স্বরচিত প্রবন্ধ, অনুবাদ প্রবন্ধ, অনুবাদ কবিতা, পূনর্মুদ্রণ, পুস্তক সমালোচনা. ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় প্রবন্ধ ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাছাড়া সব লেখার ইংরেজী এবস্ট্রাক্টও ছাপা হলো। যাতে বিভিন্নভাষী আমাদের কার্যক্রম ও ইকবাল চর্চার বর্তমান উদ্যোগ সম্পর্কে একটা ধারনা পান। সংসদের ১৯৮৬ হতে ১৯৮৯–––এ চার বছরে একটি রিপোর্টও ছাপাহলো।

এ পর্যায়ে আমরা ফররুখ আহমদের ইকবাল প্রসঙ্গ সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধটি ফররুখ রচনাবলী ১ম খন্ড থেকে, সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত ঐক্য, সংহতি ও সংগঠন ইকবালের ১৯৩২ সালের সভাপতির ভাষণ নেয়া হয়েছে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে, রেনেসাঁ আন্দোলনঃ ইকবাল নজরুলের প্রভাব শীর্ষক প্রবন্ধটি জনাব মোহাম্মদ মাহফুজ উল্যাহর বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন নামক রচনা গ্রন্থ হতে, কবি আব্দুস সাত্তার, কবি ফারুক মাহমুদের অনুবাদ কবিতা ইকবাল চয়নিকা হতে নেয়া হয়েছে।

আমরা লেখক–অনুবাদকের খেদমতে আরজ করবোঃ যে–কোন প্রবন্ধ অনুবাদ প্রবন্ধ এবং অনুবাদ কবিতা পত্রিকার জন্য পাঠালে সংশ্লিষ্ট বিষয় যে–কোন কোটেশনের রেফারেন্স এবং ইংরেজী, আরবী ও উর্দুতে সামান্য উদ্ধৃতিও সন্নিবেশ করতে পারেন। আমরা যে কোন ব্যাপারে লেখকদের সাধ্যমত সহায়তা করার চেষ্টা করবো।

সংসদ পত্রিকা নবেম্বর '৮৮ সংখ্যায় আশরাফ আলী খানের শেকোয়ার অ নুবাদ ছাপা হয়েছিল, এ সংখ্যায় কবি গোলাম মোস্তফার জওয়াবে শেকোয়া অনুবাদ ছাপা হলো।

ইকবালের কাব্য দর্শন
প্রফেসর আঃ আঃ মোঃ আজিজ উল্লাহ

তৎকালীন ভারতবর্ষে ডক্টর স্যার মোহাম্মদ ইকবালের আবির্ভাব অসাধারণ ব্যাপার। ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তখন একটি বিশেষ দুর্যোগের দিন। মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন এবং ধ্বংসের ভস্মস্তূপের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন, তদুপরি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর মত একজন কবির আত্মপ্রকাশ শুধু আশ্চর্যজনকই নয়, কল্পনাতীত।

ইকবালের মন ছিল অত্যন্ত উদার। ইসলামের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস শুধু জন্মগত অধিকার লব্ধই নয়; আজন্ম ইসলামী শিক্ষা, দেশে-বিদেশে ইসলামিক ও পাশ্চাত্য দর্শন গবেষণা, অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সংগে পরিচিতি তাঁর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চিন্তাধারা এসব কিছুরই সুবর্ণ ফসল হলো এই বিশ্বাসের স্বরূপ। তাঁর মধ্যে সামান্যতম গোঁড়ামী ছিল না--কি রাজনীতির দিক দিয়ে, কি বিশ্বাস বা জীবনাদর্শের দিক দিয়ে। যদিও তিনি মুখ্যতঃ উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের কবি তথাপি তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদেরও আদর্শিক কবি। কারণ, তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তৌহিদের বাণী। তাঁর তুলিতে মুমিনের যে চিত্র অংকিত হয়েছে তা নিখুঁত মুসলিম আদর্শচিত্র, তার অগ্নিবীণায় যে শক্তিমন্ত্র বজ্র নিনাদে গর্জন করে উঠেছে তার মূল উৎস হচ্ছে কুরআনুল করীমের বিপ্লবময়ী বাণী।

ইকবাল শুধু মুসলিম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীর কবি নন, তিনি পাশ্চাত্য ও ইসলামিক শিক্ষা ও তমদ্দুনের মধ্যে যোগাযোগ সাধনেরও কবি। সভ্যতার ভিতর ভাবের আদান-প্রদান সাধনেরও কবি। ইউরোপের বিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর চিন্তাধারা সমতা রক্ষা করেছে। এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তার গন্ডিকে অতিক্রম করে তিনি নিজস্ব প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর ও মহত্তর সৃষ্টির সম্ভাবনায় মেতে উঠেছেন।

তাই দেখতে পাই যে, ইকবাল একদিকে যেমন তাঁর সগোষ্ঠীর দাবী মিটিয়েছেন, জাতীয় ইচ্ছা পূরণ করেছেন, অপরদিকে তেমনি বিশ্বকোষে তাঁর দানের অন্ত নেই, বিশ্বের দরবারে তাঁর প্রশস্তির সীমা নেই।

প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনি যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছেন-এতে সন্দেহ নেই। এ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ইসলামকে যাচাই করেছেন। অধ্যাপক তাবাসসুমকে লিখিত এক পত্রে তিনি একথা স্বীকার করেছেনঃ

Most of my life has been spent in the study of European philosophy and that view-point has become my second nature. Conscionsly or unconcionsly I study the realities and truth of Islam from the same point of view".

The Reconstruction of Religious. Thought in Islam"-এ তিনিবলেছেন,

"আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম ব্যাপার হলো পাশ্চাত্যের প্রতি ইসলামী জগতের দ্রুত আধ্যাত্মিক গতি। এ গতিতে কোন ত্রুটি নেই।......... আমাদের একমাত্র ভয় এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক আড়ম্বর না আমাদের গতি রোধ করে ফেলে এবং.......এ সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে আমরা অকৃতকার্য হয়েছি।"

ইকবালের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি বিদেশী সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান পাঠ করেছেন, তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু বৈদেশিকতার মোহ তাঁকে অন্ধ করে ফেলেনি, তাঁর জাতীয় চেতনাকে অবলুপ্ত করেনি। মোহমুক্ত দৃষ্টি, স্বাধীনচিত্ততা ও নির্লিপ্ত অন্তকরণ নিয়ে তিনি বৈদেশিক জ্ঞান রাজ্যে বিচরণ করেছেন। নীচের (Neitzsche) সাথে ইকবালের বহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আসরারে খূদীতে *"হীরক ও অঙ্গারের"* যে উপাখ্যান ভাগটি পাওয়া যায় তা নীচের থেকেই গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়।

"প্রভূত পরাক্রমশালী হও। শক্তির অনুভূতিকে (Feeling of power) যা কিছু বৃদ্ধি করে তা-ই হিতকর। যা কিছু দুর্বল থেকে যায় তা-ই অহিতকর। নীতিশাস্ত্র (Moral laws) ক্ষমতাপন্নকে দাবিয়ে রাখার জন্য দুর্বলের হস্তে অস্ত্র মাত্র"। এই হলো নীচের বাণী। এর প্রতিধ্বনি ইকবালের কাব্যে শুনতে পাওয়া যায়। আসরারে খূদীতে শেরে খোদা হজরত আলী (রাঃ)-এর নামের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল এই শক্তিবাদেরই প্রচার করেছেন।

পৃথিবীতে বাঁচতে হলে এক বিশেষ শক্তিরূপে বাঁচতে হবে। সে শক্তির প্রভাব পৃথিবীর বুকে হবে কায়েম। পৃথিবীটাকে ভেঙ্গে-চুরে মনের মত গড়ে তুলতে হবে। ধ্বংসের ভিতর দিয়ে নবতর সৃষ্টির উল্লাস উপভোগ করতে হবে। এতে যদি উর্ধ্বাকাশের বিরুদ্ধে অভিযানও করতে হয়; তাতেও নিরাশ হব না- এই হলো এর মূল কথা। আসরারে খূদীর অন্যত্র এ সুরই বজ্র

হয়; তাতেও নিরাশ হব না– এই হলো এর মূল কথা। আসরারে খূদীর অন্যত্র এ সুরই বজ্র নিনাদে বেজেউঠেছেঃ

পারস্যের কুঞ্জ থেকে তুমি গোলাব ফুল কুড়িয়েছো
ভারত ও ইরানের বসন্ত দিনের তুমি সাক্ষী,
এখন ফিরে চল আরবে,
এবার বুলিয়ে নাও সর্বদেহে তোমার
সেই উত্তপ্ত মরুর পরিচয়,
আর খেজুরের পুরানো সুরা
তুলে নাও তোমার ওষ্ঠাধরে
বাগানের বাসা বেঁধে থাকবে আর কত দিন?
এবার বাঁধ বাসা পর্বতের চূড়ায়
বিদ্যুৎ ও চন্দ্রের বুকে
ঈগলেরও নাগালের বাইরে
জীবন যুদ্ধে যুঝবার শক্তি
এভাবেইআসবে
দেহ ও আত্মাকে তোমার
পোড়াতে হবে জীবনের বহ্নিশিখায়।

আত্মবাদে (Egoism or Doctrine of self) উভয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে।

"তুমি নিজের আলোকে আলোকিত, আত্মাকে শক্তিশালী কর, স্থায়িত্ব লাভ করবে!"

অন্যের প্রদর্শিত পথে চলতে উভয়েই নারাজ।

জগত অনিশ্চিত মৃত্যু ও অবনতির পথে চলেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে নীত হয়েছেন। যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারি, কলুষিত নৈতিক ও রাষ্ট্রিক আবহাওয়া ইত্যাদি–এর পূর্ব লক্ষণ। পৃথিবীর এ অবস্থায় মোড় কি করে ফিরানো যায়। আধুনিক চিন্তাবিদদের সম্মুখে এ এক কঠিন সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তাঁরা দু'টি জিনিস আবিষ্কার করেছেন বিবর্তনবাদ (The Theory of Evolution) ও ইচ্ছাশক্তি এবং আদর্শ মানব (Superior) । মানুষের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তার ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে, এটা যারা বিশ্বাস করেন তাদের মধ্যে Lamarck, Bergson এবং Neitzsche–এর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। Darwin–এর কল্পনায় কিন্তু ইচ্ছাশক্তির কোন স্থান নেই। তাঁর মতে,

মানুষের পরিবর্তন নিয়তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মানুষের নিজস্ব কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। ইকবাল প্রথমোক্ত ব্যক্তিত্বের মতের পরিপোষক। ইসলামী জগতের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আর্থিক অবনতির চিত্র তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে, তাঁর ব্যথিত হৃদয় থেকে যে সুর বেরিয়েছে তা বিদ্রোহের বজ্র নির্ঘোষঃ

আজকে নালিশ তোমার নামে এই কি তোমার খোদায়ী কাম?
পাপীরা হয় জান্নাতি আর পুণ্যবানের জাহান্নাম?
মূর্খ নাদান হইল প্রধান, রত্ন মানিক ঢের তাদের
এদিকে মোরা সর্বহারা, কাদায় পড়ে রইল শের;
কাফের তরে গড়লে তুমি এই জগতেই স্বর্গপুর–
শোনাও মোদের ভুয়ো কথা মরণ পরে আসবে হুর;
নিভার আগে প্রদীপ যথা মরণ ভয়ে কম্পমান
তেমনি এ ক্ষীণ প্রাণের মাঝে কাঁপছে আমার ক্ষীণ ঈমান।

'*জওয়াবে শেকওয়া*'তে ফরিয়াদী তাঁর নালিশের জবাব পেয়েছেন। যে মহান আদর্শ, অদম্য উৎসাহ ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নিয়ে মুসলমান প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল তার কিছুই তার মধ্যে এখন বিদ্যমান নেই। তার আদর্শের বহু নিম্নে সে নেমে এসেছে বলেই আজ তার পতন হয়েছে। তাকে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির প্রয়াস করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ মানবের সৃষ্টির ভিতর দিয়েই জাতি তার হৃত স্বাস্থ্য, তার জীবনোচ্ছ্বাস, তার অপ্রতিহত গতিবেগ ফিরে পেতে পারে। আত্মাকে জানতে হবে, ইচ্ছাশক্তিকে করতে হবে তার পথের পাথেয়। Superman সৃষ্টির দাবী নিয়ে আধুনিক জগতে হাজির হয়েছে। গীথের পরিকল্পনায় যেমন "Ubermensch শোপেনহাওয়ারের Genius মৌলারের karl Moor, স্পেনোজোর Constus Preservandi নীচের Will to power, বের্গস'র Elan Vital, ইকবালের পরিকল্পনায় "Ego" বা খুদীও তেমনি এই দাবীরই অভিব্যক্তি। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ইকবালের সাথে তাঁদের বিশেষ করে নীচের বেশ সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এ সৌসাদৃশ্য বাহ্যিক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এঁদের সাথে ইকবালের পার্থক্য অনেক। নীচের কল্পনাকে ইকবাল বহুলাংশে অতিক্রম করে গেছেন। ব্যক্তিত্ববাদের (Doclrine of self) বাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল মানব জীবনের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ ব্যক্তিত্বহীন আত্মচেতনাবোধ শূন্য বাল্যাবস্থা, দ্বিতীয়তঃ আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানব অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষ কোন বাধাকেই মানতে চায় না। নিজের ব্যক্তিত্বকে (Personality) শক্তিবান করবার জন্য এমনকি সৃষ্টিকর্তাকে পর্যন্ত অস্বীকার করে। নীচে এ পর্যন্তই পৌছেছেন এবং এ পর্যন্ত এঁদের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ইকবাল কিন্তু এটাকে অতিক্রম করে তৃতীয় স্তরে পৌঁছেছেন। এ স্তরের মানুষ নিজের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। এই স্তরে মানুষ স্বীয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে পরম মঙ্গলময় খোদা তা'য়ালার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। সে নিজেকে পৃথিবীতে খোদা তায়ালার প্রতিনিধি হিসেবে মনে করে এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য করে তার প্রতিটি কাজ পরিচালিত হয়। এ অনুভূতির দ্বারা নীচের নিকট রুদ্ধ ছিল। তাই দেখতে পাই যে, তার Superman সম্পূর্ণ নাস্তিক, দয়া, ধর্মবিবর্জিত, নিতান্ত, নির্মম, প্রাণহীন শক্তির পূজারী *"The characteristics of the superman hardness and strength, pity, humility and justice cripple action"* ইকবালের Superman বা মুমিনের নিকট দয়া–দাক্ষিণ্য–ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ, শক্তিমানের পরিচায়ক।

"পর্বতের পাদদেশে কলভাষী তটিনীর অস্তিত্বের ন্যায় তার অন্তর করুণা ও অনুকম্পায় পরিপূর্ণ।"

ইনি দুনিয়াতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং শান্তির বাণী বহন করে আনবেন– এ পার্থক্য ইকবালের উক্তিতে অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে *"Nietzsche had a glimpse of the ideal but his atheism and aristocratic prejudice marred his whole conception"* কাজেই ইকবাল পাশ্চাত্য দর্শনাদি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন সত্য। কিন্তু তাঁর সৃজনী প্রতিভা তাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বৈদেশিকতার নাগপাশ কাটিয়ে উর্ধ্বোত্থিত হয়ে তিনি সত্য এবং সুন্দরের সৃষ্টি করেছেন।

ইউরোপের আধুনিক চিন্তা জগতের ভিত্তি স্থাপন করেন Bacon, ইনি যুক্তি (Reason) দিয়ে সব জিনিস যাচাই করেছেন। Descartes, Spinoza, Leibnitz, Locke থেকে আরম্ভ করে Dewey, Russell, Kilpartrick পর্যন্ত সবাই এরই পদাংক অনুসরণ করেছেন। পরিশেষে Bergson এবং Kant-এর আবিভাব ইউরোপের চিন্তা জগতে যুগান্তর আনয়ন করেছে। এঁরা নিছক Reasonএ বিশ্বাস করতেন না। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনার দ্বারা সব জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না বলেই এঁদের বিশ্বাস। ইকবাল উন্নত শিক্ষার এ অভিনব প্রণালী পরিপোষক ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষার জন্য বুদ্ধি বা বিচারশক্তি ইংরেজীতে যাকে বলে Intuition এতদুভয়েরই প্রয়োজন। প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টির উপর তিনি জোর দিয়েছেন বেশী। একেই তিনি 'এশক' বা প্রেম বলেছেন। "বিদ্যা পুস্তকের সন্তান (কিন্তু) এশক পুস্তকের জননী।" পুঁথিগত বিদ্যা বা বিচারশক্তি দ্বারা যা আয়ত্ত করা যায় না তা ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অন্তর্দৃষ্টি এশক বা জিহাদ দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। তাই তিনি উপদেশ

না তা ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অন্তর্দৃষ্টি এশক বা জিহাদ দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। তাই তিনি উপদেশ দিয়েছেনঃ *"পুঁথি পুস্তকে ধর্মের খোঁজ করো না। জ্ঞান-বিজ্ঞান পুস্তকজাত কিন্তু ধর্ম অন্তর্দৃষ্টি সাপেক্ষ।"* এই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায়-অন্যায় বোধ অতি তীক্ষ্ণ এবং তিনি ক্রিয়াশীল; সৃষ্টিই তাঁর ধর্মঃ

"বিদ্যা অনুসন্ধিৎসায় আনন্দ পায়, এশক সৃষ্টি করায় আনন্দ পায়, তার কার্যকলাপ থেকে নতুন কৃষ্টি ও নতুন সভ্যতার উৎপত্তি হয়।"

ইকবালের কাব্য বৈদেশিক ভাবধারায় প্রতিধ্বনি মাত্র বললে তাঁর প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হবে। তাঁর কাব্যকে বৈদেশিক ভাবধারার পরিপূরক বলা যেতে পারে। তিনি বহুবার বিদেশের জ্ঞান ভান্ডারে হানা দিয়েছেন। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় কেমব্রিজ ও মিউনিক থেকে বিপুল সম্মান লাভ করেছেন সত্য, কিন্তু Wordsworth এর Skylark-এর মত সুন্দর উর্ধ্বোত্থিত হয়েও তাঁর দৃষ্টি ছিল নিরন্তর গৃহপানে। তাঁর ধর্ম, তাঁর জাতীয় আবেষ্টনী, তাঁর কৃষ্টি করেছে তাঁর কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, আর বৈদেশিক ভাবধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান করেছে এর অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি।

। ২।

আকাশ-বুড়ো-সে চমকিয়া কয়ঃ কার কথা শুনি এইখানে ?
তারার কহিলঃ তাই ত! দেখ ত উপর-তলার আসমানে!
চাঁদ কহেঃ হাঁ! মাটির মানুষ হবেই এ ঠিক! তারি এস্বর !
কয় ছায়াপথঃ আমাদেরি মাঝে লুকালো কি সেই ধূর্ত নর !
রিদ্‌ ওয়ানই শুধু চিনিল আমারে-আমার করুণ জান্নাতে ,
দেখেছিল সে যে আমারে সেদিন -ছাড়িনু যেদিন জান্নাতে!

৩

ফিরিশতারাও চাঞ্চল হ'লঃ "কার এ আওয়াজ?" কয় তারা,
রহস্য এর জানিতে সকল আরশবাসীই হয় সারা!
মাটির মানুষ উঠিল কি আজ পবিত্র এই আরশ-পর ?
আদম-শিশু কি হ'ল এতবড় শক্তিময় ও ধূরন্ধর?
দুনিয়ার এই মানুষ গুলো-সে কত ধড়িবাজ! দেখেছ তাই!
রূঢ় ভাষায় কথা বলে এরা! আদব-লেহাজ মোটেই নাই!

। ৪।

এতই ইহারা বে-তমীজ্‌ ভাই! খোদার পানেও চোখ রাঙায়!
এই মানুষেরই পায়ে দিয়েছিল ফিরিশতাকুল সিজ্‌দা হায়!
জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব-কথায় ইহাদের জুড়ি নাহিক আর,
কিন্তু ইহারা উদ্ধত বড়! জানে না কোনই শিষ্টাচার!
এরাই-কেবল ভাষা জানে, তাই গুমর কত সে! বাপরে বাপ!
ভদ্র ভাষা ত শিখিল না কেউ! নাদানরা সব বদভাব!

ইকবালের দৃষ্টিতে পরাধীনতা
প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

দেশকে ভালবাসা, দেশবাসীকে ভালবাসা এবং দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। ইসলামের দৃষ্টিতে "হুব্বুল ওয়াতানি মিনাল ঈমান"। অর্থাৎ, দেশকে ভালবাসা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। যুগ যুগ ধরে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে তথা ইসলামী সমাজ-দর্শন ও জীবন-দর্শনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ষড়যন্ত্র চলে আসছে। এ ষড়যন্ত্রের ইতি আজও ঘটেনি। বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠী আজও কোন না কোন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েই আছে। ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধরে রাখা, ইসলামী মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখা আর জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্র (মুসলিম রাষ্ট্র হলেও)-এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার মানসে সীমান্ত অঞ্চলে এক ঘন্টা পাহারা দেয়া সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম ইবাদাত বলে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, পরাধীনতার মাঝে ইসলামী জীবন বোধকে ধরে রাখা, প্রতিষ্ঠিত রাখা মোটেই সম্ভব নয়। তাই, মহানবী (সঃ) স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার উপর অধিক গুরুত্বারোপকরেছেন।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের অগ্রসেনানী মহাকবি আল্লামা ইকবাল তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ "আরমুগানে হেজাজ"এর ৪র্থ কাব্যে "পরাধীনতাকে একটি চরম অভিশাপ" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আকর্ষণীয়ভাবে গল্পাকারে একটি চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করে বিষয়টিকে বুঝাবার সার্থক চেষ্টা করেছেন। কবর, মৃত ব্যক্তি ও মহান রাব্বুল আলামীনের মধ্যেকার একটি কাল্পনিক কথোপকথনকে আল্লামা ইকবাল যে-ভাবে প্রকাশ করেছেন, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছেঃ

এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো। ইতিমধ্যে হাজার হাজার বছর চলে গেলো। একদিন মৃত ব্যক্তি কবরকে জিজ্ঞেস করলো, ভাই কবর! অনেকের মুখে কিয়ামত-এর কথা শুনি। কিয়ামত জিনিসটি কি, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো। উত্তরে কবর বললো, পুনরুত্থানকেই কিয়ামত বলে। অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করার নাম কিয়ামত। আল্লাহর ইচ্ছায় যারা একবার দুনিয়াতে এসেছে, মৃত্যু তাদের জন্য অবধারিত। "কুল্লু নাফসিন জায়িকাতুল মাউত" অর্থাৎ, মানুষমাত্রই মরণশীল (আল-কুরআন)। প্রত্যেক মানব সন্তান মৃত্যুবরণ করার পর আবার জীবিত হবে- এটাই আল্লাহ তা'য়ালার স্বাভাবিক বিধান। কাজেই, কিয়ামত বা পুনর্জীবন লাভ মৃত্যুর অপরিহার্য পরিণতি। এতদশ্রবণে মৃত ব্যক্তি বিস্মিত হয়ে বললো, ভাই! আমার এরকম কোন মৃত্যু তো হয়নি, যে মৃত্যু আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত পৌছাবে এবং আমাকে পুনর্জীবন দান

করবে। কারণ, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে পরাধীন ছিলাম। ইসলামী জীবন দর্শন-এর পরিবর্তে পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী ছিলাম। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তে জাহেলী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুসারী ছিলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব আমি কোনদিন অনুভব করিনি । এ রকম চিন্তা-ভাবনা আমার মাঝে কোন সময়ই উদ্ভব হয়নি। এ কারণে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তোমার (কবরের) চরম পীড়াদায়ক ঘোর অন্ধকার আমার কাছে খারাপ লাগেনি। এমনকি পুনর্জীবন লাভ করার কোন ইচ্ছাই আমার মনে জাগ্রত হয়নি এবং এর কোন লক্ষণ আজও আমার মাঝে আছে বলে মনে হয় না। [এ কাহিনী-কাব্য ১৯৩৫ সালের পরে লেখা, এ সময় ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছিলো। আল্লামা ইকবাল মুসলমানদেরকে স্বাধীনতার পক্ষে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ কাব্যের অবতারণা করেন।] মৃত ব্যক্তির মুখে এসব কথা শুনে কবর হতবাক হলো। কারণ, বিগত জীবনে তার মধ্যে এ রকম অদ্ভুত মৃত আর আসেনি, সে দেখেওনি। এ আবার কেমন ধরনের মৃত- যে কিয়ামত-এর দর্শন পেতে চায় না। অন্য কথায়, পুনর্জীবন লাভ করতে চায় না। কবর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে চিন্তার জগতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। এমনি মুহূর্তে অদৃশ্য [আল্লাহর পক্ষ] থেকে আওয়াজ এলো-হে কবর! এতে তোমার বিস্মিত হবার কিছুই নেই, প্রকৃত তথ্য তোমার জানা নেই বলে তুমি মৃতের কথা শুনে হতবাক হয়েছ। মূল কথা হচ্ছে, পরাধীন ব্যক্তি বা জাতির জন্য চির-মৃতাবস্থা আমিই [খোদা] নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এ দুনিয়ার জীবনে যারা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অন্য জাতিকে অনুকরণ করে, অনুসরণ করে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যারা পরাধীন, স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ ও জাতি হিসেবে যাদের কোন পরিচয় নেই, স্বাধীনতা লাভ ও এর রক্ষার দায়িত্ববোধ যাদের চিন্তা-চেতনায় নেই। এমনকি, যাদের রূহ বা আত্মা স্বাধীন জীবনবোধ থেকেও বঞ্চিত-তারা চিরমৃত, তারা কোন দিন পুনর্জীবন লাভ করতে পারবে না। অনন্ত-অসীম সুখ-শান্তি লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইস্রাফীল (আঃ)-এর সিঙ্গার আওয়াজ শুনে শুধু তারাই নতুন জীবন লাভ করবে, যাদের আত্মা মৃত্যুর পূর্বেও জীবন্ত ছিল। অর্থাৎ, যারা স্বাধীন ছিল, স্বীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর ছিল। এক কথায়, পরাধীন জাতি মৃতের চেয়েও নিকৃষ্ট। পার্থিব জীবনে যারা পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ, তারা কি করে পুনর্জীবন লাভ করবে ? বস্তুত, তারা এর যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। মৃত্যুর পর প্রথম স্তর হচ্ছে কবর, কবর থেকে কিয়ামত এবং কিয়ামত থেকে আখেরাত পর্যন্ত এ স্তরগুলো অতিক্রম করে অনন্ত অসীম সুখ ভোগ এবং খোদা দর্শন লাভ করতে পারে শুধু স্বাধীন ও সার্বভৌম চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি বা জাতি। পরাধীন জাতি বা ব্যক্তি এ নেয়ামত আদৌ লাভ করতে পারে না।

একথা শুনে কবর আশ্বস্ত হলো এবং তার বিস্ময় ভাব কেটে গেলো। কবর মৃত ব্যক্তিকে ডেকে বললোঃ তোমার কথা শুনে আমি হতবাক হয়েছিলাম, অদৃশ্য শক্তি (আল্লাহ)-এর বর্ণনায়

মৌলিক বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি তোমাকে জানলাম, কিয়ামতকে জানলাম, কিয়ামতের অপরিহার্য দাবীও বুঝলাম। আর আমার নিজের অবস্থাও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। কবর বললো, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমি এ কবরস্তানের মালিক। আমার কবরস্তান ছিল সুন্দর, সুখময় ও আরামদায়ক। হঠাৎ আমার কবরস্তান অসহ্য গরম হয়ে গেছে, নিরানন্দ হয়ে উঠেছে, আভ্যন্তরীণ সুখ-শান্তি বিদায় নিয়েছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ আমি এত দিন খুঁজে পাইনি। আজই আমি বুঝতে পারছি যে, একমাত্র তোমার কারণেই আমার কবরস্তানের অমঙ্গল হলো এবং এ অশুভ পরিণতির শিকার হলো। তোমার কারণেই আমার কবর অন্ধকার আরো ঘোর অন্ধকারে রূপান্তরিত হলো। তোমার কারণেই আমি অপমানিত হলাম, ধীকৃত হলাম। আমি যদি জানতাম, তুমি পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ ছিলে, তোমার স্বাধীন, স্বকীয় চিন্তা-চেতনা বলতে কিছুই ছিলো না, তাহলে তোমার মতো অশুভ মৃতকে আমি আমার কবরে স্থান দিতাম না। কবরের পক্ষ থেকে এ রকম অপমান ও অসম্মানজনক বিবরণ শোনার পরও পরাধীন মৃত ব্যক্তির কোন চেতনাবোধ তো জন্মেনি বরং সে আরো নিথর, নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। এর জওয়াব দেয়ার মতো তার কোন হিম্মতও হয়নি; বরং, তার সে যোগ্যতাও ছিল না। কারণ, স্বাধীনভাবে জবাব দেয়ার মতো সৎ সাহস সে অনেক আগেই হারিয়েফেলেছে।

এর পর কবর মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে এই বলে মুনাজাত শুরু করলো, হে আল্লহ! তুমি আমাকে (কবর) এ-সব পরাধীন অপবিত্র মৃতের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করো, হেফাজত করো। হে আল্লাহ ! তুমি প্রত্যেকটি কবরকে পরাধীন মৃত ব্যক্তির কবল থেকে হেফাজত করো। হে ইস্রাফিল (আঃ) ! তুমি অনতিবিলম্বে তোমার সিঙ্গায় ফুঁক দাও, যাতে পৃথিবী এবং এর সবকিছু অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে চুরমার হয়ে যায়। তা হলেই আমরা কবর গোষ্ঠী এ অপবিত্র মৃতের অবস্থান থেকে মুক্তি পেতে পারি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কবরের মুনাজাতের জওয়াব দেয়া হলো এভাবেঃ

হে কবর! তুমি ছবর কর, ধৈর্য ধর। মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে এ জড়জগতের সবকিছুকে আমি ধ্বংস করে দেবো, চুরমার করে দেবো। তবে, এর জন্য একটা সময়সীমা দেয়া আছে। সে পর্যন্ত তোমাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আর সে মহাপ্রলয়ের দিনে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও তার ফলাফল স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ভাল কাজ করেছে, সে তার সুফল লাভ করবে আর যে মন্দ কাজ করেছে তার কুফল সে ভোগ করবে। হে কবর! তুমি লক্ষ্য করে দেখো, এ পার্থিব জগতে সামান্য ঘূর্ণিঝড় বা ভূমিকম্পের ফলে পুরাতন সবই ধ্বংস হয়ে পড়ে। আবার এরি মাঝে নতুন নতুন মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল, তরু-লতা ও জনবসতি গড়ে ওঠে। এমনিভাবে ইস্রাফিল (আঃ)-এর সিঙ্গার ফুঁকে কিয়ামত শুরু হবে এবং এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের সৃষ্টি হবে। এ পার্থিব জগতের সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে, চুরমার করে দেবে। এর পর আরেক নবজগতের সৃষ্টি হবে। নতুনকে গড়ার জন্য যেমনি পুরাতনকে ধ্বংস করতে হয়। তেমনি, কিয়ামতের মাধ্যমে দুনিয়ার জীবন তথা

জড় জীবনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হবে এবং এক অনন্ত–অসীম নতুন জীবন শুরু হবে, যার ইতি কোন দিন আর হবে না। কিন্তু, এ রকম অনন্ত–অসীম জীবনের সুখ–শান্তি কেবলমাত্র স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিকরাই ভোগ করতে পারবে। পরাধীন ব্যক্তি বা জাতি এ আনন্দ ও সুখ ভোগ থেকে চিরকালই বঞ্চিত থাকবে। সুতরাং, তাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বৃথা।

যমিন এতক্ষণ কবর, মৃত ব্যক্তি ও আল্লাহর মধ্যেকার কথোপকথন ধৈর্য ধরে শুনছিলো। এর পর যমিন তার কথা শুরু করে বললোঃ প্রকৃত পক্ষে পরাধীনতাই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ, বড় লা'নত। কারণ, এর পরিণতি হচ্ছে চিরমৃত–যা মানব জীবনের কাম্য নয়। আল্লাহ মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সঠিকভাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ইসলামী জীবন–দর্শনকে আদর্শ হিসেবে মনোনীত করেছেন। কিন্তু মানুষ ইসলামী জীবন–দর্শনের পরিবর্তে মানব রচিত ভ্রান্ত, জাহেলী ও বাতিল মতবাদ গ্রহণ করার ফলে মানুষের উপর মানুষের নেতৃত্ব–কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ শুরু হয়েছে। বিশ্ব মানবতাকে অপমানিত করে এক মানুষ অন্য মানুষকে দাস বা গোলামে পরিণত করেছে, শক্তিশালী জাতি বা গোষ্ঠী দুর্বল জাতি বা গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক শাসন–শোষণের মাধ্যমে সব সময়ই পদানত করার চেষ্টা করে আসছে। দুর্বলকে আরো দুর্বল করার নানা ষড়যন্ত্র ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং কুপরামর্শ দিয়ে স্বীয় স্বার্থ হাসিল করেই চলেছে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম মিল্লাতের অবস্থা আরো করুণ, আরো বেদনাদায়ক। ইকবাল বলেন, (১৯৩৫ সালের কথা) ভারত উপমহাদেশসহ গোটা মুসলিম দুনিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজদের গোলামে পরিণত হয়েছে। কারণ, মুসলমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্ভুল পথ থেকে বিচ্যুত। গোটা মুসলিম মিল্লাত কুরআন ও হাদীসের পরিবর্তে জাহেলী ও মানব রচিত মতবাদকে অনুসরণ করছে, অনুকরণ করছে। অনৈসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে সাথে স্বীয় নফসের দাসেও পরিণত হয়েছে। কাজেই, মুসলিম জাতি শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হারিয়েছে এমন নয়; বরং, ইসলামী জীবনবোধ ও মূল্যবোধ থেকে তারা অনেক অনেক দূরে সরে আসছে। পরাধীনতার কবলে পড়ে মুসলিম জাতির আকীদা–বিশ্বাসে চিড় ধরেছে, ইসলামী আন্দোলনের ধারণা লোপ পেয়েছে, ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের কথা মুসলিম সমাজে অনেকটা ডুমুরের ফুলের মতো হয়ে গেছে। ফলে, পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত হওয়ার কোন যথার্থ পদক্ষেপ নিতে মুসলিম মিল্লাত আজ ব্যর্থ হচ্ছে। কোন কোন মুসলিম অঞ্চল বা দেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে বটে, কিন্তু ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তে আজও তারা জাহেলী ও অনৈসলামিক দর্শনের উপর ভিত্তি করেই চলছে। তাই তো দেখা যায়, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েই আছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করেও এসব মুসলিম দেশ শিক্ষা–সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ নীতির ক্ষেত্রে, বিচার ও শাসনের ক্ষেত্রে আজও পরাধীনতার শৃংখলা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অতএব, হে মর্দে মুমিন! সাবধান।

আমরা ইকবালকে বুঝতে চাই
সৈয়দ তোসারফ আলী

'দিল সে জো বাত নিকলৃতি হায় আসর রাখতি হায়'–হৃদয় থেকে উৎসারিত যে বাণী তার প্রভাব অসামান্য। আল্লামা ইকবাল তার *'জওয়াবে শিকওয়া'* কবিতাটি শুরু করেছেন উদ্ধৃত পংক্তিটি দিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ইকবালের হৃদয় থেকে উৎসারিত কাব্য–ভাবনা অসাধারণ প্রভাব ফেলেছে চিন্তার জগতে। পৃথিবীর নানা দেশের, নানা ভাষার মানুষ পরম আগ্রহে ইকবাল চর্চা করে যাচ্ছেন। ইকবালের মত একজন যুগসচেতন মানবতন্ময় কবি কোনদিনই দেশ, কাল, সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। বাংলাদেশে এবং বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যে ইকবাল চর্চা হয়েছে তা উপেক্ষা করার নয়। আমাদের দেশের বিশিষ্ট কবি ও বুদ্ধিজীবী প্রফেসর সৈযদ আলী আহসান *"বাংলা কবিতার আসরে ইকবাল' শীর্ষক একটি নিবন্ধে বলেছেন, "ইকবাল বাংলাতে অনূদিত হয়েছেন প্রথমতঃ আমাদের হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে যোগসূত্র নির্ণয়ের জন্য, দ্বিতীয়তঃ ধর্মবোধের পোষকতা ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসার মীমাংসার জন্য।"*

ভারতের বাংলাভাষী লেখক–সাহিত্যিকদেরও অনেকে ইকবালের উপর আলোচনা করেছেন। বিশিষ্ট কবি ডঃ অমিয় চক্রবর্তী কবি ইকবালের কাব্য কাননে সাগ্রহে বিচরণ করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন *'সৌরভী কুঞ্জ'* সেখানে *'খর রৌদ্র ধূলিতে শ্যামল ছায়া মেলে আছে।' 'অগন্য মনোহর বীথি'* তাঁকেআহবান করে নিয়ে গেছে *' গভীর ভাবনার নির্দেশে'*। ইকবালের বহু কবিতায় *'বাক্যের ভঙ্গি, রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্ত দৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা'* অমিয় চক্রবর্তীর বিচারে *'উৎকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে তা উর্দু বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম করে সর্বমানবের চিত্তহারী'*। ডঃ চক্রবর্তী ইকবালের কবিতার আলোচনা করতে গিয়ে এটা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, *'মুসলিম ঐতিহ্যের স্মরণে স্বপ্নে, ভবিষ্যতের ছবিতে ইকবালের মন স্তরে স্তরে অভিষিক্ত ছিল। উপমায় অনুশাসনে কল্পনায় তিনি তার একান্ত পরিচিত অন্তরকে, সভ্যতাকে তাঁর কাব্যে উদ্ভাসিত করেছেন।'* অমিয় চক্রবর্তী মনে করেন, *'সাম্প্রদায়িক বিরোধকে তিনি লজ্জিত করেছেন প্রধানতঃ বিরোধের অতীতকে প্রকাশ করে; তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশলোকে সকলেরই প্রবেশাধিকার।'*

সাম্প্রতিককালে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য–সমালোচক শঙ্খ ঘোষ ইকবালের উপর দুটো প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধ দুটি তার *'ঐতিহ্যের বিস্তার'* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। *' কেন ইকবাল'* প্রবন্ধটিতে শঙ্খ ঘোষ ভারতীয় পটভূমিতে ইকবাল চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাঁর এই নিবন্ধের এক জায়গায় অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, *"রবীন্দ্রনাথ যদি নতুন সভ্যতার বিন্যাসের কথা ভাবতে গিয়ে তপোবনের ভারত বর্ষের বর্ণনা করতে পারেন, যদি পুরাণ বা উপনিষদের নানা শ্লোকে প্রশ্রয় খোঁজেন বারে বারেই, তাঁকে কি বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক ভাবি তখন? তবে ইকবালইবা কেন ভাবতে পারবেন না যে কোরানের মধ্যেই থেকে গেছে অনেক সমাধান–সূত্র? 'জাভিদ নামাহ্' বা শাশ্বতের গাথায় তিনি লিখেছিলেনঃ*

কোরান কাকে বলে? সে হলো ধনিকের মৃত্যু পরোয়ানা, আর
অন্নহারা যারা, সর্বহারা দাস, কোরান আশ্রয় তার।

আমরা যে যেখানে সকলে একাসনে বসেই রুটিজল খাই
আমরা আদমের বংশধর যারা, সবার এক আত্মাই।

মনের ভিতরে তা পৌছে যায় যদি, বদল হয়ে যায় মনে
বদল হলে মনে গোটা এ পৃথিবী সে মাতায় পরিবর্তনে।

এ হলো বিশ্বাসের একটা ধরন। এ বিশ্বাসে যে সকলে নির্ভর করবেন, তা নয়। কিন্তু এই ধরনটার অস্তিত্বকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করবার প্রবণতা আমাদের বাস্তববোধের অভাবটাকেই শুধু ধরিয়ে দেয়। যা আছে তাকে নেই ভেবে আমরা নিশ্চিতভাবে অনেক দূর এগোতে পারি না। অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?"

ইকবাল চর্চায় মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পায় এমন শঙ্কা যাঁরা করেন তাদের আশঙ্কাকে নাকচ করেছেন শঙখ ঘোষ তার আলোচনায়। তিনি বলেছেন, *"ইকবালের চেতনার কেন্দ্রে ছিল সাধারণ নিষ্পেষিত মানুষ, সমস্ত ইতিহাসের প্রবাহে সেই মানুষকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন অভ্যুন্নত, মুক্ত আর সমতাময়, এরই স্বপ্নাচ্ছন্নতায় তীব্র এক আবেগের ভাষায় তিনি লিখেছিলেন তার বিবৃতি–প্রধান কবিতাবলী, এরই আবেগে তিনি ধিককারে বিদ্ধ করেছেন সেই সমস্তকেই যা কিছু এর পরিপন্থী, সাম্যের বিপক্ষে যা কিছু এসে দাঁড়ায়। হয়তো বা এখনো অলীক, তবু ১৯৩২ সালে এই এক সমাজের ছবি ভাবতে চেয়েছিলেন ইকবাল তাঁর 'জাভিদ নামাহ্'তে, এমন এক দেশ যেখানেঃ*

যন্ত্রদানবের এমন জোর নেই করবে প্রকৃতিকে পালন
আকাশ সেই দেশে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার নয়,
কেবলই খাটছে যে কিষাণ, পাচ্ছে যে প্রদীপে আলো
তাদের নেই কোনো জমির মালিকের ভয়।
তাদের কৃষিকাজ সে নয় নিশিদিশি জলের চিন্তায় ম্লান
তাদের ফসলেতো অন্য কারো নেই হাত
সে–দেশে কোনোখানে সৈন্য নেই কোনো, নেই–বা ব্যূহনির্মাণ
খুনে বা সংঘাতে তাদের জুটছে না ভাত।
মিথ্যে লেখা আর মিথ্যে রটনার ছলে
মর্ঘদিনে কোনো লেখক মর্যাদা পান না
বাজারে বেকারেরা ভরে না পথ কোলাহলে
কানের পীড়া নেই আর্ত ভিখিরির কান্নায়।

এই স্বপ্নে যিনি এসে পৌছেছিলেন একদিন, আজ তাকে আমাদের সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য করা দারকার আমাদের নিজেদের ইতিহাসকে পরিচ্ছন্ন করে তুলবার জন্য। আমাদের নিজেদেরই স্বপ্ন–চরিতার্থতার পথগুলিকে নির্ভুল করবার গরজে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ইকবালকেও আমরা বুঝতে চাই আজ।"

বস্তুতঃ ইকবাল প্রতিভার উপর বিশেষ কোনো সীল মেরে তাঁকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। পাকিস্তানের ডঃ খলিফা আবদুল হাকিম *'আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল'* শীর্ষক একটি নিবন্ধে যথার্থই বলেছিলেন, *"গোঁড়া ধর্মতত্ত্ববাদীরা নিজেদের অনমনীয় মতবাদের সমর্থনে তাঁর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি দেন এবং পেশাদার ধর্মীয় চিন্তা–সাধকেরাও গোঁড়ামীর সমালোচনার জন্য তাঁর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি দেন। কম্যুনিষ্টরা তাঁর সমাজবাদী কবিতা ও মার্কস– লেনিনের প্রশংসাবাচক কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেন এবং কম্যুনিষ্ট বিরোধীরা তাঁর নাস্তিক্যবাদী বস্তুতন্ত্রের সমালোচনা থেকে উদ্ধৃতি দেন। গণতন্ত্রবাদীরা তাঁর*

গণসার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত কবিতা আবৃতি করেন এবং গণতন্ত্রের বিরোধীরা ইকবালের সেই বিখ্যাত কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেন যেখানে তিনি বলেছেন যে, নির্বাচনের বর্তমান প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মানুষকে গণনা করা হয়, ওজন করা হয় না এবং দুইশত নির্বাচিত গর্দভ একত্রে একজন সত্যিকারের স্বাধীনচেতা ও যুক্তিবাদী মানুষের সমান মস্তিষ্কের অধিকারী নয়।"

ইকবাল ছিলেন সত্য সন্ধানী। জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। সত্যকে তিনি পেতে চেয়েছিলেন এবং তা পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন দর্শন ও কাব্যের আঁধারে। জীবনকে সুস্থ এবং সুন্দরতর করাই ছিল তাঁর কাব্য ও দর্শন চর্চার উদ্দেশ্য। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর পরিচয়। তিনি তাঁর সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনে খুঁজে ছিলেন আধুনিক জীবন সমস্যার সমাধান। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের ফলিত রূপ দেখে তিনি নিরাশ হন। একইভাবে নিরাশ হন প্রাচ্যের ব্যক্তিত্ব বিনাশী ধর্মসাধনা প্রত্যক্ষ করে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিলোপ ও অদৃষ্টবাদী ধ্যান-ধারণার সংক্রমণ দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হন। ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও দর্শনের বিশাল ঐতিহ্যে অবগাহন করে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেন যে, প্রাকৃতিক ও পার্থিব শক্তিসমূহ থেকে আনুগত্য প্রত্যাহার করে এক আল্লাহ ও তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি সমর্পিত চিত্ত হয়ে জীবন যাপন ও জীবন গঠনের যে সুন্দর প্রকাশ ইসলামের উন্মেষ যুগে দেখা গিয়েছিলো তাকে মুসলিম সমাজ যথাযথভাবে ধরে রাখতে ও বিকশিত করতে পারেনি। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ইসলামী সমাজের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তা কাঙ্ক্ষিত পথে এগোয়নি। ফলে, দেশে দেশে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র মানুষকে নির্যাতিত, নিগৃহীত, পদানত রাখতে সক্ষম হয়েছে। মরমীবাদী ধর্ম সাধনা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা রাখেনি। বরং, এর সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। ধর্মের এই রূপকে ইকবাল নিন্দা করেছেন কঠোর ভাষায়। এক বক্তৃতায় ইকবাল বলেছেনঃ *Tasawwuf is always the sing of decline of a nation. Greek myticism, Persian myticism, Indian mysticism all are sings of decline of these nations, the same is true of Islamic mysticism ...Any philosophy or religious teaching that prevents the blossoming of the human personality is worthless."*

তিনি এই উপলব্ধি থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিত্ব বিকাশের দর্শনকে তাঁর 'আসরার-ই-খুদী' (খুদীর রহস্য) কাব্যে ভাষা দেন। শক্তিহীনকে শক্তিমান করে তোলাই ছিল তাঁর আজীবনের সাধনা। চড়ুই পাখীকে তিনি বাজ পাখীর সংগে লড়বার শক্তি ও সাহস যোগাতে চেয়েছেন। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এই কবি-দার্শনিক মানুষের হাতে মানুষের গোলামী ও দাসসুলভ জীবন যাপনকে কোনভাবে মেনে নিতে পারেননি। সমকালীন অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য তিনি ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন প্রয়াসী হয়েছেন। অসাধারণ প্রাঞ্জল ইংরেজী বক্তৃতাবলীর সংকলন *'The Reconstruction of Religious thoughts in Islam'* গ্রন্থটি পড়লে ইকবাল-মানসের এই স্বরূপ স্পষ্ট বোঝা যায়।

আর মাত্র একটি দশক পর আমরা একুশ শতকে পা রাখবো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা যে দ্রুতলয়ে এগুচ্ছে তাতে মনে হয় একুশ শতকের পৃথিবী আগের যে কোনো শতকের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে। বিজ্ঞানের শিখরস্পর্শী অগ্রগতির কল্যাণে আমাদের এই পরিচিত পৃথিবী এখনই আক্ষরিক অর্থে ছোট হয়ে এসেছে। জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, নির্বিশেষে মানব সমাজের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান বিস্ময়কররূপে বেড়ে চলেছে। সেই সংগে বাড়ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান। আশা করা যায় আগামী শতকে মানুষ শুধু দিন যাপন আর পাণ ধারণের গ্লানি থেকে বহুলাংশে মুক্তি পাবে। উৎপাদন ও পরিভোগে নবতর যুগের সূচনা হবে। মারণাস্ত্র নির্মাণে বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় হাস্যকর ব্যাপার হয়ে

দাঁড়াবে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞান একুশ শতকের মানুষকে একটি একক পরিবারে সংহত হবার বৈষয়িক ভিত্তি যোগাবে। আর এই একক পরিবারকে একটি ভ্রাতৃসমাজে রূপান্তরিত করার আদর্শিক ভিত্তি মানব সমাজ পেতে পারে কোরাআনের ঐক্যমূখী একেশ্বরবাদী দর্শনে। যার আধুনিক ব্যাখ্যা এবং স্বরূপ ইকবাল তাঁর কবিতায় ও দর্শনে উপস্থিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

এতোকাল মানুষের বিবেককে আমরা মানুষের রিপুর কাছে পরাজিত হতে দেখেছি। মানুষের প্রেম পরাজিত হয়েছে হিংসার কাছে। লাভ ও লোভের কাছে পরাভূত হয়েছে মানবতা। মানব জাতিকে বিভক্ত, একের প্রতি অপরকে সন্দিহান ও বিদ্বিষ্ট রাখার কারসাজিতে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু অকল্যাণ বিলাসী শয়তান যথেষ্ট সফল হয়েছে বলা যায়। এই শয়তানী কারসাজির চমৎকার উদঘাটন। আমরা দেখতে পাই ইকবালের 'ইবলিস–কি–মজলিস–ই–শূরা (শয়তানের মজলিস) কবিতায়। ইকবালের কাব্যে, ইকবালের দর্শন ভাবনায় এই শয়তানী কারসাজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সুস্পষ্ট দিক–নির্দেশ রয়েছে। আমরা যারা ইকবালকে বুঝতে চাই তারা কি আমাদের সময়ের শয়তানী কারসাজিকে সনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ইচ্ছা রাখি? এই প্রশ্নের সদার্থক জবাবের উপর নির্ভর করছে সার্থক ও অর্থবহ ইকবাল চর্চা।

। ক।

হঠাৎ আসিল কারাম–ই–আযীমঃ তোমার এ গানে কাঁদায় প্রাণ,
হৃদয় হইতে উছলিয়া–পড়া তোমার প্রেমের এই সে গান।
আকাশেরও দিল কেদে ওঠে আজ তোমার করুণ কান্নাতে,
বুঝিয়াছিঃ এই গান আসিয়াছে কত না গভীর বেদনাতে।
'শিকওয়া' এ নয়, –প্রশান্তি মোর! এমন বাচন–ভঙ্গী তার,
বান্দা এবং খোদার মাঝারে বাঁধিয়াছ সেতু চমৎকার!

খ।

দান–ভান্ডার খোলাই ত মোর; সে দান নেবার সায়েল্ কৈ?
কারে আমি বল পথ দেখাইব, পথ চলা সেই পথিক বৈ?
শিক্ষা ত মোর সবার তরেই, কোথায় বল না ছাত্র তারা?
যেই মাটি দিয়ে গড়িব আদমে, সেই মাটি কই পাচ্ছি আর!
যোগ্য জনের শীর্ষেই আমি রত্ন–মুকুট দেই আনি,
নূতন পৃথিবী–তাও পেতে পারে থাকে যদি তার সন্ধানী!

। গ।

হৃদয় তোমার ঈমান–বিহীন, বাজু সে তোমার শক্তিহীন,
তোমরা নবীর উম্মৎ? হায়! শরমে তাঁহার মুখ মলিন!
বুৎ–ভাঙা দল বিদায় নিয়েছে বাকী যারা তারা গড়িছে বুৎ,
'ইব্রাহিমের ছেলেরা এখন 'আযর' সেজেছে– কী অদ্ভুত!
শারাব, জাম ও পানকারীদের দেখছি এখন নূতন সব,
কা'বাও নূতন বুৎও নূতন! চলিছে মজার কী উৎসব!

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ও ডঃ ইকবাল

কানিজ-ই-বাতুল

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ও ডঃ ইকবালের ভাবধারায় অনেক ক্ষেত্রেই ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা উভয়েই ছিলেন জীবনের সাহিত্যিক ও জীবনের কবি। তাঁরা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখে গেছেন। উভয়েই ছিলেন আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, জাতীয় জাগরণের নকীব, মানসিক বিপ্লবের অগ্রনায়ক, চিন্তাবিদ, উর্দু সাহিত্যের দিক-দর্শক, সর্বোপরি উপমহাদেশের বিশিষ্টদিশারী।

স্যার সৈয়দ এবং ডঃ ইকবাল সমসাময়িক ছিলেন না। সাহিত্য-জগতে এঁদের বিচরণ শুরু হয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং তা শেষও হয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। এঁদের সাহিত্য ও কাব্য রচনারকালও ছিল অনেকটা স্বতন্ত্র।

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর এক প্রখ্যাত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ঐ যুগটা ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত শোচনীয়। ঐ যুগেই মুসলিম শাসনের সূর্য (১৮৫৭) অস্তমিত হয় এবং সমগ্র ভারত বৃটিশ শাসনের অধীনে চলেযায়।

স্যার সৈয়দ মোগল দরবারের নিভু নিভু প্রদীপ এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দেখে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত আঁচ করতে সক্ষম হন। তিনি অনুধাবন করলেন যে, আজ না হোক অদূরভবিষ্যতে উপমহাদেশের বুকে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবেই। তাই, তিনি পূর্ব থেকে ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন।

স্যার সৈয়দ ১৮৩৮ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে দিল্লীর সদর আমীন কোর্টে সেরেস্তাদারের চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে মোগল দরবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইংরেজদের অধীনে চাকরি করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কথায় সায় দেননি। কারণ,তিনিছিলেনদূরদর্শী।

ডঃ ইকবাল চোখ মেলে দেখলেন, ইংরেজরা ভারতবাসীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এখানে চিরদিন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে। তাই তিনি '*হিমালা*' ও '*তারানা-ই-হিন্দী*' নামক কবিতা লিখে দেশপ্রেম, ঐক্য ও ভালবাসার শিক্ষা দেন। এ সময় ইকবালের চিন্তাধারা ছিল ভৌগলিক সীমারেখাভিত্তিক। তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। উর্দু কবি মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ এবং আলতাফ হোসাইন হালীর স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা তাঁর মনে অনেকটা দেশপ্রেম সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বিলাত থেকে ফিরে আসার পর তাঁর এ চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়ে জাতীয়তাবাদেররূপ নেয়।

বিলাত যাওয়ার আগে তিনি *তারানা–ই–হিন্দী* কবিতায়বলেছিলেনঃ

সকল দেশের সেরা মোদের এই হিন্দুস্তান;
এই বাগানের বুলবুলি মোরা মোদেরই এই বাগান।

বিলাত হতে ফিরে তিনি "*তারানা–ই–মিল্লী*" (জাতীয় গান) কবিতায় বলেনঃ

চীন আমাদের, আরব আমাদের, হিন্দুস্তানও আমাদের,
আমরা মুসলমান সারা জাহান আমাদের।

স্যার সৈয়দ আহমদ ও ডঃ ইকবালের সাহিত্যের সবচাইতে বড় দিক ছিলো তাঁদের মুসলিম জাতীয়তাবাদ। মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বি–জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারত বিভক্ত হয় এবং মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক বাসভূমি পাকিস্তানের জন্ম হয়, আর সেই পাকিস্তান থেকেই আমরা হাসিল করি আযাদ বাংলাদেশ।

ডঃ ইকবালের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার নয়। এর ইতিহাস খুঁজতে হবে আরো অতীতে, আরো গভীরে অর্থাৎ হাদীস–কুরআন ও মুসলিম ইতিহাসের মধ্যে। এর প্রচার হয়েছে দেশে–দেশে, যুগে–যুগে। কিন্তু মোগল সম্রাট আকবরের (১৫৫৩–১৬০৫) দ্বীনে এলাহীর প্রচার এবং হিন্দু জাতির প্রতি তাঁর অশোভন হৃদ্যতার ফলে মুসলমানদের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ এক মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব, আলমগীর (১৬৫৮–১৭০৭) এবং শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবীর (১৭০৩–১৭৬১) ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা অনেকটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা–দীক্ষা ও সংস্কৃতি জোরদার হয়ে উঠে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব–কলহের দরুন তাঁদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের দর্শন ও সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বজাত্যবোধে ভাটা পড়ায় মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং এ উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৫৭) বৃটিশ শাসন, যার ফলে মুসলমানরা হিন্দু এবং ইংরেজ উভয়েরই পদতলে চলে যায়।

এই শোচনীয় অবস্থার যুগে মুসলমানরা কেবল মান–ইজ্জতই হারায়নি, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধও হারিয়ে বসেন। এমন সময় তাঁদের ভাগ্যাকাশে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ন্যায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উদয় হয়। তিনি দশ বছরকাল (১৮৫৭–৬৭) তাদের সাথে বুঝাপড়া করে দেখলেন যে, তাদের সাথে সহযোগিতা করার মানে হলো আপন জাতির পায়ে কুঠারাঘাত করা। হিন্দু নেতাদের বিরুদ্ধে মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি আপন মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তাই তিনি কুরআনে উল্লেখিত মুসলিম জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক মতবাদরূপে দাঁড় করান। এখানেই তার উপমহাদেশীয় যুক্ত জাতীয়তাবাদ বিদায় নেয়।

মোটকথা, ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদই সর্বপ্রথম মুসলিম জাতীয়তাবদকে একটি রাজনৈতিক মতবাদরূপে গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম 'কওম' শব্দটি মিল্লাতের অর্থে ব্যবহার করেন। এর পর থেকে মুসলিম লেখকগণ 'কওম' বলতে মুসলিম জাতিকেই বোঝাতে থাকেন।

স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে জোরালো হয়ে উঠে। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর উপমহাদেশে কিছু দিন ধরে হিন্দু-মুসলিমের মিলনধর্মী রাজনীতি চলতে থাকে। এতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেকটা চাপা পড়ে যায়। এ সময় বিলাত থেকে সদ্য ফেরৎ ডঃ ইকবাল স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই জাতীয়তাবাদ ছিল একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। কারণ তাঁর মতে, ধর্ম ও রাজনীতি ছিল অভিন্ন। তিনি বলেন, ধর্মের জন্যেই রাজনীতির আশ্রয় নিতে হয়। তাই, ধর্মই পরিচালিত করবে রাজনীতিকে। ডঃ ইকবালের মতে, ধর্মের প্রকৃত অনুসারেই হবে মুসলিম রাজনীতির প্রকৃতি। ধর্মই নিয়ন্ত্রণ করবে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি। তিনি যরব-এ-কলীম গ্রন্থে বলেনঃ

রাজনীতি থেকে ছুটে যায় যদি ধর্মনীতি
তবে থেকে যাবে শুধু চেংগিসের নীতি।

স্যার সৈয়দ এবং ইকবাল স্বাতন্ত্র্যধর্মী রাজনীতির পক্ষপাতী হলেও তাঁদের জাতীয়তাবাদে কিছুটা তফাৎ রয়েছে। স্যার সৈয়দ আহমদের জাতীয়তাবাদে ছিল রাজনীতির প্রাধান্য। কিন্তু ডঃ ইকবালের জাতীয়তাবাদে ছিল ধর্মের অগ্রাধিকার। ইকবাল মুসলমানদের কাছে কেবল স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদই প্রচার করেননি, তিনি তাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যও স্থির করেন। তাদের স্বতন্ত্র তমদ্দুনের কথাও তিনি বার বার উচ্চারণ করেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর নীতি ছিল ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপনের নীতি, আত্মনির্ভরশীলতার নীতি, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী হওয়ার নীতি। তাই, তিনি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত বৃটিশ সরকারের ছায়াতলে থেকে আলীগড়ের গঠনমূলক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জাতিকে উৎসাহিত করেন। অতীতের পানে মুখ ফিরিয়ে দেখলেও তিনি প্রাচীন জীবন পদ্ধতিকে বর্তমান যুগে বিচার নির্বিশেষে অনুসরণীয় বলে মনে করেননি। তিনি অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখা মোটেও পছন্দ করেননি। তাই তিনি জাতিকে যুগের সংগে তাল মিলিয়ে চলার উপদেশ দেন।

অন্যদিকে ডঃ ইকবাল বলেন, *চোখ বন্ধ করে কালের গতিকে মেনে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কালের গতি যদি আপন মর্জী মত না হয়, তবে লড়াই করে তাকে আপন রুচিসম্মত করে নিতেহবে।*

তিনি বলেনঃ *কালের সংগে তাল মিলিয়ে চলাটা নির্বোধেরই কথা। কাল তোমার সাথে সহযোগিতা করবে না। তুমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা কর।*

এই কথাটি আমাদের জানা দরকার যে, সামাজিক চেতনাই বিশ্ব-সভ্যতার উৎসমূল। স্যার সৈয়দের সমাজ দর্শনের গোড়ার কথা হলো পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, সহানুভূতি, একের স্বার্থের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা ও ঐক্যানুভূতি। কারণ, এ ধরনের উপলব্ধিই সমাজের প্রাণ। তাঁর মতে, এরূপ অনুভূতির ফলেই জন্ম লাভ করেছে সামাজিকতা এবং তা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছে বিশ্ব-সমাজ ও বিশ্ব-সভ্যতা।

স্যার সৈয়দ বলেনঃ *সমাজ হলো মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র আধার, সামাজিক মূল্যবোধ থেকেই মানব প্রেমের সৃষ্টি। কারণ, মানুষ সামাজিক জীব বলেই তাদের সামনে অনেক প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সামাজিক প্রয়োজনই সৃষ্টি করেছে তামুদ্দুনিক প্রয়োজন, জাতীয় প্রয়োজন, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন এবং আরো কত প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা অনেক ক্ষমতা নিহিত রেখেছেন। সেসব শক্তি বলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে এবং সমাজে বাস করেই তারা তা পূর্ণ করে থাকে।*

সমাজ ছাড়া তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হতে পারে না। মানুষ সামাজিক বন্ধনের মাঝে থেকেই আপন আত্মা ও ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় করে তুলবে।

ডঃ ইকবাল এ মতের প্রতিধ্বনি করে বলেনঃ ব্যক্তিজীবনের সম্পর্ক জাতীয় জীবনের সাথে থাকলেই তা অর্থপূর্ণ হয়। নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তি জীবন নিরর্থক। তরঙ্গ থাকে নদীতে, নদী ছাড়া তরঙ্গের কল্পনাও করা যায় না।

ডঃ ইকবাল আরো বলেনঃ আমি ঐ মানুষের সামনে আপন শ্রদ্ধা নিবেদন করবো, যে আল্লাহর বান্দাদেরকেভালবাসে।

মূল কথা হলো এই যে, ডঃ ইকবাল তাঁর কাব্যে '*খুদী*' (ব্যক্তিত্ব গঠন) ও '*বে-খুদী*'র (আত্মোৎসর্গকরণ) যে দর্শন দিয়েছেন, স্যার সৈয়দ সেটার গোড়ার কথা অনেক আগেই উচ্চারণ করেছিলেন। ডঃ ইকবাল স্যার সৈয়দের উপস্থাপিত ব্যক্তিত্ব ও সভ্যতা বিকাশের মূল শিক্ষাকে উচ্চতর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেনঃ *প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাধা-বন্ধন ঠেলেই মানুষ আপন ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা সাধন করে।*

তিনি বলেনঃ

"*আগার-খাহী-হায়াত-আন্দার-খাতার-যী*জীবন যদি পেতে চাও, তবে বেঁচে থাক বাধা-বিপত্তি আর ত্রাসের কোলে। তিনি আরো বলেন, সমাজে ব্যক্তিত্ব-রূপ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ও

আত্মোৎসর্গ করাই হলো বে-খুদী, যাকে মানবপ্রেম ও মানব সভ্যতা বিকাশের সোপান বলা যেতেপারে।

স্যার সৈয়দ আহমদ স্ত্রী লোকদের ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কেবল ধর্মীয় এবং চারিত্রিক শিক্ষাকেই তাদের জন্যে যথেষ্ট বলে মনে করতেন। তিনি ভাবতেন, পুরুষরা শিক্ষিত হলে তারাই নিজ পরিবারের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। স্যার সৈয়দ স্ত্রীলোকদের জন্য পর্দার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ডঃ ইকবাল মেয়েদের জন্য জ্ঞান অর্জন করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, মেয়েরা ঐ জ্ঞানই অর্জন করবে, যাতে দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই আলোকিত হয়। দ্বীনকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষা হাসিল করা হবে, তা পতনই ডেকে আনবে। ডঃ ইকবাল তাঁর 'যরব-এ-কলীম' গ্রন্থে বলেনঃ যে শিক্ষার ফলে নারী নারিত্ব হারায়, জ্ঞানীগণ সেই শিক্ষাকে মৃত্যুর কারণ বলে অভিহিত করেন। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে যদি নারীর কোন পরিচয় না থাকে, তবে সেই বিদ্যাবুদ্ধি পারিবারিক জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে।

তিনি আরো বলেন যে, স্ত্রীলোকদের প্লেটো না হয়ে প্লেটো উৎপাদন করাই বাঞ্ছনীয়। স্যার সৈয়দ জাতিকে ইংরেজ শাসন মেনে নেয়ার উপদেশ দেন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেন। কিন্তু ডঃ ইকবাল পাশ্চাত্য তাহজীব ও তমদ্দুনকে জাতীয় আদর্শের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয়ার তাকিদ দেন।

ডঃ ইকবাল 'হাকীমুল উম্মত' তথা জাতীয় চিকিৎসক খেতাবে ভূষিত হন। তাঁর এ উপাধির যথার্থতায় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তিনি জাতি-দেহের রোগ নিরূপণ করেই ক্ষান্ত হননি, সে ব্যাধি থেকে নিস্তার লাভের পথও চিহ্নিত করেন।

স্যার সৈয়দ ও ডঃ ইকবালের শিক্ষা কেবল মুসলিম জাতির জন্যই নয়। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা সকল দেশের জন্য, সকল জাতির জন্য। তাঁরা মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েছেন বলেই ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হননি। তাঁরা বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে অনুধাবন করলেন যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। তাঁরা ইসলামকে নিছক বিশ্বাসের বস্তু বলে মনে করেননি। তাঁদের মতে, ইসলাম পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। স্যার সৈয়দ ও ডঃ ইকবালের ভাবধারায় যথেষ্ট মিল থাকলেও তাঁদের মধ্যে যে গরমিলটুকু রয়েছে, তাও লক্ষ্য করার মতো। স্যার সৈয়দ ছিলেন আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রচারক, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, ঐতিহাসিক। ডঃ ইকবাল ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত উর্দু ও ফার্সী কবি, দার্শনিক, আইনবিদ ও বিচক্ষণরাজনীতিক।

তাঁদের উভয়ের অন্তর ছিল ইসলামী জোশে ভরা। জাতি উভয়ের কাছে ঋণী। জাতীয় জাগরণ ও আযাদী আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্য নির্দেশ

১. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮২ ইং

২. আযীয আহমদ "ইকবাল কী নয়ী তাশ্‌কীল", রইস আহমদ জাফরী, "ইকবাল আওর সিয়াসত-ই-মিল্লী"

৩. "জাদীদ উর্দু নসর" নজীর আহমদ সংকলিত, পৃঃ ১৭১, প্রকাশিত ১৯৬৬ খ্রীঃ

৪. মাকালাত-এ-স্যার সৈয়দ আহমদ, পৃঃ ১২-১৩

৫. আব্দুর রহমান তারেক "জাহান-ই-ইকবাল" পৃঃ ৪৬৩, প্রকাশিত-১৯৪৯ খ্রীঃ, মওলানা আবদুস সালাম নদবী, "ইকবাল-ই-কামিল" পৃঃ ৩৬৫, প্রকাশিত ১৯৬৪ খ্রীঃ

।৮।

তোমরাই ছিলে উৎস একদা সত্য এবং সুন্দরের
লালা-ফুল সম ফুটিয়া উঠিতে অগ্রপথিক বসন্তের!
খোদার প্রেমিক ছিল সকলেই-যেই দিন ছিলে মুসলমান।
'হরযায়ী' এই খোদার পায়েই করেছিলে সবে আত্মদান।
যাও না এখন পূজা কর গিয়ে নূতন কোন-সে 'একযায়ীর'?
খণ্ডিত কর মহামানবতা বিশ্বপ্রেমিক নূরনবীর!

।৯।

ফযরে উঠিয়া নামায পড়িতে পাও তুমি আজ কষ্ট ঘোর
আমারে ভুলিয়া অলস-আবেশে নিদ্‌মহলায় রও বিভোর।
প্রগতিপন্থী তুমি ত এখন! রাখো নাক' রোজা রামজানে
এই কি তোমার প্রেমের নিশান ? 'ওফাদারী'র কি এই মানে
ধর্ম দিয়েই মিল্লাৎ গড়ে, ধর্মহীনের নাহিক মান,
আকর্ষণ না রইলে রহেনা চাঁদ-সিতারার আঞ্জুমান!

।১০।

কর্মবিমুখ অলস যাহারা-তোমরাই হ'লে সেই জাতি,
স্বদেশের প্রতি নাহিক' দরদ, উদাস খেয়ালে রও মাতি।
বজ্রপাতের অনুকূল তব জীর্ণ গৃহেই পড়িছে বাজ,
বাপদাদাদের মাজার বেচিয়া বেশ ত সবাই খেতছ আজ!
কবর লইয়া তেজারতি করে যেসব ঘৃণ্য-ব্যবসাদার
মূর্তি পেলে যে বেচিবে না তারা-কোথায় তাহার অঙ্গীকার?

ইকবাল সাহিত্যে নও–মুসলিম প্রসঙ্গ
মুহাম্মদ সাখি মিঞা

আল্লামা ইকবাল স্রেফ কবিই ছিলেন না, তিনি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকও। মুসলিম জাতির উথান–পতনের অনিবার্যতা সম্পর্কে তিনি সদা সচেতন ছিলেন। তাঁর দর্শন এবং চিন্তাধারা কোরআন ও হাদীসের উপর নির্ভরশীল। বিশ্ব মানবের বৃহত্তর কল্যাণ ও বিশ্ব শান্তি যে একমাত্র ইসলামেই নিহিত, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্য যে কোন ধর্ম–মত, পথ–দর্শনই যে কার্যকর নয়; তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

ডঃ ইকবাল এটাও গভীরভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্ব বনী ইসরাইলের খোদাদ্রোহিতা ও নবী–বিরোধিতার জন্যে তাদের কাছ থেকে সে দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর কাছে অর্পণ করেছেন। সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা "*দাওয়াত ইলাল হক ও দাওয়াত ইলাল ইসলাম*"–এর কাজে নিয়োজিত থাকবেন।

এক বৈঠকে ডঃ ইকবাল তাঁর জনৈক বন্ধু কাজী আব্দুল মজিদ কোরাইশীকে বলেছিলেন, '*আমাদের দেশে–গ্রাম ও পাড়ায় যেসব নও–মুসলিম স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে, তাঁদের ইসলাম গ্রহণ করার অনুভূতি ও আকাঙক্ষা জাগার হেতুগুলো যদি প্রকাশ এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা হতো তাহলে আমার বিবেচনায় তাবলীগে দ্বীনের উদ্দেশ্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হতো। একথা ঠিক যে, ইসলামের সত্যতার পক্ষে বহু যুক্তিপ্রমাণ বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও অনুভূতিতে বিস্ময়কর ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রমাণেরও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে বৈ কি। মন–মস্তিষ্কের কার্যপন্থায় ব্যবধান অনেক। ইসলাম গ্রহণের সম্পর্ক যতটা না মস্তিষ্কের সাথে তার চেয়ে লাখোগুণ বেশী মনের সাথে। মস্তিষ্ক অনেক সময় দুর্বলতর বস্তু দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারে; যার ফলে জীবনের সমস্ত গতি–প্রকৃতিই পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্তরের কার্যকারিতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত পক্ষে মুসলিমদের অনুধাবন করতে হবে, কোন কোন বিষয় মানুষের মনে বেশী রেখাপাত করে এবং মন প্রভাবিত হয়। হালকা বা চটুল কোন বিষয় মস্তিষ্ককে সাময়িক উত্তেজিত করতে পারে। কিন্তু, তা মনের উপর দীর্ঘস্থায়ী ছাপ আঁকতে পারে না। ইসলামের ইতিহাসে কাফের ও মুশরিকদের চরম ইসলাম বিদ্বেষ ও নবী–বিরোধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ভুরি ভুরি প্রমাণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তাদের পৈতৃক ধর্ম বিশ্বাস, যার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল ইস্পাৎ–কঠিন মহীরূহের মতো; নিমেষে সেই ধর্ম বিশ্বাসে ছেদ টেনে ইসলাম কবুল করার সংখ্যাতীত কাহিনীও বিধৃত রয়েছে। ঐসব নও–মুসলিমের ইসলাম গ্রহণের আবেগ–অনুভূতি, কার্যকারণ ও বিবৃতি*

পুস্তকাকারে সংকলিত করা হলে আমার বিশ্বাস, 'জীবন বিপ্লবের নতুন এক জগৎ' ইসলামের মুবাল্লিগদের সামনে আবির্ভূত হতো। যা ইসলামের প্রসার-প্রচারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বা যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে প্রতিভাত হতো। কিন্তু আক্ষেপ, 'শুধু এ জাতীয় বই-ই নয়, মুসলমানদের ঘরে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ইসলামী বইয়েরও তীব্র অভাব।'

এরপর ডঃ সাহেব কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে আবার বলতে আরম্ভ করলেন- 'আমি আপনার পুস্তকের জন্যে চমকপ্রদ নিম্নের উদাহরণ পেশ করছিঃ

প্রসিদ্ধ ইংরেজ নও-মুসলিম জনাব ইফম্যানের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ। কেননা, ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর কোন লেখাপড়া বা ধারণাই ছিল না। এমনকি, কোন আলেম-ফাজেলের সংস্পর্শে এসেও ইসলাম সম্পর্কে তিনি কিছুই আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি বিলেত থেকে বোম্বে এসে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁর বোম্বের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন রাজনীতিবিদ। ধর্মীয় গন্ডিতে তাঁর মোটেই যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু রাজনীতিতে আসার পর তাঁর বহু মুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি তাঁদের সাথে চলাফেরা আরম্ভ করেন।

একবার তাঁর এক সম্মানিত মুসলিম বন্ধু তাঁকে দাওয়াত করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন দস্তরখানে রং বেরং-এর খানা সাজানো রয়েছে। এর মধ্যে পোলাও ছিল। জীবনে এ-ই প্রথম তাঁর পোলাওর স্বাদ গ্রহণের প্রয়াস। পোলাও খেতে খেতে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে চিন্তিত দেখে জানতে চাইলাম, তিনি কি চিন্তা করছেন! ইফম্যান সাহেব জবাব দিলেনঃ ডঃ সাহেব! এটুকুই বলতে পারি, আমি পোলাও খাচ্ছি না, বরং; একটা কিছু চিন্তা করছি। চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে অনুভব করলাম, আমার চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আসছে। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, আমার সমস্ত শরীরের শিরা-উপশিরায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। আমি অনুভব করলাম যে, অদৃশ্য জগৎ থেকে কি যেন আমার অনুভূতিকে সঞ্চালন করছে। সেই চিন্তাশক্তিই আমার জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমি অনুভব করলাম, যে জাতির মধ্যে এত সুন্দর রুচিবোধ, এত সূক্ষ্মতা, নিপূণতা ও পবিত্রতা বিদ্যমান-- সে জাতির দ্বীন-ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার স্থান ও মর্যাদা কত উন্নত হতে পারে! কত সরল ও নির্মল। এই বলে ইফম্যান সাহেব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললেন, আমাকে কোন আলেম বা সূফী সাহেব মুসলমান করেননি। আমি একমাত্র পোলাও ভক্ষণের মাধ্যমেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইসলামে কোথাও হীনমন্যতা আমি দেখিনি। ইসলামের ইবাদাত যতো উন্নত, সভ্যতাও তেমনি উন্নত, ঠিক সেভাবে ইসলামের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারও উন্নত। আমার দৃষ্টিতে, *'কোন মানুষ যখন ইসলাম কবুল করেন তখন সমগ্র দুনিয়া হতে তিনি উন্নত হয়ে যান। তাঁর জীবনে তাঁর দ্বারা যত কাজ সম্পন্ন হয়, দুনিয়ার সমস্ত কার্যাবলী হতে তা হয় উন্নত।'*

এরপর ইফম্যান তাঁর ইসলাম গ্রহণে পোলাওর প্রশংসা করতে লাগলেন। আমি বললাম, পোলাও জিন্দাবাদ! ইফম্যান বললেন, না; ইসলাম জিন্দাবাদ।

১৯৩০ সালের ১৯শে অক্টোবরের ঘটনা। আমি ডঃ ইকবালের সাথে সাক্ষৎ করতে গিয়েছিলাম। তিনি এভাবে কথা আরম্ভ করলেনঃ 'ইসলাম কবুল করার প্রথম শর্ত হলো–মন। মন যদি কোন কিছু করার জন্য রাজী হয়ে যায়, কিছু একটা পরিবর্তন করতে বদ্ধমূল হয়, তখন দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ সে আসন্ন পরিবর্তনের জন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেয়। আমরা ইসলামের প্রাথমিক মুবাল্লিগ ও বর্তমানের মুবাল্লিগের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাই। পূর্বে মুবাল্লিগের লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকতো অমুসলিমদের মনের উপর। এজন্যে তাঁরা স্বীয় সুচরিত্র, স্বার্থহীনতা, পরোপকার, মনুষ্য প্রেমের মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যের মনকে জয় করতেন। এভাবেই হাজার হাজার অমুসলিমের কোন প্রকার বাদানুবাদ ছাড়াই সেই মুবাল্লিগের রঙে রঞ্জিত হতো। বর্তমান যুগের মুবাল্লিগের সমস্ত প্রচেষ্টা মস্তিষ্ক পরিবর্তনের কাজে নিবদ্ধ। একদিকে মুবাল্লিগ ইসলামের সত্যবাদিতার দলিল দিতে আরম্ভ করেন। অন্যদিকে, অমুসলিম ভাইরা নিজের প্রতিরোধে যুক্তি পেশ করেন। এভাবে তর্ক–বিতর্কের দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। অমুসলিমগণ নিজেদের অবস্থানে দৃঢ়তা দেখায়, ফলস্বরূপ 'জিদের বন্যা' প্রবাহিত হয়। কিন্তু হেদায়াতের ঝরনার প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইসলামের মুবাল্লিগদের উচিত মনকে জয় করা, মস্তিষ্ককে নয়। এর সহজ পন্থা হলো, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া অলম্বন করা। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রকৃতি (ফিৎরাত) নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করতে সর্বদা মনের সাথে নিজের সম্পর্ক সৃষ্টি করে। প্রকৃতি সুস্বাদু পানীয় ও আহার্য সৃষ্টি করে আর আপনি অনায়াসে তা ভক্ষণ করেন। সেই সময় কোন লোক......... প্রশ্ন করে না–– এই খাদ্য কি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে? আপনি এক জরুরী কাজে যাচ্ছেন, পথিমধ্যে আপনার সামনে এক মনোরম বাগান পড়লো, যার সুশোভিত বিচিত্র রঙের ফুল এবং সুগন্ধময় পরিবেশ আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, আপনি সেখানে অচেতনভাবে (বে–এখতিয়ার) বসে পড়েন, সেখানে বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী ও শীতল বায়ুর পরশ আপনাকে অনাবিল শান্তির পরশ যোগায়, আপনাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলে। সে সময় কেউই মস্তিষ্ককে জিজ্ঞেস করে না, এ সময় ঘুমানো উচিত কি–না? সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রকৃতি সদাসর্বদা মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, মনকে নিজের কাজে লাগিয়ে দেয়। এটা কখনই মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয় না। যেহেতু ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম। সে জন্যে মুবাল্লিগদের উচিত, আখলাক ও প্রেমের গভীরতায় মনকে জয়যুক্ত করে ধর্ম–বিমুখ ও খোদাদ্রোহিতার ভাবকে রহিত করা। মুবাল্লিগদের উঁচু আখলাকের অধিকারী হতে হবে, যাতে কঠোর হতে কঠোরতম ধর্মদ্রোহী ব্যক্তিও তাদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। মস্তিষ্কের তর্ক–বিতর্ক ও বুদ্ধিহীন জীবদের বিতর্ক মানুষের মনকে নিশ্চিন্ত করতে, নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না– প্রকৃতি জয় তো দূরের কথা।

ডঃ সাহেব আরো বললেন, মনের দুনিয়ায় কিভাবে ....। কিছু দিন আগের কথা, এখানে একজন হিন্দু জজ সাহেব প্রাণ ত্যাগ করলেন। এর কিছুদিন পর এই খবর শোনা গেলো যে, জজ সাহেবের বিধবা পত্নী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এতদশ্রবণে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে সাধারণভাবে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিধবার নিকট তার আত্মীয়রা এসে তাকে বুঝাতে আরম্ভ করলেন, তাকে মুসলমান না হওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু বিধবা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। আত্মীয়-স্বজনদের পালা শেষ হওয়ার পর হিন্দু ধর্মের বড় বড় পন্ডিত-ব্রাহ্মণরা আসতে শুরু করলো। তারা এসে হিন্দু ধর্মের সত্যতার পক্ষে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে যুক্তি-তর্কের অবতারণা ঘটালো, হিন্দু ধর্মের অমীয় বাণী শুনালো, হিন্দু ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করা হলো। শিক্ষা-দীক্ষারও পাঠ দেয়া ধারাবাহিকভাবে কয়েকদিন পর্যন্ত চললো। কিন্তু কোন কিছুই মহিলার ফয়সালার উপর রেখাপাত করতে পারেনি। সব কিছু শোনার পর তিনি কেবল এতটুকুই বললেন, আলবৎ আমি মুসলমান হবো।

অতঃপর আর্য সমাজের পালা আরম্ভ হলোঃ তারা ইসলাম বিরোধিতার অফিস খুলে বসলো। মুসলমানদের নির্যাতন কাহিনী অতিরঞ্জিত করে পেশ করতে লাগলো। ইসলামী নির্দেশাবলী খন্ডন করলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব জন্মাবার জন্যে সচেষ্ট হলো। তাকে সুলতান মাহমুদ গজনবী ও বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কাহিনী শোনানো হলো। গো-মাতার নামে তারা আবেদন জানালো। কিন্তু মহিলা তার সংকল্পে দৃঢ়তা প্রকাশ করলো। তৃতীয় পর্যায়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মৃত্যুর হুমকি দেয়া হলো। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোভও দেখানো হলো। এত কিছুর পরও মহিলা বিচলিত হলেন না। এবার প্রশ্নোত্তর শুরু হলো।

মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ তুমি কেন মুসলমান হতে চাও? তোমার কি কোন ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা আছে?

মহিলা জবাব দিলেনঃ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার ঘরে কোন কিছুরই অভাব নেই।

প্রশ্ন করা হলোঃ তোমার কি কোন আত্মিক আকাঙ্ক্ষা আছে?

মহিলা বললেনঃ আমার শারীরিক অবস্থা দেখেই তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো, আমি আর ক'দিন বাঁচতে পারি?

প্রশ্ন করা হলোঃ

কোন মুসলমান মৌলভী বা মুবাল্লিগ কি তোমাকে প্ররোচিত করেছে?

মহিলা জবাবে বললেনঃ আমি জীবনে কোন মুসলমান মৌলভী বা মুবাল্লিগের সাথে সাক্ষাৎ করিনি।

বলা হলোঃ কোন ইসলামী পুস্তক পড়েছো?

মহিলা বললেনঃ আমি কোন ইসলামী বই–পুস্তক চোখেও দেখিনি।

আশ্চর্য হয়ে আত্মীয়–স্বজনরা জিজ্ঞেস করলো ঃ তাহলে কেন মুসলমান হতে চাও?

মহিলা বললেনঃ আমার স্বামী বছরের পর বছর সাব–জজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, অনেক শহর–নগরে বদলী হয়েছিলেন। আমিও তাঁর সাথে থাকতাম। সবসময় আমার সাথে অভিজাত শ্রেণীর হিন্দু পরিবারের মেলামেশা হতো। মুসলমান মহিলারাও মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসতেন। কিন্তু, তারা সবাই ছিলেন আমার সেবিকা। কখনওবা গাড়ী চালকের স্ত্রী, কখনও ধোপার মেয়ে, আবার কখনও আমিই কোন দোকানের মালিকের স্ত্রীকে ডেকে আনতাম। ব্যস, এর চেয়ে বেশী ইসলাম এবং মুসলমান সম্পর্কে আমার জানা নেই।

উপস্থিত শ্রোতারা কিছুটা উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলোঃ তাহলে তো তোমার মুসলমান হওয়ার পেছনে কোন কারণ দেখছি না!

জজ পত্নী বললেনঃ হ্যাঁ, তা নিশ্চয়। যেসব মুসলিম মহিলার সাথে আমি মেলামেশা করতাম তাদের অধিকাংশ গরীব ও অভাবগ্রস্ত এবং তারা ছিল অপরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছদে আবৃত। ধনী মুসলিম মহিলাদের সাথে আমার মেলামেশা খুব কমই হতো। যে সব হিন্দু মহিলাদের সাথে আমার উঠাবসা হতো তারা সবাই ছিল ধনী, অবস্থাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বংশের। আমি সর্বদা হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের মধ্যে একটা পরিষ্কার পার্থক্য লক্ষ্য করলাম।

তার শেষ কথায় শ্রোতৃমন্ডলীর মন কাঁপতে আরম্ভ করলো এবং সবার দৃষ্টি মহিলার উপর নিবদ্ধ হলো।

মহিলা বিস্ময়–বিহ্বলতার এক অপরূপ অবয়বে পরিণত হলেন।

হিলা বলা আরম্ভ করলেনঃ যতই আমি হিন্দু মহিলাদের সাথে মিশতাম ততই তাদের শরীর ত এক প্রকার গন্ধ অনুভব করতাম। কিন্তু এও দেখলাম, কোন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম লিম মহিলার শরীর থেকে এ ধরনের গন্ধ পাওয়া যেতো না। স্বামীর জীবিত অবস্থা হতে এ ন্ত আমি গবেষণা করলামঃ কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। কিছু দিন হলো এই সত্য ঘাটিত হলো। আমি আবিষ্কার করলাম, যেহেতু মুসলমানরা খোদার পূজারী এবং তাঁদের আও পাক– সে জন্য মুসলমানদের শরীর হতে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। তারা পরিষ্কার পড় পরিধান করুক বা অপরিষ্কার কাপড়ই পরিধান করুক– তাদের শরীর সে ধরনের গন্ধ ে সম্পূর্ণ মুক্ত। অপরপক্ষে হিন্দুরা যেহেতু মুশরেক তাদের আত্মা নাপাক। তাই তারা যতই

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক- তাদের শরীর থেকে গন্ধ বের হবেই। এই ঘটনার পর রমণীর চক্ষু হতে অশ্রু গড়াতে লাগলো। তারপর চেহারায় ঈমান ও বিশ্বাস, যোশ ও দীপ্তির লোহিত রশ্মি দৃশ্যমান হতে লাগলো। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা আমাকে নিজের অবস্থার প্রতি ছেড়ে দাও। আমি ইসলামের তৌহিদের নূরের আলো দ্বারা নিজের রূহকে পবিত্র করতে চাই। আমি অবশ্যই মুসলমান হবো।

এই বলে সাহসী-বিদুষী মহিলা উত্তেজিত আত্মীয়-স্বজনের সামনে কালেমা পড়তে লাগলেন। আত্মীয়-পরিজন হা-হুতাশ করতে লাগলো। কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলো না। সেই মহিলা নিজের অঙ্গীকারে অটল অবিচল থাকলো। অবশেষে মুসলমান হয়ে গেলো।

।১৯।

মুছিল কাহারা কালের পাতায় চিহ্ন ছিল যা' কলঙ্কের?
মানব জাতির মুক্তি আনিল বন্ধন কাটি' দাসত্বের?
কা'বার কপোলে বোসা দিল কারা-তুলিল তৌহীদের আযান?
ছিনায়-ছিনায় গেঁথে নিল কারা আমার বাণী-সে পাক্ কুরআন্?
তারা কি তোমরা ? সে ত তোমাদের বাপদাদা-যারা ছিল মহৎ,
তোমরা ত সব হাতে-হাত রেখে ভাবিছ শুধুই 'ভবিষ্যৎ'!

।২০।

কী বলিলে তুমি? মুসলমানের 'হুর' সে শুধুই 'ওয়াদা' সার?
কান্না যতই হোক না করুণ থাকা চাই কিছু যুক্তি তার!
শাশ্বত মোর আইন-কানুন শাশ্বত মোর নীতি-বিধান!
কাফির যখন মুসলিম হয়-সেও পাবে 'হুর' এক-সমান!
তোমাদের মাঝে কারা বল চায় সত্যিকারের 'হুর' এ-কসুর?
মুসাই ত নাই!-'তুর পাহাড়ে ত তেমনি করিয়া জ্বলিছে নূর!

।২১।

লাভ-লোকসান এক তোমাদের, এক মঞ্জিল, এক মোকাম,
এক তোমাদের নবী ও রসূল, এক তোমাদের দীন-ইসলাম।
এক তোমাদের আল্লাহ এবং এক তোমাদের আল-কুরআন,
আফসোস, হায়, তবুও তোমরা এক নহ সব মুসলমান!
তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা হাজার দল ও হাজার মত,
এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তি-পথ!

ইকবালের চিন্তাধারার কয়েকটি দিক

সৈয়দ নসরুল আহসান

ইসলামিক চিন্তাধারার পুনর্গঠন নামক বক্তৃতাগুলিতে ইকবাল এক জায়গায় বলেছেন, *আধুনিক দুনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে, ইসলামিক বিশ্ব অতিদ্রুত গতিতে পাশ্চাত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এতে অন্যায় কিছু নেই। আমাদের একমাত্র ভয় যে, ইউরোপীয় কালচারের চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হয়ে আমরা আমাদের গতি হারিয়ে ফেলবো এবং ঐ কালচারের অন্তর্নিহিত রূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হবো না।*

অন্যত্র ইকবাল বলেছেন, *আমাদের সামনে একমাত্র খোলা পথ হচ্ছে–আধুনিক জ্ঞানকে সসম্ভ্রমে কিন্তু নিজেদের স্বকীয়তাকে রক্ষা করে আত্মস্থ করা এবং এই জ্ঞানের আলোকে ইসলামী শিক্ষার বিচার করা, যদিও এই পন্থায় আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্ত থেকে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।*

ইকবাল এই একমাত্র পথই অবলম্বন করেছিলেন। ইউরোপীয় কালচারের অন্তর্নিহিত সত্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা তিনি করেছেন এবং আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তার আলোকে ইসলামকে বুঝবার এবং ইসলামকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি গোঁড়া, সংকীর্ণমনা, সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ইকবাল–ভক্তরা পর্যন্ত কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ইউরোপ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আমাদের পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত থেকে হলেও জ্ঞান আহরণ করতে হবে। ইকবাল বলেন যে, মুসলিম দার্শনিকরা গ্রীক দর্শন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, আবার তাদের অনুপ্রেরণাই ইউরোপে সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের পর ইসলামী বিশ্ব এক স্থবিরতায় কবলিত হয়। অন্যদিকে চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ইউরোপে অভূতপূর্ব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ইকবাল তাই ইসলামী দর্শনের পুরাতন সূত্রগুলো আবিষ্কারের অভিযানে নেমেছিলেন। তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইউরোপ অনুপ্রাণিত। কিন্তু তিনি ইউরোপের অন্ধ অনুসারী নন। তিনি স্বাধীনভাবে তার বিচার করেছেন।

জার্মান দার্শনিক নীচে *(Neitzsche)* বলেছেন যে, মানুষের মহত্ব তখনই প্রকাশ পায়, যখন সে সেতুর ভূমিকা পালন করতে পারে। এই অর্থে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে ইকবাল ছিলেন সেতুস্বরূপ এবং সেতু হবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল। প্রথমদিকে নীচের দ্বারা ইকবাল প্রভূত প্রভাবান্বিত হন। তার 'আসরারে খুদী'তে হীরক এবং অঙ্গারের যে উপমা সেটাও নীচে থেকে গৃহীত। নীচের বহু উক্তির প্রতিধ্বনি ইকবালের মধ্যে শোনা যায়, *"সবল হতে চেষ্টা কর, বিপদজনক জীবন যাপন কর, তুমি যখন নিজের মধ্যে শক্তির প্রেরণা অনুভব করবে, তখনই*

মনে করবে যে, তুমি সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছো, আর যখন নিজের মধ্যে দূর্বলতা বোধ এসে পড়বে তখনই মনে করবে তুমি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছো। নীতিমালা হচ্ছে, দুর্বলের সৃষ্টি –সবলকে দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি সত্যিকার কিছু সৃষ্টি করতে আগ্রহী তাকে প্রথম ধ্বংসে উদ্যত হতে হয়, নীতিকে পদদলিত করতে হয়।"

নীচে আরও বলেছেন যে, *"গণতন্ত্র হচ্ছে নাসিকা গণনার উপায়মাত্র। নারীর ভূমিকা সন্তান ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ"।* নীচের এসব উক্তি বহু জায়গায় ইকবালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নীচে যেসব ব্যক্তিকে পরম শ্রদ্ধা করতেন তারা ইকবালেরও গুরু–গ্যেটে, নেপোলিয়ন, স্তাঁদাল, শোপেনহাওয়ার ও হাইনে প্রমুখ। নীচে এবং ইকবাল উভয়েই অতিমানব (Superman)-এর ভক্ত ছিলেন। অতিমানবের আদর্শ নীচে গ্যেটের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, আর ইকবাল সেটা ধার করেছেন নীচের থেকে। ঠিক তেমনি শোপেনহাওয়ারের প্রতিভার চিন্তা কার্লাইলের বীরের কল্পনা, মিলারের Karl Moor-এর ফিখটের আমিত্ববাদ, শোপেনহাওয়ারের অস্তিত্বের তাকিদ, নীচের ক্ষমতার আকর্ষণ এবং বের্গসঁর Elan Vital বা জীবনী শক্তি–এসব কিছুই বিভিন্নরূপে ইকবালের মধ্যে এসেছে। ইকবালের খুদী তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। দেকার্তই বলেছিলেন যে, দর্শনের যাত্রা শুরু আত্মা থেকে। ঐ কেন্দ্র থেকে সে বহির্বিশ্বের দিকে অগ্রসর হয়। বস্তুত পক্ষে পৃথিবীতে অভিনব বলে কিছু নেই। অভিনবত্ব দিয়ে সত্যের মূল্যায়ন হয় না। সুতারং, কেউ যদি ঘোষণা করেন যে, ইকবাল একটি শূন্যতার মধ্যে বিরাজমান– তার মধ্যে ইউরোপীয় চিন্তার প্রভাব নেই, তিনি শুধু ইকবালকে খর্ব করবেন না, আধুনিক দর্শনের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে ইকবালের যে ভূমিকা তারও অমর্যাদা করবেন।

ইকবালের মহত্বের পরিচয় এখানেই যে, তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের চিন্তাধারা হজম করেও স্বকীয়ত্ব রক্ষা করেছেন এবং পৃথিবীকে নতুন কিছু দান করেছেন।

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের গুরু বেইকন (Bacon) ছিলেন আরোহী প্রথার Inductive প্রবর্তক। এই প্রথা তিনি ধার করেন আরব দার্শনিকদের কাছ থেকে। দেকার্ত, স্পিনোযা, লাইবনিট্স্ এবং পরবতী দার্শনিক সকলে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। লক (Locke) প্রমাণ করেন যে, জড় পদার্থের একটি আলাদা অস্তিত্ব আছে। বার্কলি মনে করতেন যে, জড় বস্তু চেতনার একটি প্রকাশ মাত্র। হিউম চেতনার অস্তিত্ব উড়িয়ে দিলেন। তখন মনে হয়েছিল যে, এখানেই বোধ হয় দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তার পর কান্টের আবির্ভাব হলো। আধুনিক জগতের তিনি সবচেয়ে বড় দার্শনিক। তাঁর স্থান সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরোস্টটলের পাশে। তিনি শেখালেন যে, ইন্দ্রিয়ের পথে সব জ্ঞান আহত হয় না। মানুষ প্রত্যেকেই একটি স্বাধীন ব্রহ্মান্ডের মত, সে বহির্বিশ্বের দ্বারা পুরাপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় না।

ইকবাল দু'টি মৌলিক চিন্তা সূত্র নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি বলেন যে, *খুদীর ভিত হচ্ছে বিশ্বাস, যুক্তি নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নয়, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হলো জ্ঞানের উৎস। মানুষের যে শুধু*

স্বাধীন সত্ত্বা রয়েছে তা নয়; তার ব্যক্তিত্বের গভীরে নীতির মূল অনুসন্ধান করতে হবে। এদিক দিয়ে তিনি কান্টকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি নীচের মত বলেছেন যে, *ব্যক্তিত্বের পুষ্টি যাতে সাধিত হয় তার মধ্যে রয়েছে মঙ্গল এবং ব্যক্তিত্বকে যা দুর্বল করে তা অমঙ্গলের আকর।* কান্ট বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতা এবং অমরত্ব বিশ্বের ন্যায়নিষ্ঠার প্রমাণ। ইকবাল বিশ্বাস করেন, এ দু'টি জিনিসই মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। ইকবাল প্রচলিত অর্থে ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে সীমিত হয়ে থাকেননি, ধর্ম বলতে সাধারণ মানুষ কতগুলো অখন্ডনীয় বিশ্বাসের কথা ভাবে। ইকবাল ব্যক্তিত্ব বা খুদীকে দিয়ে সমস্ত কিছুর বিচার করেছেন। খুদী বহির্ভূত কোন নীতির দ্বারা জীবনের মূল্যায়ন করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। অন্যদিকে, *সুফীরা যে ভাবে মনে করেন যে, প্রত্যেক সুফীর চিন্তাই শেষ কথা*–এ মতও ইকবাল সমর্থন করেননি। তার জন্য রাসুলুল্লাহ (সঃ)–এর অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই ছিল সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায়। যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে রাসূল (সঃ)–এর অভিজ্ঞতার সাযুজ্য নেই, সেটা তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মোজাদ্দেদে আলফেসানী ও ইকবালের চিন্তার সামঞ্জস্যতা

মুহাম্মাদ মুহিববুল্লাহ

মোজাদ্দেদে আলফেসানী ও ইকবালের চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা নিম্নরূপ সামঞ্জস্যতা দেখতে পাইঃ

১. তাসাউ–উফের ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তা–আধ্যাত্মিক উন্নতি, একত্ববাদ (অহদাতুল উজুদ) থেকেই আরম্ভ হয়েছে এবং সমাপ্তি হয়েছে একত্ববাদের সাক্ষী (অহদাতুশ শুহুদ)–এর মাধ্যমে।

২. হযরত মোজাদ্দেদ (রঃ) "আবদিয়াত" কে তাঁর দর্শন হিসাবে পেশ করেছেন, আল্লামা ইকবাল "খূদী"–কে তাঁর দর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

৩. তাঁরা (এসবাতে জাত) আল্লাহর স্থায়িত্বের পক্ষে যুক্তি পেশ করেছিলেন এবং (নাফিয়ে জাত) আল্লাহর অস্থায়িত্বের অস্বীকার করেছেন। তাঁরা ফানা বা'দাল বাকা'র সমর্থন করতেন না; বরং, বাকা বা'দাল ফানা–এর সমর্থক ছিলেন।

৪. তাঁরা (আজমিয়াত) অনারব–এর বিপক্ষে এবং (হেজাজিয়াত) আরবের পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থনদিয়েছিলেন।

৫. তাঁরা (উলুমে কাশাফিয়া) আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন, দর্শনকে নয়।

৬. তাঁরা (অহদাতুল উজুদ) একত্ববাদের ভুল ব্যাখ্যা এবং বিষাক্ত ধারণার বিপক্ষে মসি ধারণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইকবাল মোজাদ্দেদ (রঃ)–এর চেয়েও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। এটা আধ্যাত্মিক গবেষণার ফলশ্রুতিতেই সম্ভব হয়েছে।

৭. তাঁরা তাসাউ-উফকে আমলের খুলুসিয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এটা নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য নয়; বরং, অনবরত আমলের মাধ্যমে দেখেছেন।

৮. তাঁরা শরীয়ত এবং তরীকতকে একটি অন্যটির পরিপূরক মনে করতেন।

৯. তাঁরা নৃত্য এবং সঙ্গীত বিদ্যার বিরোধী ছিলেন। কেননা, তাঁরা ইবাদাতের জজবা কিংবা মত্ততাকে ভাল মনে করতেন না।

১০. তাঁরা মাতৃভূমিকে ধর্ম রক্ষার মাধ্যম মনে করতেন না; বরং, ধর্মকে মাতৃভূমি রক্ষার মাধ্যম মনে করতেন। দ্বীনকে রক্ষা করা মাতৃভূমিকে রক্ষার চেয়ে অগ্রগণ্য জ্ঞান করতেন।

১১. তাঁরা তৎকালে তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে মৌখিক ও কলমের মাধ্যমে যুদ্ধ করেছেন–যা ছিল উত্তম জিহাদ।

১২. তাঁরা সত্যের বাণী প্রচারের জন্য সাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। পাক–ভারত উপমহাদেশে এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল।

১৩. শরীয়তের হুকুম–আহকামের উপর তাঁরা সবচাইতে বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন এবং ইসলামী শরীয়তকে আমলের কষ্টিপাথর হিসাবে নিরূপণ করেছেন।

১৪. তাঁরা নবী (সঃ)–এর শিক্ষাকে মানুষের জন্য নাজাতের মাধ্যম মনে করতেন।

১৫. তাঁরা রাসূল (সঃ)–এর প্রেমকে ঈমানের এবং ইবাদাতের মূল প্রতিপাদ্য মনে করতেন। আল্লামা ইকবাল জালাল উদ্দীন রুমীর থেকেও দীক্ষা গ্রহণ করেছেন– কিন্তু মোজাদ্দেদ সাহেবও এ ব্যপারে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন।

১৬. তাঁরা মানবীয় সমস্যার সমাধান (ওহী–এ–ইলাহী) ঐশী বাণীর মধ্যে নিহিত বলে মনে করতেন।

১৭. তাঁরা এমন একটি শাসন ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন যার ভিত্তি হবে শরীয়ত। অর্থাৎ, কোরআন ও হাদীস।

১৮. তাঁরা যুক্তিপূজারীদের বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন।

১৯. তাঁরা কর্মময় জীবনে সমাজ সংস্কারের ভেলা ভাসিয়ে ছিলেন এবং আমরণ তা–ই সাধনা করেগেছেন।

ইকবালের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ

এ. বি. এম. সালেহ উদ্দীন

ইজতিহাদ সম্পর্কে বর্তমান ইসলামী বিশ্বে একটা সম্যক ধারণা হয়েছে। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অনেকে গুরুত্ব প্রদান করছেন। কোন কোন ইসলামী রাষ্ট্রে ইজতিহাদের উপর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

ইসলামী শরীয়তের চার মাজহাবের স্ব–স্ব মাজহাবী ব্যক্তিবর্গ শরীয়তের আইন–কানুন সম্পর্কে ইজতিহাদ করছেন। ফিকাহ, উছুলে ফিকাহ সম্পর্কে কোরআন, হাদীসের প্রয়োজনীয় দলীল–প্রমাণসহ ওলামাগণ ইজতিহাদ করছেন। পৃথিবীতে এর আগেও অসংখ্য ইসলামী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক ইজতিহাদ করেছেন। ইসলামী দর্শনে পারদর্শী সে–সব মুফতি, ফকীহর সংখ্যা কম ছিলো না। যেমন– ইমাম আবু জায়ী, সুফিয়ান সওরী এবং ইবনে হাজম প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ইসলামী শরীয়তের উপর ইজতিহাদ করেছেন। আর এ ইজতিহাদের গোড়াপত্তন হয় রাসূলে পাক (সঃ)–এর সময় থেকে। পর্যায়ক্রমে এর ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব জুড়ে।

আজকের বিশ্বেও সে ধরনের কিছু কার্যক্রম চালু আছে যা ইজতিহাদের সাথে সংগতিপূর্ণ। সৌদী আরব, কুয়েত ও মরক্কোতে ইজতিহাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এসব দেশ ফিকাহর Encyclopaedia প্রণয়নের কাজ শুরু করে দিয়েছে। কুয়েতে ফিকাহর কিতাব ২০ খন্ডে সমাপ্ত হয়েছে। উছূলে ফিকাহর সবচেয়ে বৃহৎ গ্রন্থ মিসরে প্রণীত হয়েছে।

ফিকাহর মৌলিক ভিত্তি কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ছাড়াও আরো দু'টি দিক ইজতিহাদে সন্নিবেশিত হয়েছে। তা হচ্ছে– ইসতিহসান ও ইসতেযাব (Public interest) সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সমস্যাবহুল প্রশ্নের

উত্তর সমন্বিত এ ধরনের ফিকাহ গ্রন্থ মিসরে একাধিক প্রকাশিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে। সেখানকার উল্লেখযোগ্য বিদ্যাপীঠ, প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইজতিহাদের উপর কিতাব প্রণয়নের প্রচলন চালু আছে অনেক পূর্ব থেকেই।

মিসরে ইসলামী নীতি বাস্তবায়নের কাজ করার উদ্যোগী কতিপয় মুফতি ইসলামী দার্শনিক বিশ্বব্যাপী ফিকাহ চর্চার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। মিসরে ইসলামী আইন-প্রণয়নের জন্য এসব আলেম সমাজ ইসলামী বিপ্লবের কাজ করে যাচ্ছেন। যদিও তাঁদের উপর অমানুষিক নির্যাতন অব্যাহত আছে। বর্তমান জগতে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে আইনের সাথে ইসলামী নীতির পার্থক্য নির্ণীত হচ্ছে। এসব বিষয়ের উপর বই, পুস্তক রচিত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে তিনটি প্রধান প্রশ্নের উপর সমস্যা ও সম্ভাবনা নির্ধারিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের উপর এবং নীতিগতভাবে বাস্তব কার্যকর পন্থা কি হবে? অসংখ্য গ্রন্থরাজি প্রণীত হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য এসব গ্রন্থ আরবী, ইংরেজীসহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীনে সমষ্টিগত নিয়ম-কানুন ও বিষয়াদির উপর ইজতিহাদী কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য, জিদ্দাস্থ বাদশাহ আবদুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (King Abdul Aziz Univercity) International centre for Research in Islamic Economics নামে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (Institute) রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিয়মিত ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। ফিকাহশাস্ত্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সেখানে গবেষণা করা হচ্ছে। নির্ধারিত বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সভা সমিতি।

পাকিস্তানের জনৈক শিক্ষাবিদ ডঃ তানযিলুর রহমান ইজতিহাদের উপর পাঁচ খন্ডে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সমাজের প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত গ্রন্থ বেশ সমাদৃত হয়েছে।

ভূমিকায় এভাবে বিশদ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, বর্তমান ইসলামী বিশ্বে ইসলামী আইন-কানুন ও ইজতিহাদের প্রচলনের জন্য স্ব-স্ব আঙ্গিকে প্রচেষ্টা চলছে।

আল্লামা ইকবালের আজীবন সাধনা ছিলো মুসলমানদের মধ্যে দুর্জয় সাহস ও নব-উদ্যমের জন্ম দিতে। জাগিয়ে তুলতে বাস্তব মুক্তির কর্মপ্রেরণায়। তিনি মুসলিম জাতির মুক্তির জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বারোদঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন। মুসলমানদের গৌরবপূর্ণ সে অতীতে ফিরে যেতে ডাক দিয়েছেন। সেই জীবন্ত শক্তিসমূহকে তিনি জড়ো হতে আহবান করেছেন, তিনি

অন্তরের অসীম দৃষ্টিতে আগামী দিনের গণমানুষের তথা মুসলমানদের স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন দেখেনইসলামীদর্শনেরমাধ্যমে।

আল্লামা ইকবাল মরহুম মাওলানা সোলায়মান নদভী ও সুফী গোলাম মোস্তফা (রঃ)–এর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে বলেছিলেনঃ *সে সুপ্রসন্ন সময় অতিনিকটে, যখন এ অঞ্চলের মুসলমানগণ শত শত বছরের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করবে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে জ্বলে উঠবে তাদের আশার আলো। পৃথিবীর সব শক্তির উপর চ্যালেঞ্জ করে একটি অনন্য আদর্শ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সে চ্যালেঞ্জপ্রতিযোগিতায় ইসলামী আদর্শই বিজয়ী হবে।*

ঔপনিবেশিক বৃটিশ গোলামীর পর মুক্তি লাভ করে মুসলমানদের মধ্যে হাজারো মাসায়েলের উদ্ভব ঘটানো হবে। সে সমস্যাক্ষুব্ধ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ইজতিহাদের মাধ্যমে। ইজতিহাদ ছাড়া সে–সব বিচ্ছিন্ন গোড়ামী প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব নয়। মুসলিম জাতির দৃশ্যতঃ ক্ষতির সম্ভাবনাকে ইকবাল ইজতিহাদের দ্বারা উচ্ছেদের চেষ্টা করেছেন। তিনি সুফী গোলাম মোস্তফার কাছে হৃদয়াবেগে বেদনাভরা একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেনঃ কিছু লোক মনে করেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ)–এর পর না–কি ইজতিহাদের দরোজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। একজন মস্ত বড় আলেম বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ)–এর কোন নজীর উপস্থাপন আজ সম্ভব নয়।

ইজতিহাদে আল্লামা ইকবালের উদ্দেশ্য এত মহৎ ছিল যা মুসলমানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে সুদীর্ঘ সফলতায় সন্নিবেশিত। ঐ চিঠিতে ইকবাল প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেন যে, *অত্যাবশ্যকীয়দিকগুলো ঐ সব আহকামের উপর প্রতিষ্ঠিত যা সম্মানিত মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণের জন্য আল–কোরআনে মওজুদ রয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্য কোরআনের নীতির উপর আনুগত্য, ইবাদাত, পারস্পরিক উঠাবসা ইত্যাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম জাতির জন্য এসব ইসলামী নিয়ম–নীতি চালু থাকবে। কোরআনের এসব বিষয়ের উপর আলোচনা করা যাবে। কিন্তু ফেৎনা ফাসাদের জন্ম দেয়া যাবে না। যে কোন ফেৎনাই মুসলিম জাতির জন্য নিষিদ্ধ। এর পর ইকবাল বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল–কোরআনের নিয়ম–নীতির উপর মানুষের নির্ভেজাল কল্যাণের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও খেয়াল এবং বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইজতিহাদ করবে সে–ই প্রকৃত অর্থে ইসলামের খাদেম।*

এখন প্রশ্ন ঃ ইজতিহাদ কে করবে এবং কিভাবে তা করতে হবে? ইজতিহাদের গঠনপ্রণালী–ধরন (Method) কি হবে। আল্লামা ইকবালের জীবনেতিহাসে সে–সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি পরিষ্কারভাবে এসব প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, সব লোক দ্বারা ইজতিহাদ হতে পারে না। ফিকাহশাস্ত্রের উপর বিজ্ঞ পারদর্শী মাত্রেই ইজতিহাদের ফল পাওয়া সম্ভব নয়, যদি না মুজতাহিদের তাকওয়া বা খোদাভীতি থাকবে। খোদাভীতি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যার

প্রভাব সরাসরি মানুষের মুক্তির পথকে নির্দেশিত করে। মুসলমানদের পরিচ্ছন্ন ইজতিহাদি চিন্তাধারা মনোভাবে ইসলামী বুনিয়াদী সত্তার কিয়াসি যুক্তি দ্বারা খোদায়ী বুনিয়াদী সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুনিয়ার বর্তমান অবস্থায় ইকবালের মতামত ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি তৎকালীন প্রচলিত নিয়ম–কানুনের বিরোধিতা করে একটি সুনির্মল নিয়ম–প্রথা চালু করার চেষ্টা করেছেন– যা ছিল ইসলামী আদর্শভিত্তিক। তিনি হাঁটু গেড়ে বসা পরাধীনতার শৃংখল থেকে মানুষকে মুক্তির ডাক দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯২৮ সালে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রঃ) দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিমের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কারণ, তখনকার মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে তাঁর নীতিগত মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তিনি ইসলামী নীতিসমূহের সমূহ ক্ষত থেকে নিস্তারের জন্য মুসলমানদের আহবান করেছিলেন। ঈমানী নীতিতে দৃঢ় ছিলেন বলেই সেদিন তাঁর পক্ষে ইস্তেফা দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

আল্লামা ইকবাল জনাব শাহ কাশ্মীরী (রঃ)–কে লাহোরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শাহ সাহেব ইকবালের আমন্ত্রণে লাহোর গিয়েছিলেন। আল্লামা ইকবার শাহ সাহেবকে ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজে তাঁকে সহযোগিতার আহবান জনান। ইকবাল বলেনঃ *আমি স্বয়ং এ কাজ করা শুরু করলেও এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ একা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি নিজের পান্ডিত্য আর জ্ঞানের অহমিকায় ভোগেননি; বরং, উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন যে, ইসলামী আইন প্রণয়নের জন্য যে গভীর জ্ঞান ও ইসলামী ইলম থাকা দরকার তা আমার মধ্যে নেই। তাই, শাহ সাহেবের মত ইসলামী জ্ঞানবিশারদকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি উদাত্ত আহবান জানান। যুগ–জিজ্ঞাসার যে কোন জবাবে উভয়ে মিলে ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজ হাতে নিতে চেয়েছেন। ইজতিহাদ কে করবে ? ইকবালের এ উদার মমত্বে তা ফুটে উঠেছে।*

দ্বিতীয়তঃ ইজতিহাদের ধরন–প্রণালী (Method) কি হবে? এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল তিন ধরনের ইজতিহাদের কথা বলেছেন। (এক) মুজতাহিদে মুতলাকঃ এ জাতীয় মুজতাহিদ কোন ফিক্‌হি গবেষণাগারে বন্দী থেকে ইজতিহাদ করেন না; বরং, সম্পূর্ণ স্বাধীন–মুক্তাবস্থায় ইজতিহাদ করেন। যেমন– ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রঃ) সহ আরও অনেকে এ ধরনের মুক্তাবস্থায় ইজতিহাদ করেছেন। কোন পরাধীন শক্তি তাদেরকে ইসলামী মৌলিক নীতি থেকে উৎখাত করতে পারেনি। বিরত রাখতে পারেনি পরিচ্ছন্ন মানব–গঠনীয় ইজতিহাদ থেকে। (দুই) মুজতাহিদে মুনতাছিব (নির্ভরশীল উপমীত)ঃ এ জাতীয় মুজতাহিদ কোন একটি নির্দিষ্ট গন্ডিতে লাইব্রেরীতে বসে ইজতিহাদ করেন তা থেকে বের হয়ে নয়। ইজতিহাদের জন্য নির্দিষ্ট লাইব্রেরীতেই তা সীমাবদ্ধ। এ জাতীয় মুজতাহিদকে মুকাইয়্যেদ (বন্দী বা অনুগত)–ও বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় প্রকারের মুজতাহিদ এমন সব মাসায়েলের উপর ইজতিহাদ করেন, যে–

উপর ইজতিহাদ করেন, যে-সব বিষয়ের উপর ইমামগণ নির্বাক, চুপ ছিলেন। তারা ইজতিহাদের মাধ্যমে সে নির্বাক বিষয়সমূহের সমাধান দিয়েছেন।

আল্লামা ইকবাল স্বাধীন মুক্তাবস্থায় ইজতিহাদের গুরুত্ব বেশী দিয়েছেন। আল্লামা ইকবাল সে-সব বিষয়ের উপর ইজতিহাদ করার গুরুত্ব অনুভব করেছেন যেগুলোর উপর ইজতিহাদ করা কতিপয় লোকের কাছে নিষিদ্ধ ছিল। সে সব বিষয়ের উপর মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তরজুমানুল কোরআনের ভূমিকায় গুরুত্বের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কোন কোন স্থানে তিনি আল্লামা ইকবালের অনুসরণ করেছেন।

আল্লামা ইকবালের ইজতিহাদের মাধ্যমে মুসলিম জাতির অনেক অজানা তথ্য ও রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। তিনি তাঁর ইজতিহাদি চেতনার দ্বারা মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের ইতিহাস থেকে জীবন পাথেয় সংগ্রহের আহবান জানিয়েছেন। তাঁর অবদান মুসলিম জাতি যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

আল্লামা ইকবাল ইজতিহাদের বিষয়বস্তুতে আল-কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের উপর বিশদআলোচনাকরেছেন।

উপরে বর্ণিত বিশদ আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা ইকবালের লিখনী ও বক্তব্যে ইজতিহাদের অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বের কথা প্রতিভাত হয়েছে। তিনি চলমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রকৃত মুক্তির পথ দেখিয়েছেন ইজতিহাদের মাধ্যমে। ইকবালের কাছে ইজতিহাদ একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক। তিনি জীবনের সমগ্রতা দিয়ে ইজতিহাদ সম্পর্কিত জ্ঞান ও পরিচর্যার প্রণালীর (Method) উপর গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করেছেন। এজন্যে ইংরেজীতে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্বও তিনি আনজাম দিতে চেয়েছিলেন।

আল্লামা ইকবাল উছুলে ফিকাহ, উছুলে হাদীস ও উছুলে তাফসীরের উপর গভীর অধ্যয়নের সুযোগ না পেলেও তিনি তাঁর শৈল্পিক চিন্তায় ইজতিহাদের একটি সুন্দর রূপ দিতে অনেকটা সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মুফতি ও উলামাদের ইখতিলাফি (মতবিরোধের) দৃষ্টিকোণের উপর তেমন দৃষ্টি দিতে পারেননি। অবশ্য, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)-সহ অনেক বড় আলেমের লিখিত কিতাবের উপর তিনি কিছুটা নজর বুলিয়েছেন। আল্লামা ইকবাল যেসব গ্রন্থ লিখেছেন অথবা ইজতিহাদের উপর যে-সব বক্তব্য রেখেছেন তাতে ঐ সব ইসলামী চিন্তাবিদের গ্রন্থের উদ্ধৃতি (Reference) দিয়েছেন। আবার কখনো ঐ সব গ্রন্থরাজির যথার্থ মূল্যায়ন করলেও এতদ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হয়তো হতে পারেননি। যার জন্য কখনো তিনি কতিপয় মুফতি ও উলামার সনদহীন কিতাব অধ্যয়ন (Study) করে তুলে ধরেছেন তাঁর লিখিত গ্রন্থে ও বক্তৃতায়। যেমন, ইবনে খালদুনের বরাত দিয়ে তিনি এক স্থানে উল্লেখ

করেছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)–এর আবির্ভাব সম্পর্কে না–কি ইবনে খালদুন অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, ইবনে খালদুন তাঁর ঐতিহাসিক 'মোকাদ্দমায়' শুধুমাত্র ইমাম মাহদী (আঃ)–এর কথা বলেছেন। কিন্তু ঈসা (আঃ)–এর আবির্ভাব সম্পর্কে কোথাও বিরোধিতা করেননি। এ ধরনের মতবিরোধ তৎকালে কিছু লোক ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সম্পর্কেও পোষণ করতো যে, তিনি কোন কোন কিয়াসের মোকাবিলায় হাদীসের reference –এর পরোয়া করেননি। ইকবালও না–কি সে মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আল্লামা ইকবাল আগামী দিনের মুসলমানদের ইজতিহাদে গুরুত্ব দিতে আহবান করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যেমনি ইসলামের রীতি–নীতির বিশদ ইজতিহাদ করেছেন। তেমনি, এ যুগের মুসলিম উলামাদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইসলামী জ্ঞানে এত অসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং ইজতিহাদের উপর তাঁর সমতুল্য আর কেউ ছিলেন না। দৃষ্টির কষ্টিপাথরে যদি তিনি কোন কোন হাদীসের উপমা (Reference) না নিয়ে থাকেন তাহলে তাতে অপরাধের কি আছে? তিনি তো এমন ইজতিহাদ কখনো করেননি যা ইসলাম ও মুসলমানদের নীতিবহির্ভূত ছিলো? ইকবাল লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কোরআন–হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইজতিহাদ করেছেন। কোথাও হাদীস বর্ণনাকারীদের মতের আধিক্যে গুরুত্ব দিয়েছেন, আবার কোথাও তিনি মওজূ হাদীসের উপরও আলোচনা করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমামে আজম আবু হানিফা (রঃ) ফিকাহ, উছুলে ফিকাহ, ইজমা, কিয়াস, তাফসীর, উছুলে তাফসীর থেকে ইজতিহাদলব্ধ বিপুল মতবাদ মুসলমানদের জন্য রেখে গেছেন, তার তুলনা হয় না। তিনি সর্বযুগের বাস্তবতার সাথে যুক্তিপূর্ণ ইজতিহাদ দ্বারা মাসয়ালা সমাধান দিয়েছেন। তাঁর কাছে ইসলামী শরীয়তের মাসায়েলী এমন কোন খুঁটিনাটি দিক ছিলো না, যা হাদীস তাফসীরের আলোচনায় অস্বীকৃতিপূর্ণ।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও অন্যান্য ইমামদের সাথে ইজতিহাদের মতবিরোধপূর্ণ অগণিত কিতাব প্রণীত হয়েছিল। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রঃ) ইমামের সেসব মাসায়েলের উপর গুরুত্বশীল ছিলেন এবং উচ্চপর্যায়ের দলীল–প্রমাণসহ তিনি তাঁর ইজতিহাদি মতবাদ উপস্থাপন করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম সাহেবের প্রতিটি মাসয়ালাতে ছিল শক্ত ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা (প্রমাণযোগ্য) বিশ্লেষিত, সংগতিপূর্ণ ও সন্দেহমুক্ত।

শেখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী এবং শেখ সনুসিদের আন্দোলনের সাথে তৎকালীন বাহাইদের মাজহাবী আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে ইসলামের দ্বিতীয় বিশ্ব রচনার দৃষ্টান্ত প্রকাশের স্বপ্নোদয় হয়েছিল। অথচ সবাই অবগত আছেন যে, বাহাইদের এমন

কোন দিক নেই যা ইসলামের নিয়মের উপর সংগতিপূর্ণ। শেখ সনুসিদের আন্দোলন তৎকালীন ফরাসী সভ্যতার উপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছিল। তিনি একজন বড় আলেম ও সূফী ছিলেন।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাবের আন্দোলন ছিল মাজহাবী এবং শিরক উচ্ছেদের জন্য উৎসর্গ। রাজনৈতিক সফলতা তেমনটা না ঘটলেও সেদিনের ওহাবী আন্দোলনে নজদ তথা সৌদি আরবের শিরক উচ্ছেদ হয়েছিল। শিরক উচ্ছেদে নজদি চূড়ান্ত সফল হয়েছিলেন। আল্লামা ইকবাল এসব আন্দোলনকে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু গোঁড়ামীর বিরোধিতা করেছেন দৃঢ়তার সাথে।

ইকবালের দৃষ্টিতে ইসলামের রূহানী নীতিসমূহের বাস্তব প্রতিফলনে ইজতিহাদ একান্ত অপরিহার্য। ছোট খাট ত্রুটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে মুসলিম জাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে তিনি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ইকবাল তুর্কী কবি জিয়ার বিপ্লব সংস্কার আন্দোলনে প্রশংসা করেছেন। জিয়ার ধরণা থেকে জানা যায়ঃ তিনি মনে করতেন,যতক্ষণ পর্যন্ত নারীদের অধিকার সুনিশ্চিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। সমাজের মহিলাদের ইসলামী সম্যক জ্ঞানে নিজেদেরকে আন্দোলনে আত্মনিয়োজিত করতে তিনি তার শিল্প চর্চায় আহবান করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তুর্কী কবি নারীদের তালাক ও মীরাছের উপর আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। তিনি ইসলাম নির্দেশিত ও কোরআনে বর্ণিত হুকুমের বিরোধিতা করেছেন মীরাছি সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে।

আল্লামা ইকবাল দৃঢ়তার সাথে কবি জিয়ার সে মতের খন্ডন করে দেন। ইকবাল বলেন, নারীদের তালাক ও মীরাছি সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে জিয়ার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তার যুক্তিসমূহ ঠিক নয়। কারণ, মানুষের জন্য ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম নীতি জানতে হলে কোরআন হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কবি জিয়ার সে ধারণা নেই। ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে বিবাহ করা এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত যে নীতি দিয়েছে তা অত্যন্ত যুগশ্রেষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত। কোরআনের যুক্তিতে স্বামীকে নির্ধারিত কতকগুলো কারণেই স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কবি জিয়ার ধারণা ভুল এবং তাতে নারী সমাজের ক্ষতিই বয়ে আনবে। পুরুষ ও নারীর অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামী নীতিই সর্বাপেক্ষা উন্নততর। ইসলাম নারীদের যতটা অধিকার প্রদান করেছে অন্য কোন ধর্ম মতে তা করেনি। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছেঃ "নারীদের প্রতি যেমনি পুরুষের হক বা অধিকার আছে তেমনি পুরুষের প্রতিও রয়েছে নারীদের পূর্ণ অধিকার।"

ইসলামের এ শাশ্বত নীতি ও বিধানানুযায়ী কোরআন মেয়েদের জন্য মীরাছি উইল সম্পদ বন্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সম্পদ বন্টনের নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কোরআনী

বুনিয়াদের উপর নারীদের বা মেয়েদের জন্য ইসলাম যেভাবে সম্পদ বন্টনের নিয়ম দিয়েছে তা নারীদের কল্যাণ ও অধিকার আরো দৃঢ় ও সুনিশ্চিত করেছে। মেয়েরা পিতা-মাতার সম্পদের অংশীদার হবে। তেমনি স্বামীর সম্পদেরও মালিক হবে। আবার স্বামীর পক্ষ থেকে মোহরানার পূর্ণ মালিকানা স্ত্রীরই থাকবে। এ ক্ষেত্রে যদি কোন স্ত্রী মাহরানা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সমস্ত দায়দায়িত্ব বর্তাবে স্বামীর উপর। স্বামীকে আল্লাহর কাছে ঠেকে যেতে হবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা যাবে এখানে ইসলামই সকলের অধিকারকে সমানভাবে নিশ্চিত করে দিয়েছে। নারীরা বেশী লাভবান হয়েছে। কারণ, স্বামী যতদিন জীবিত থাকবে স্ত্রীর সুখ-দুঃখের চিন্তা একমাত্র স্বামীকেই সবচাইতে বেশী করতে হবে। গভীর দৃষ্টিপাতে দেখা যাবে, ইসলাম কখনো কারো উপর থেকে কারো হক বা অধিকার ছিনিয়ে নেয়নি অন্যায়ভাবে; বরং, অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত করে দিয়েছে।

ইকবাল বলেনঃ *কোরআন যে আইন দিয়েছে তা-ই মানব জাতির উন্নতির জন্য খুব ফলপ্রদ। তিনি পারস্পরিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণে ইসলামের বিপ্লবী নীতিসমুহের প্রতি কঠোরভাবে নজর দেয়ার জন্য মুসলিম জাতির প্রতি আহবান জানিয়েছেন। শরীয়তের প্রকৃত নীতিগুলোর ব্যাপক গবেষণা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ঈমান-আকীদায় মুসলমানদের আরো দৃঢ় হতে ডাক দিয়েছেন। ইকবাল তুর্কী কবির কতিপয় নীতি পছন্দ করলেও ইসলামী নীতিতে তার অযৌক্তিক কোন রায় বা মতকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। বিন্দুমাত্র আপোষ করেননি কবি জিয়ার গোঁড়ামীর সাথে। তিনি জিয়ার নীতির সাথে সাধারণ মানুষের মতানৈক্যের ভয়াবহতার দিকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কবি জিয়া বলেছেন, নামাজ ও আজানে আরবী ভাষা ব্যবহারের কোন যৌক্তিকতা নেই। সর্বসাধারণ আরবী সম্পর্কে অবগত নয় বিধায় তিনি তাতে কোন উপকার মনে করেননি!*

ইকবাল কবি জিয়ার এই মতেরও বিরোধিতা করেন দৃঢ়তার সাথে। ইকবাল লিখেছেন, উত্তর আফ্রিকার মেহেদী মুহাম্মদ তুমরাত যখন সেদেশে নিজ শাসন কায়েম করেন তখন তিনি সেদেশে কোরআন তিলাওয়াত ও অনুবাদ নিজ ভাষায় করতে নির্দেশ দেন। নিজ ভাষায় আজান প্রথাও চালু করে ছিলেন।

প্রথমতঃ আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লামা ইকবাল কোন কিতাব থেকে এ ঘটনার উদ্ধৃতি (raference) নিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

মুহাম্মদ বিন তুমরাতকে ইমাম গাজ্জালী (রঃ) থেকে ছাত্রত্ব লাভ করতে হয়েছে। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম ছিলেন একথাও ইতিহাসে আছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে শেখ আবুল আব্বাস ও আহমদ বিন খালেদ নাসের মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস 'আল-মুসতাকছা' নামক গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, মুহাম্মদ বিন তুমরাত আজানের মধ্যে "ইছবাহ

অলিল্লাহিল হামদু" সংযোজন করেছেন। কিন্তু আল্লামা ইকবাল যে ঘটনার কথা বলেছেন, কোথাও সে সম্পর্কে উল্লেখ নেই

দ্বিতীয়তঃ হানাফী মাজহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'হেদায়া'–এর ভূমিকায় উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–এর কাছে ফারসীতে কোরআন শরীফের কিরাত পড়া জায়েয। উল্লেখ্য, ইমাম সাহেব এই বক্তব্য থেকে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ) 'কিতাবুল উস।' নামক গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)–এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যদি তাঁর উক্ত বক্তব্য থেকে ফিরে এসে থাকেন, তাহলে পরবর্তীতে উক্ত মাসায়েলী বক্তব্য কিভাবে (পুনরায়) এসেছে? এর জবাবে বলা যায়, হযরত ইমাম আজম আবু হানিফার কাছে একটি প্রশ্ন এসেছিল যে, যদি একজন ইরানী ফার্সীভাষী লোক সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেন আরবী ভাষায় একটি বাক্যও তার জানা নেই এবং মুসলমান হওয়ার দু'মিনিট পর যদি নামাযের ওয়াক্ত এসে যায় তাহলে তো তার উপর নামায আদায় করা ফরজ হয়ে যায়। কিন্তু নও–মুসলিম ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবেন? জবাবে ইমাম আজম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, নামাজ একবারে না পড়ার চাইতে নব দীক্ষিত মুসলমান ব্যক্তি এ অবস্থায় নিজ ভাষায় কিরাত পড়ে নামাজ আদায় করতে পারবেন। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) তাঁর বক্তব্যে ফিরে আসেন বা না আসেন, ইজতিহাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যে মাসয়ালা দিয়েছেন তা বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইকবাল উছুলে ফিকাহ, উছুলে হাদীস ও উছুলে তাফসীর ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ পাননি। তিনি ইজতিহাদের উপর যে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন তা যদি পুরোপুরি সম্পন্ন করতে পারতেন তাহলে তা হতো বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ ইকবালের কতিপয় উদ্ধৃতি উদাহরণের প্রতি নজর দিলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবেবলেইবিশ্বাস।

আল্লামা ইকবাল ইজতিহাদের চার উছুল কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের উল্লেখ করেছেন। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর কতিপয় ইজতিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইকবাল ইজতিহাদের উপর যে গ্রন্থ লিখেছেন তাতে খিলাফতে রাশেদাহ ও আব্বাসী খিলাফতের মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃতিমূলক ফিকাহ ও ইসলামী দর্শনের আলোচনা করেন। কোথাও কোথাও তিনি ওমর (রাঃ)–এর ইজতিহাদী মাসয়ালার উল্লেখ করলেও কোন ভিত্তির উপর সে ধরনের ইজতিহাদ করা যাবে তা সুস্পষ্ট উল্লেখ করেননি। তিনি কতিপয় দিক বিশদ আলোচনা না করাতে কিছু মুখরোচক লোকের কাছে সমালোচনার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। কতিপয় শিয়া মতাবলম্বী ভাইরা অভিযোগ করে বলেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) কোরআন বিশুদ্ধ ও গবেষণার জন্য কতিপয় বিধি–

নিষেধ জারি করেছেন যা আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করা হয়েছে। ইকবালও সে সূত্র ধরে তিন স্থানে মুক্ত ইজতিহাদের কথা বলেছেন যাতে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে বলে শিয়ারা মত প্রকাশ করেছেন।

কোথাও বলা হয়েছে যে-ইজতিহাদ দুইভাবে করা যায় -(এক) উছুলী; (দুই) ফরয়ী। উছুলী ইজতিহাদের চার ধরনের কথা ইকবাল বলেছেন। কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস-এ চার নীতির ইজতিহাদের ইকবাল গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। আর ফরয়ী ইজতিহাদের উপায় অবলম্বনে তিনি ২৫ প্রকারের নিয়ম জানিয়েছেন। যেমন-ইসতেহসান (গোপনীয় কিয়াস), সাধারণ সংশোধনী মতবিরোধ, বিতর্ক ও পরিবর্তন, পরিবর্ধন, স্থান-কাল জরুরীভিত্তি (Emergency) ইত্যাদিকে তিনি ইজতিহাদে ফরয়ীর অন্তর্ভুক্ত জানিয়েছেন।

ইসলামী শরীয়তের উপর ইজতিহাদের মধ্যে ফিকাহবিদগণ ফেতনার আশংকাজনক ও জরুরী অবস্থার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। কখনো স্থান ও সময়ের প্রয়োজনীয়তার উপরও ইজতিহাদের হুকুম এসেছে। স্থান-কাল ও পরিবর্তনীয় ইজতিহাদ কেমন হবে সে আন্দাজের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফার অন্যতম শিষ্য ইমাম কাজী আবু ইউসুফ তিনি আব্বাসী যুগের খলীফা হারুনুর রশীদের প্রশাসনের প্রধান বিচারপতি ছিলেন; তাঁর ফিকাহ কিতাব দুররুল মোখতারে তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়ঃ "যে ব্যক্তি নিজ সময়ের অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ধারণায় বাস্তবতার স্বীকার করে না, তার ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয়।"

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) সিরিয়ায় (শাম দেশে), সে দেশের বাসিন্দাদের উঠাবসার মাসায়েলী কতিপয় হুকুম জারি করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন মিসরে পৌছেন তখন সেখানকার (মিসরের) সময় ও পরিস্থিতির উপর তিনি সিরিয়াবাসীর উপর নির্দেশিত মাসায়েল কার্যকর নয় বলে জানান। সময় ও বাস্তবতার নিরিখে তিনি মাসয়ালা প্রদান করে মিসরবাসীর সুবিধা করে দেন।

হাফেজ ইবনে কাইয়ুম ও তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেম সমাজ, সিরিয়ার শেখ আবদুর রাজ্জাক এবং মিসরের শেখ আবু জোহা প্রমুখ ইসলামী শরীয়ত ও ফিকাহশাস্ত্রের উপর কিতাবসমূহ লিখে গেছেন, যাতে পরিবর্তনীয় সমাজ প্রভাবিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ইজতিহাদি মাসয়ালা কি ধরনের হতে পারে তার বিশদ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। এসব মাসয়ালা ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, গোষ্ঠীগত, সম্প্রদায়গতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয় ইকবালের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

ব্যক্তি বা একক মোছলেহাতের মাসয়ালার উদাহরণে আল-কোরআনে এমন হুকুম আছে-- যদি কোন ব্যক্তি কারো কল্যাণ ও উন্নতির জন্য নিজ সম্পদের অছিয়ত করে যায় তা বৈধ বা জায়েয । একদা এক ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এসে অছিয়ত করার অনুমতি চাইলেন। উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) জানতে

চাইলেন ঃ তার সম্পদ কি পরিমাণ আছে? উত্তরে সে ব্যক্তি জানালোঃ চার হাজার দিরহাম। তখন আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, সে ব্যক্তির পরিবার পরিজনের ব্যয়ভারের সদস্য সংখ্যা কতজন এবং তারা কারা? উত্তরে সে সবিস্তারে সব জানালে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ আপনি এ অবস্থায় অছিয়ত করে যেতে পারবেন না। ঐ ব্যক্তি বললো উম্মুল মুমিনীম! কোরআনে তো এ সম্পর্কে অনুমতি আছে? উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, উল্লেখ আছে। কিন্তু আপনি এটা দেখেননি যে, মাল সম্পদের উন্নতি ও কল্যাণ কি ও কাকে বলে? উত্তম ও কল্যাণ ঐ সম্পদকে বলে যেসব মাল সম্পদ দ্বারা আপনি শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারেন, আপনার আহল ও পরিবারের প্রয়োজন মিটানোর পর অতিরিক্ত ঐ সব সম্পদ সত্যিই সুখময় ও কল্যাণবহ হতো! কিন্তু আপনার পরিবারের প্রয়োজন বিধানের পরিমাণ মাফিক সে সম্পদ পর্যাপ্ত নেই। এ জন্যে আপনার মাল ও সম্পদের অছিয়ত দ্বারা সে সম্পদ কল্যাণবহ ও উন্নতিমূলক হবে না।

একবার স্পেন বিজয়ী আবদুর রহমান দাখেল রাষ্ট্রীয় প্রশাসক থাকাকালে রমজানের রোযা পালন অবস্থায় স্বীয় দাসীর সাথে সঙ্গম করেছিলেন। এ ঘটনার পর তিনি আলেম সমাজের কাছে জানতে চাইলেন তার জন্য কি করণীয়। জবাবে আলেমগণ কাফফারাস্বরূপ একজন গোলাম মুক্ত করে দেয়ার হুকুম দেন। উলামাদের এ ফতুয়া আল-কোরআনের আয়াতের উপর ভিত্তি করে উল্লেখিত হয়েছে-- "যদি এভাবে কেউ রোযা ভঙ্গ করে তাহলে প্রথমতঃ গোলাম আযাদের হুকুম কার্যকর হবে, অথবা দ্বিতীয়তঃ ষাটজন মিসকীনকে পেট পুরিয়ে খাওয়াতে হবে, ষাটটি রোজা একাধারে পালন করতে হবে।"

কোরআন মজীদের এ বুনিয়াদী হুকুমের প্রেক্ষিতে ফোকাহা এবং উলামাদের মত হচ্ছেঃ কাফফারার উত্তম গোলাম আযাদ করা, যদি সামর্থ্যে না কুলোয় তাহলে ষাট মিসকীন খাওয়ানো, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে ষাটটি রোযা রাখতে হবে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তৎকালীন উলামাগণ বাদশাহ আব্দুর রহমান দাখেলকেও গোলাম মুক্ত করে দেয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত মজলিসে মালেকী মাজহাবের একজন আলেম ছিলেন। তিনি উলামাদের উক্ত রায়ের সাথে মতানৈক্য প্রকাশ করে বললেনঃ বাদশাহকে অবশ্যই ষাটটি রোযাও পালন করতে হবে। উলামাগণ তার মতের বিরোধিতা করে বলেনঃ কোরআনে তো ধারাবাহিকভাবে যে কোন একটি কাফফারার কথা বলা হয়েছে। মালেকী মুফতি বললেনঃ আশ্চর্য ব্যাপার, কেন আপনারা এ ধরনের রায় দেন? কাফফারা আদায়ের শরীয়তি উদ্দেশ্য হচ্ছে শাস্তি বা তার বদলা দেয়া, যাতে পরবর্তীতে কোন পাপ কার্য না ঘটে। যে বাদশাহর গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য আছে সে কেন ষাট মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে না?

এ দুটো মাসয়ালাই ব্যক্তিপর্যায়ের। সমষ্টিগত সংশোধনী ইজতিহাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বিশ্বনবী (সঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুগে যুদ্ধে উদ্ধারকৃত ও বিজয়কৃত ভূমিসমূহ

মুজাহেদীনের মাঝে বন্টন করে দেয়া হতো। কিন্তু ওমর (রাঃ)–এর খিলাফতকালে যখন ইরাক জয় করা হয় তখন আমীরুল মোমেনীন ওমর (রাঃ) মুজাহেদীনের মধ্যে সে সব ভূমি বন্টন থেকে বিরত থাকেন। লোকেরা প্রশ্ন করলোঃ বিশ্বনবী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)–এর সময়ে তো উদ্ধারকৃত ভূমিসমূহ মুজাহেদীনের মাঝে বিতরণ করা হতো? উত্তরে ফারুকে আজম হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ যদি আজ তোমাদের মাঝে এসব ভূমি বন্টন করে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের পরবর্তী মুসলমানদের অবস্থা কি হবে? তারা কি তখন একচেটিয়া ভূমি জমি থেকে বঞ্চিত হবে না?

ইহুদী ও খৃষ্টানদের কন্যা বিবাহ সংক্রান্তে ওমর (রাঃ) আইন জারি করে দিয়েছিলেন। তিনি ইজতিহাদ করে বলেছেনঃ মুসলমানরা এখন থেকে তাদের বিবাহ থেকে বিরত থাকবে। যদিও কোরআনে এটা বৈধ করে দিয়েছে মুসলমানদের জন্য। হযরত ওমরের যুক্তি ছিল মুসলমানগণ যদি অমুসলিম রোমক মেয়েদের বিবাহ করতে থাকে। তাহলে আরব্য মুসলিম পরিবারের মেয়েদের অবস্থা কি হবে?

ইকবালের দৃষ্টিতে ইজতিহাদের বুনিয়াদী নিয়মের গুরুত্ব দিয়েই সবকিছু করতে হবে, যেন শরীয়তের আসল ভিত্তির খেলাফ না হয়।

কোরআন শরীফে যাকাত বন্টনের যে নিয়মের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যাদেরকে যাকাত দিতে হবে তাদের মধ্যে 'মুয়াল্লিফাতুল কুলুবের' কথাও উল্লেখ আছে। ওমর (রাঃ)–এর ইজতিহাদী মতে এ হুকুম ইসলামের দুর্বলতম সময়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু ওমরের সময় যখন ইসলাম সারা দুনিয়ায় শক্তিশালী হলো তখন তিনি মুয়াল্লিফাতুল কুলুবের হুকুম স্থগিত করে দেন। ঠিক তেমনি ওমর (রাঃ) বিদেশী ও বিধর্মী মেয়েদের বিবাহ সংক্রান্ত যে বিধি–নিষেধ জারি করেছিলেন তারও ভিত্তিগত উছুলী দিক ছিল। কোরআনে এ ক্ষেত্রে এমন অনেক হুকুম আছে যা মোবাহ বা জায়েয। কিন্তু তা ফরজ ও ওয়াজেব নয়। উল্লেখ্য, কোরআনে বলা হয়েছে ––"যখন তোমরা ইহরাম খুলবে বা ইহরাম ভঙ্গ করবে, তখন যার যার শিকারে লেগে যাও।" এ আয়াতে স্পষ্টতঃ 'ফাছতাদু' শব্দ দ্বারা আমর বা হুকুমের অর্থ নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু ওয়াজেবের অর্থে নয়; বরং, তা ইবাহাতের বা জায়েযের জন্য বলা হয়েছে (না করলে দোষ নেই)।

এভাবে কোরআনের প্রতি হুকুম–আহকামের উপর ইজতিহাদ করা যায়। আল্লামা ইকবালের ইজতিহাদগুলোও তেমনি ছিল যা মুসলমানদের ধর্ম–দর্শন ও বিজ্ঞানী চেতনায় ছিল ভরপুর। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ইকবাল সুফীবাদী কতিপয় কট্টরপন্থীদের একগুঁয়েমিতাকে অপছন্দ করতেন বিধায় কেউ কেউ তাঁকে সুফী সাধকের কাতারে ফেলতে রাজী নন। অথচ ইকবাল ছিলেন

আল্লামা ইকবাল

একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তানায়ক তথা সার্বিক ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিদ্যায় বিজ্ঞপন্ডিত।

ইকবাল কখনো নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন কর্মবাদ ও গতিশীলতায় একজন দক্ষ কর্মী। জীবনের প্রতিটি ধাপে তিনি মুসলমানদের উন্নতির চিন্তা ও দর্শন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ইকবাল ইসলামে গতিশীলতা ও প্রগতি প্রতিষ্ঠার সাধক শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন আফগানী (রঃ)-এর একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

ইকবাল বিশ্বের মুসলিম জাতিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও তামদ্দুনিক দিকে ধর্মীয় মহাপ্রজ্ঞায় পুনর্গঠন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তিনি ইসলামের যুগশ্রেষ্ঠ চিন্তার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও দর্শন দ্বারা এক নতুন যুগের দ্বার উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন। তিনি ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো রচনা করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন তাঁর চিন্তা ও কর্মে। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে তাঁর প্রতিটি কর্মধারা ইজতিহাদ করলে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জাতির কল্যাণ ও উন্নতি ফিরে আসতে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস।

করাচীস্থ ইকবাল একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'খোতাবাতে ইকবাল' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত

জওয়াবেশেকোয়া

।১৪।

কারা, বল, ত্যাগ করেছে আমার পাক-রসুলের পাক-বিধান,
সুখ-সুবিধার যুক্তি-মাফিক কারা চলে আজ আযাদ-প্রাণ?
কাহাদের চোখে ভালো লাগে আজ অপর জাতির রূপ ও সাজ?
বাপ-দাদাদের তরীকাতে আজ চলিতে কাহারা হয় নারাজ
অন্তরে নাই প্রেমের আগুন, আত্মাতে নাই তার দহন,
মুহম্মদের পয়গাম আর তোমাদের কারো নাই স্মরণ!

।১৫।

মস্‌জিদে আজ নামায পড়িতে যায় সে শুধুই গরীব লোক,
তারাই এখন রোজা রাখে সব-যতই না কেন কষ্ট হোক!
গরীব যাহারা তাদের মুখেই শুনি যাহা-কিছু আমার নাম,
তারাই দিতেছে গৌরবে ঢাকি' তোমাদের যত অসৎ কাম।
ধনীরা ত সব মত্ত-মাতাল শারাব পিয়ে সে সম্পদের
গরীব রয়েছে বলেই আজিও জ্বলিছে চেরাগ মিল্লাতের!

" পস্ চহ্ বায়দ্ করদ্? আয় আকওয়ামে শারক্ !"
তবে কি করা চাই ? হে প্রাচ্যের জাতিসমূহ !
এডভোকেট এ. এম. এম. আবদুল জলীল

আল্লামা ইকবালের " *পস্ চহ্ বায়দ্ করদ্*" নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থটি তাঁর ইন্তেকালের দুই বছর আগে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইকবাল তাঁর ঐতিহাসিক এলাহাবাদ বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ ' '*আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছি ইসলামের হাকায়িক ও মায়ারিফের গাওর ও ফিকিরের মধ্যে*" অর্থাৎ ইসলামের বৈশিষ্ট্য এবং আত্ম উপলব্ধির মধ্যদিয়ে স্রষ্টার পরিচয় লাভের চিন্তা ও গবেষণায়। আর তিনি তাঁর সেই চিন্তা ও গবেষণার ফসলকে অতি চমৎকার, পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর এই কাব্য গ্রন্থটির মধ্যে। এদিক দিয়ে এই গ্রন্থটিকে ইকবালের সারা জীবনের চিন্তার সারনির্যাস বলা যায়। আর সে জন্যই ইকবালের সমস্ত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে এটাকে বলা হয় অনন্য ও অতুলনীয়।

" *ইশকে রাসূল* " বা রাসূলের প্রেমকে কেন্দ্র করে এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থটি রচিত। ইকবালের বিশ্বাস মতে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের অস্বাভাবিক ও অচিন্তনীয় বিজয়মালার রহস্যের মূলে ছিল *"ইশকে রাসূল"*। সে জন্য ইকবাল তাঁর কাব্য গ্রন্থে মুসলমানদেরকে তাদের সেই বিস্মৃত গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইশকে রাসূলকে সেই লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়রূপে বিশ্লেষণ করেন। সুতরাং, এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কাব্যের প্রথম শ্লোক-এর মধ্যে পাঠকদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেনঃ *আমি প্রেম রাজ্য হতে এক নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তুলবো। কেননা, হরমের (পবিত্র স্থান বা আশ্রয় স্থানের) বিরুদ্ধে বিবেকের বিদ্রোহের আশংকা আছে।*

উপরের শ্লোকটিকে ইকবাল বিবেকের আক্রমণ হতে হরমের প্রতিরক্ষাকল্পে ইশকের এক নতুন অজেয় বাহিনী গঠনের সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আল্লাহর প্রেরিত বাণীতে স্থির ও অবিচল বিশ্বাস স্থাপন ও ইশকে রাসূলের কারণে সাহাবা কেরামগণ বে-পানাহ সয়লাবের মত দিকে দিকে অগ্রসর হয়ে রোমান ও পারস্য বাহিনীর মত মহাপরাক্রমশীল শক্তিকে চুরমার করে তথায় ইসলামের বিজয় নিকেতন উড্ডয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিবেকের যুক্তিতে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির কতক শর্ত মুসলমানদের জন্য অপমানজনক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক সে সন্ধিকে সূরা "ফাতহ্"-এর প্রথম আয়াতে প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করার সাথে সাথে হযরত উমর (রাঃ) যিনি ঐ অপমানজনক সন্ধির কারণে অতিশয় মর্মাহত হয়েছিলেন, তিনি আল্লাহর পবিত্র ঘোষণায় দৃঢ় বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ইশকে রাসূলের কারণে সে বিজয়ে আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দ্বারা আকাশ

বাতাশ মুখরিত করে তুলেছিলেন। এখানে বিবেকের বিচারে মুসলমানদের পরাজয় এবং রাসূলুল্লা'র কথায় তাদের বিজয় এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে হযরত উমরের ইশকে রাসুলের শিখায় তাঁর বিবেক জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছিলো। তদরূপ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর ভন্ড নবুয়তের দাবীদার ও যাকাত পরিশোধে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক বিদ্রোহীদের দমনের মহাসংকটকালে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্তিম ইচ্ছা খৃষ্টান রাজ সোহরাবীরের বিরুদ্ধে প্রস্তুতকৃত তবুকের অভিযান পূর্ণকরণার্থে মদীনার বাহিরে সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদের তুলনায় যেখানে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল অতিশয় অপর্যাপ্ত, সেখানে তার কিয়দংশ অন্যত্র প্রেরণ বিবেকের দৃষ্টিতে ছিল অনেকটা আত্মঘাতীমুলক। এই ব্যাপারে বিবেকপ্রসূত যুক্তি কখনো সায় দেয় না। কিন্তু ইশকে রাসূলের প্রবল চাপ হযরত আবু বকরকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য হতে একটুও বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি মুজাহিদদের কিয়দংশ প্রেরণ করলেন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এবং অবশিষ্ট মুজাহিদদের পাঠালেন পারস্য ও সিরিয়া অভিমুখে। ইশকে রাসূলের উপর আমলের ফল দাঁড়িয়েছিল অতিশয় আশাতীত ও আশ্চর্যজনক। মুজাহিদ বাহিনীর হাতে দেশের ভিতরকার বিদ্রোহী দল যেমন হয়েছিল নিশ্চিহ্ন তেমনি সুবিশাল পারস্য সাম্রাজ্য ও সিরিয়ার প্রকান্ড খৃষ্টান জগৎ হয়েছিল মুসলিম বাহিনীর করতলগত। এক কথায়, এই অভূতপূর্ব বিজয়ের একমাত্র রহস্য ছিল ইশকে রাসূল বা রাসূলের প্রেম। এর বিপরীতে পরবর্তী যুগে যখন থেকে মুসলিম জাতি আল্লাহর নির্দেশ, রাসূলের অংকিত পথ পরিত্যাগপূর্বক ইশকে রাসূলের পরিবর্তে অমুসলিমদের অনুকরণে ঈমানবিবর্জিত বিবেককে স্বীয় পথনির্দেশক ও দিক নির্ণয়করূপে গ্রহণ করে, তখন থেকে আরম্ভ হয় মুসলিম জাতির অধঃপতন।

ইকবাল তাঁর "*পস্ চহ্ বায়দ্ করদ্* " কাব্য গ্রন্থটিকে কতগুলো ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগে ইশকে রাসূলের উপর এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম ভাগে তিনি পাঠকদের সম্বোধনপূর্বক তার গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় ভাগকে তামহীদ বা ভূমিকা নামকরণ করতঃ সেই ভাগকে চারটি বন্দ বা কাব্য অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে ইকবাল তাঁর আধ্যাত্মিক পীর মুরশিদে রুমীর নিকট স্বীয় আকীদত বা ধ্যান ধারণা ব্যক্ত করেন। অতঃপর রুমী ইকবালকে বলেন, "*প্রাচ্যের জাতিসমূহ যেহেতু গভীর নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়েছে তুমি তাদেরকে তৌহিদের শিক্ষা দান কর যাতে তারা ইউরোপীয়দের দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারে।*" দ্বিতীয় বন্দ বা অনুচ্ছেদে রুমী ইকবালকে বলেন, "*দুনিয়া পূজারীর দল যেহেতু ইশক ও মহব্বতের অর্থ বুঝে না সে জন্য তাদেরকে ইশকের কথা দিয়ে সম্বোধন করো না।* তৃতীয় অনুচ্ছেদে রুমী ইকবালকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, "*যারা আযাদী বা স্বাধীনতার অন্বেষক তাদেরকে দ্বীন ও সিয়াসত অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম ও রাষ্ট্র শাসন প্রক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে অবহিত কর।*" চতুর্থ অনুচ্ছেদে রুমী মুমিনের হাকীকত বা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক বলেন যে, "*প্রকৃত মুমিন অন্যের স্বার্থে ও উপকারার্থে স্বীয় জীবন পরিচালনা করে।* "

ইকবাল এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ তামহীদ বা ভূমিকার তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম শ্লোকে মুরশিদে রুমীর মুখ দিয়ে বলেনঃ দ্বীন ও সিয়াসতের অর্থ পুনর্ব্যক্ত কর, সত্য সন্ধানীদের উভয়ের মর্ম পুনর্বার বল।

ইকবালের আকীদত গঠনে মুরশিদে রুমীর আধ্যাত্মিক প্রভাবের কারণে ইকবাল মাওলানা রুমীকে তাঁর রুহ–মন পীর বা আধ্যাত্মিক গুরু রূপে গ্রহণ ও বরণ করেন। এই কারণে ইকবাল তাঁর অন্যান্য কাব্য গ্রন্থেও রুমী হতে জীবনের রহস্য শিক্ষা লাভ করার কথা স্বীকার করেন। সুতরাং আরমুগানে হিজাযের ৭৭ পৃষ্ঠার রুবাইয়াতে ইকবাল বলেনঃ

হরমে আজান দিয়েছি আমি রুমীর মতো,
তাঁ হতে আমি শিখেছি জীবনের রহস্য যতো,
প্রাচীন কালীন ফেতনায় তিনি ছিলেন যেমন,
নবযুগের ফেতনায় আমি আছি তেমন।

এই প্রসংগে মুরশীদে রুমী সমন্ধে কিছু বলা যাকঃ

মাওলানা রুমী হিজরী ৬০৪ সাল মোতাবেক ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে বলখ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশানুক্রম হযরত সিদ্দিকে আকবরের সাথে মিলিত হয়। হিজরী ৬০৭ সালে তাঁর পিতা–খাজা বাহাউদ্দীন বরকত লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্রকে খাজা ফরীদ উদ্দীন আত্তারের নিকট নিয়ে তাঁর পায়ে ফেলে রাখেন। খাজা আত্তার স্নেহময় আবেগ দ্বারা বালকের জন্য দোয়া করেন। অতঃপর খাজা বাহাউদ্দীন স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফেরার পর তদানীন্তন খাওয়ারেজম বাদশাহর সাথে তাঁর মতপার্থক্যের কারণে তিনি স্বীয় জন্মভূমি চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন। অবশেষে কাওনীয়ায় গমন করতঃ তথায় বসতি স্থাপন করেন। হিজরী ৬৮২ সালে তিনি তথায় ইন্তেকাল করেন।

পিতার ইন্তেকালের পর মাওলানা রুমী পিতার স্থলাভিষিক্তিরূপে শিক্ষকের আসনে উপবিষ্ট হন। অতিশীঘ্র তাঁর প্রগাঢ় বিদ্যা ও পান্ডিত্যের যশঃ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মশীয়তে ইয্দী অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তাঁকে তিনি মুরশীদে রুমী করবেন। সে জন্য ঐ সময় তাঁর জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যার কারণে তাঁর জীবনে নেমে আসে এক মহাবৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই ঘটনা সম্বন্ধে আসরারে খূদী হতে ইকবালের বর্ণনার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেয়া গেলোঃ

একদা হযরত শেখ কামাল উদ্দিন জুনাইদী হযরত শামসে তিবরীযীকে আদেশ করে বললেনঃ তুমি মোল্লা জালাল উদ্দীনকে কথার মরু অঞ্চল থেকে বের করে পরিজ্ঞান বা দূরদৃষ্টির উপত্যকায় প্রবেশ করিয়ে দাও। অতএব, একদা শামসে তিবরীযী মাওলানার পাঠশালায় আগমন করে বলেনঃ "এই সমস্ত শোরগোল, কিয়াস ও ইসতিদলাল এবং কীল ও কাল অর্থাৎ কে কি

বলেছে, নিয়ে আলোচনা সবই অর্থহীন এবং অকেজো। এই সমস্ত কথা অর্থাৎ যুক্তিতর্ক এবং দর্শনশাস্ত্র দ্বারা খোদাকে পাওয়া যায় না। সুতরাং তুমি এই রাস্তা পরিত্যাগ কর।" একথা শুনে মাওলানা বললেনঃ "তুমি একজন বড্ড মূর্খ, যে কারণে তুমি হোকামা অর্থাৎ মহাপন্ডিতদের বিদরূপ করতে পারলে।" তিনি আরও বললেনঃ "*এই সমস্ত কথাবার্তা দিয়ে তোমার কি? তুমি এখান থোক বেরিয়ে যাও। অর্থাৎ, আমার দর্শনপূর্ণ কথা তুমি বুঝবে না। তুমি তোমার রাস্তা অবলম্বন কর।*"

মাওলানা তিবরীযীকে আরও বললেনঃ " *আমার আলোচনা তোমার বোধশক্তির বহু উর্ধ্বে। এটা উপলব্ধির আয়নাকে উজ্জ্বলতর করে।" একথা শুনে তিবরীযী এক উর্ধ্বশ্বাস ফেললেন, যার ফলে মাওলানার কুতুব খানায় আগুন লেগে তার সমস্ত কিতাব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মাওলানা তিবরীযীকে বললেনঃ "তুমি বিদ্যা ও জ্ঞানের এ অমূল্য ভান্ডার নষ্ট করলে কেন?"*

প্রতি উত্তরে মরদে আরিফ বললেনঃ ওহে পৈতা পরিহিত মুসলিম! এ সমস্ত যাওক ও হাল অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় জগতের স্বাদ ও পরিজ্ঞান দিয়ে তুমি কি করবে? আমার পরিজ্ঞান বা দূরদৃষ্টি, তোমার বোধশক্তির অনেক উর্ধ্বে। আমার শিখা অপরসায়নবিদের জীবনী শক্তিবর্ধক সুরাবিশেষ।" মোট কথা, ১২১৪ খৃষ্টাব্দে শামসে তিবরীযীর সাথে মাওলানার সাক্ষাত হয় এবং এই সম্পর্ক ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলমান থাকে। মাওলানা রুমী তিবরীযীর সাহচর্যে "সলুক " বা আধ্যাত্মিক পথের মানযিল বা ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট অংশ সে একই অবস্থায় অতিবাহিত করেন।

শামসে তিবরীযীর সাথে মাওলানা রুমীর সম্পর্ক আলোচনার পর আসুন আমরা ইশকে রাসূলের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। ইশকে রাসুল সম্বন্ধে আরমুগানে হিজাযের ৮৯ পৃষ্ঠায় ইকবাল বলেনঃ

স্বীয় মনযিল পাওয়ার তরে হেলাল সম চেষ্টা কর,
নিলাম্বরী আকাশেতে অবিরত বাড়তে থাকো,
পেতে যদি চাও তুমি এই ধরার উপর স্বীয় মোকাম,
খোদার সহিত দিল বাঁধিয়া মোস্তফারই রাস্তা ধরো।

সেই একই গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় ইকবাল আরো বলেনঃ

শুনতে চেওনা আমা হতে আরিফের কথা,
আশিকের স্বভাব ধারণ করি তারই ব্যথা,
গোলাপী রংয়ের অশ্রু দিয়ে এই বাগানে
ছড়িয়ে দিব শিশির সম বিন্দু আমি যথা তথা।

ইকবাল ও আধুনিক শিক্ষা

মূলঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমান অনূদিত

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইকবাল কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করে সে-সব দোষত্রুটির গঠনমূলক সমালোচনা করেন এবং যাঁরা শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সে সবের দিকে।

'স্কুল', 'সেমিনারি' (ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গন) 'শিক্ষার্থী' দ্বারা ইকবাল সাধারণত পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা তরুণদের জন্যে অভিশাপতুল্য, এ ব্যবস্থা তাদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করছে। মাদ্রাসা আর খানকার প্রতিও তিনি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না; কারণ, এর শিক্ষায়তনে জীবনের প্রতি আগ্রহ ও প্রেমের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না, হয় না জ্ঞান আর আদর্শবাদের পরিপোষণ।

'মাদ্রাসা আর খানকাহ থেকে হতাশা নিয়ে গাত্রোত্থান করলাম,
কারণ সেখানে জীবনের অগ্রগতি সাধিত হয় না, হয় না প্রেম,
জ্ঞান বা দৃষ্টি শক্তির পরিপোষণ।'

তিনি একইভাবে স্কুলের দেউলেত্ব আর সন্ন্যাসী-আলয়ের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেনঃ

'মাদ্রাসার বিদ্যার্থীরা অজ্ঞ আর কৌতূহলহীন,
খানকাহ্‌র সংসার-বিরাগীরা গভীরতাহীন আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জিত,

ইকবাল দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আধুনিক শিক্ষা অমঙ্গলকর; কারণ, এ শিক্ষা তরুণদের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে। এর ফলে যুবকদের মধ্যে চারিত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে। ভারসাম্যহীন শিক্ষার ফলে তরুণরা পরিবেশের সংগে, প্রতিবেশের বাস্তব পরিস্থিতির সংগে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সর্বত্রই

যে তরুণরা উচ্ছৃঙ্খল ও অস্থির, তার কারণ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-বিষয়ক পরিকল্পনাজাত আবেগ সংক্রান্ত ভারসাম্যের অভাব। তাদের অন্তর্নিহিত সত্তা ও দৃশ্যমান সত্তার মধ্যে একটা গভীর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দেহ আর মনের, জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে অতল ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। পরিণামে তারা অর্জন করেছে দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিসত্তা (split personality).

আজকের দিনের তরুণদের মন বুদ্ধিদীপ্ত ও আলোকচ্ছটাময়, কিন্তু তাদের আত্মা অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তরুণদের মানসিক বিকাশ আর আত্মিক অপকর্ষ উভয়ই ঘটে যুগপৎভাবে। তরুণদের সম্পর্কে ইকবালের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। তাই তিনি তাদের সম্বন্ধে যে সব উক্তি করেছেন আর মত প্রকাশ করেছেন তা কল্পনাপ্রসূত নয়, একান্তই বাস্তবভিত্তিক। তিনি দুঃখ করে বলেন যে, তরুণদের পানপাত্র শূন্য, আর তাদের আত্মা দীপ্ত ও প্রাণবন্ত মনে হলেও তা তৃষাতুর। তাদের অন্তর আলোকোজ্জ্বল কিন্তু ভালমন্দের পার্থক্য নির্ণয় ও প্রকৃত উপলব্ধির ক্ষেত্রে অক্ষম। হাল জামানার তরুণদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যগ্রস্ততা আর তাদের অদৃষ্ট হচ্ছে ব্যর্থতা। তরুণদের মধ্যে তারুণ্য নেই, তারা সচল মৃতদেহ। তারা নিজ পরিচয়কে অস্বীকার করে, কিন্তু অন্যের উপর আস্থা স্থাপন করতে সদা প্রস্তুত। পরদেশী আর আগন্তুকরা ইসলামী ভাবধারা নিয়ে গীর্জা আর মন্দির নির্মাণ করছে। পানশালার দ্বারপ্রান্তে মুসলিম তরুণদের শক্তি অপচয়ে নিঃশেষ হচ্ছে। তারা অলস, নিষ্ক্রিয় আর আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছে। তাদের অনাসক্তি, জড়তা আর নির্বীর্যতা এমনই অসীম যে, অন্তর-মাঝে তারা আকাঙ্ক্ষার স্পন্দনটুকুও অনুভব করে না। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা তাদের আত্মাকে ভোঁতা আর বস্তুত প্রাণহীন করে দিয়েছে।

মুসলিম তরুণদের মধ্যে আত্ম-শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা আর তাদের অদৃষ্টের প্রতি ঔদাসীন্য ব্যাপক। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে মুসলিম তরুণ ক্ষুদে দু'চার টুকরো রুটির বিনিময়ে তার সত্তা বিসর্জন করতে প্রস্তুত। তরুণদের যাঁরা পরামর্শদাতা তাঁরা তাদের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত তাদের (তরুণদের) মহত্ব ও গৌরব অর্জনের গূঢ় তত্ত্ব শেখাতে আগ্রহহীন। তাঁরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর আনন্দ ও তৌহিদের (আল্লাহ্র একত্ববাদের) শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা পাশ্চাত্য জগৎ থেকে বিগ্রহ ধার করতে মর্মপীড়া বোধ করেন না। হরমের (কাবার) সন্তানরা 'কলংকের পথে' তীর্থযাত্রা করতে ও রূক্ষতার পায়ে কপাল ছোঁয়াতে উৎসাহহীন নন। বিন্দুমাত্র রক্তপাত না ঘটিয়ে পাশ্চাত্য জগৎ তাদের হত্যা করেছে। বুদ্ধি তাঁদের উদ্ধত, হৃদয় মৃত আর দৃষ্টি নির্লজ্জ। নিষ্ঠুরতম আঘাত আর সর্বনাশও তাদের অন্তরে কোন রেখাপাত করে না। তাঁদের জ্ঞান আর শিক্ষা, বিশ্বাস আর রাজনীতি, চিন্তা আর আবেগ-সব কিছুই প্রেরণা লাভ করে বস্তুবাদের কাছ থেকে। তাদের হৃদয়ে কামনার ঢেউ জাগে না, মন তাদের উন্নত চিন্তা-ভাবনা-বিবর্জিত আর তাদের গোটা অস্তিত্বের উপর চেপে বসেছে স্নায়বিক দুর্বলতা আর নিশ্চলতা।

'স্কুলে আজকাল খোঁদাই করে যে মূর্তিগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে
তাদের অঙ্গে না আছে আযরের পরশ না আছে সৌন্দর্য।'
বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এইঃ
'ঈগল–শাবকদের তাঁরা জাগতিক বিষয়াদির পাঠ দান করেন।'
'ধর্মীয় শিক্ষার বিদ্যালয় তোমার শ্বাস রোধ করেছে,
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ধ্বনি আসবে কোত্থেকে?'
'মাদ্রাসায় কি চিন্তার সৌন্দর্য আছে?
খানকায় কি বর্তমান আছে রহস্যের আনন্দ?'
'ঈমানের সুরা থেকে জীবনের উষ্ণতার উৎসারণ,
হে প্রভু, ধর্মীয় শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানকে এ তরল অগ্নি দান কর।"
'এই কি আধুনিক দুনিয়ার গোটা ভাগ্য–
আলোকোজ্জ্বল মন, অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃকরণ, অতিনিকৃষ্ট আঁখি?'
'হায় ! তপ্ত শোনিত প্রবাহিত হচ্ছে স্কুলের যে তরুণের শিরায়
সেই কি–না পশ্চিমের ইন্দ্রজালের অসহায় শিকার !
তরুণরা তৃষ্ণার্ত, পেয়ালা তাদের শূন্য,
তাদের মুখমন্ডল মার্জিত, আত্মা অন্ধকার, বুদ্ধিবৃত্তি দীপ্ত।'
'দৃষ্টিহীন, বিশ্বাস–বিহীন, আশাহারা
তরুণের দৃষ্টি বিশ্বে কিছু দেখতে পায় না।

এ অবস্থা সত্ত্বেও ইকবাল হতাশ–বিমর্ষ হননি। তরুণদের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা, আর তাঁর কবিতায় তাদের জন্য আশা আর উৎসাহের বাণী অভিব্যক্তঃ

'আমি সেই সব তরুণদের প্রতি আসক্ত
যারা ফাঁদ পাতে নক্ষত্র ধরতে।
'প্রভাতে আমার হৃদয়ে যে হা–হুতাশ তা দান কর তরুণদের অন্তরে !'
ঈগল–শাবকদের পুনরায় পালক আর পাখা দান কর !
হে প্রভু ! আমার একটি মাত্র কামনা আছে–
প্রত্যেককে আমার দূরদৃষ্টি এনায়েত কর।'

এই আশা আর প্রত্যাশার এক ঝলক দেখা যায় তাঁর 'খিতাব বা *জওয়ানাঁ–ই–ইসলাম*'(ইসলামের তরুণদের উদ্দেশ্যে ভাষণ) ও অন্যান্য ক'টি কবিতায় । আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বজ্জনদের উদ্দেশে তাঁর বাণীতে নীচের পংক্তি দুটো বর্তমানঃ

'আরবের গৌরবের উৎস হরমের প্রচন্ড আবেগ'
তার স্থান ভিন্নতর, তার কানুন অনন্য।''

'এক নওজোয়ান কি নাম' (এক তরুণের উদ্দেশ্যে) কবিতায়ও তাঁর চিন্তা–ভাবনা আর আবেগের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়ঃ

''তোমার সোফা ইউরোপের, তোমার গালিচা ইরানের–
তরুণদের মধ্যে যখন আমি এ সব বিলাসিতা
প্রত্যক্ষ করি তখন অশ্রু হয়ে ঝরে আমার রুধির।
পদ আর পদবির কি মূল্য, খসরুর জাঁক–জমকেরই বা কি দাম
যখন হায়দারের মতো বীরদর্পে বিশ্বের মোকাবিলা কর না,
বা সালমানের মত জগতকে তুচ্ছজ্ঞানে কর না ত্যাগ,
চাকচিক্যময় আধুনিক বিশ্বে যে তুষ্টি খুঁজে পাওয়া যায় না,
তা হচ্ছে অকৃত্রিম ঈমানদারের গৌরব, তার সেই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।
তরুণদের অন্তরে যখন ঈগলের উদ্যম জাগ্রত হয়
তখন তার মঞ্জিল দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সুদূর আকাশে!
আশা ছেড়ো না ! হতাশায় মন আর আত্মার পতন,
প্রকৃত বিশ্বাসীর আশা–আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে আল্লাহ পাকের অন্তরঙ্গ জনদের মাঝে।
রাজা–বাদশাহদের প্রাসাদ তোমার বিশ্রামস্থল নয়,
তুমি বাজপাখি, তোমার বাসা নির্মাণ কর পর্বত–শিখরে।'

ইসলামের পরিবর্তে ভিনদেশী ধ্যান–ধারণা দ্বারা মুসলিম যুবকদের প্রভাবিত দেখলে ইকবাল অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তাঁর *'ফালসাফা–জাদা সৈয়দ–জাদা কেনাম'* (দর্শনা–ক্রান্ত সৈয়দ – নন্দনের উদ্দেশ্যে) কবিতায় তিনি লিখেছেনঃ

'তুমি যদি তোমার ব্যক্তিত্ব না হারাতে
তবে কেসিঁ–এর দাস হতে না;
বুদ্ধির শেষ অনুপস্থিতি
দর্শনজীবনথেকেঅপসারণ।
চিন্তার নিঃশব্দ সুরমালা হচ্ছে
কর্ম–প্রেমেরজন্যমৃত্যু।
ঈমান দ্বারা জীবন–পথ সংরক্ষিত হয়,
ঈমান হচ্ছে মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের গূঢ়তত্ত্ব।

মুহাম্মদের শিক্ষামালাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ,
তুমি আলীর পুত্র, বু-আলী (আবু সিনা) থেকে দূরে থাকো।
তোমার ভেদাভেদ লক্ষ্য করার দৃষ্টি নেই।
তাই বোখারার নেতা থেকে কুরাইশ নেতা উৎকৃষ্টতর।'

ইকবাল আধুনিক শিক্ষাকে মুসলমানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের জন্যে দায়ী বলে গণ্য করেন। তিনি বলেন যে, উদীয়মান তরুণদের অন্তরে উষ্ণতা ও ধর্মানুরাগ নেই। তরুণদের জবানে ধার আছে কিন্তু তাদের চোখে অনুতাপের অশ্রু বা অন্তরে আল্লাহ্-ভীরুতা নেই।

'পাশ্চাত্যের সুরমা মাখা চোখে ঔজ্জ্বল্য আছে।
সে চোখ আকর্ষণ করে, বাগ্ময়, কিন্তু সিক্ত নয়।'

তিনি আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে এ অবস্থার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী বলে গণ্য করেন। অমঙ্গলের অন্য একটি উৎস হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত যুক্তিবাদ বা প্রতি পদক্ষেপে লাভ আর সুবিধার যুক্তি উপস্থাপন করে আত্মার তেজ-বীর্যকে অসাড় করে দেয়।

নৈতিক ও বুদ্ধিগত অবক্ষয়ের আরও একটি কারণ হচ্ছে অপরিমিত বস্তুবাদ ও পার্থিব উপায়-উপকরণের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ও শিক্ষাকে চাকরি-প্রাপ্তি ও পদ-পদবি লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করার দুঃখজনক অভ্যাস।

'হে সুদূর আকাশ বিহারী-বিহঙ্গ, মৃত্যু শ্রেয়ঃ সে রুজির চেয়ে
যে রুজি ছেটে দেয় পক্ষ আর ব্যাহত করে উড্ডয়ন।'

আধুনিক শিক্ষার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এ শিক্ষা 'মা'আদ' (ভবিষ্যত)-এর পরিবর্তে 'মা' আশ' (জড় জীবন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ শিক্ষা বুলবুলের কণ্ঠ থেকে গান ও তার সৌন্দর্যের বিশিষ্ট প্রকৃতি কেড়ে নেয়। এ শিক্ষা রুটির ব্যবস্থা করে না, তবু কেড়ে নেয় আত্মা।

'এটা বুলবুলির বক্ষ থেকে অপহরণ করেছিল সংগীত,
আর অপহরণ করেছিল টিউলিপের রক্তের আগুন;
তুমি গর্বিত যে বিদ্যালয় আর শিক্ষা নিয়ে
তা তোমায় দেয়নি রুটি, তবু ছিনিয়ে নিয়েছে জীবন।'

ইকবাল আধুনিক শিক্ষার ক্ষতিকর চরিত্রকে সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দিয়েছেন আর নির্ভুলভাবে দুর্বল স্থানগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এই শিক্ষার কল্যাণে মানব জাতি যা কিছু লাভ করেছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে রুটি-রুজি লাভের উপায়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব, অসংগত সুবিধাবাদ, কৃত্রিম কৃষ্টি আর অনুকরণমূলক জীবন-যাপনরীতি।

"আধুনিক যুগ হচ্ছে তোমার মৃত্যুদূত,
রেজেকের ধান্দায় তুমি আত্মা থেকে বঞ্চিত;
তোমার শিক্ষা তোমাকে উন্নত আবেগ থেকে করেছে বিচ্ছিন্ন;
যে আবেগ মনকে পলায়ন প্রচেষ্টা থেকে রাখত বিরত
প্রকৃতি তোমাকে দিয়েছিল বাজপক্ষীর শ্যেনদৃষ্টি,
দাসত্ব তোমার অক্ষিকোঠরদ্বয়ে রেনে'র আঁখি ঢুকিয়ে দিচ্ছে,
স্কুল তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে গূঢ় তত্ত্বগুলো
যা পাহাড়ে আর মরু–প্রান্তরে রয়েছে উন্মুক্ত।"

আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগঃ এ শিক্ষা আরাম–আয়েশপরায়ণতা, ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে জীবনকে, সমুদ্রকে বদ্ধ ডোবায় পরিণত করে। শিক্ষার্থীর জন্যে ইকবালের প্রার্থনা হচ্ছেঃ

'আল্লাহ তোমাকে ঝড়–ঝঞ্ঝার সাথে পরিচয় করিয়ে দিন,
তোমার সাগরের পানি স্রোতহীন আর নিস্তরঙ্গ'।

আধুনিক শিক্ষা–পরিকল্পনা প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। এ শিক্ষা নির্বিচারে পাশ্চাত্যের আচার–আচরণ, রীতি–নীতি ও ভাবাদর্শ অনুকরণের প্রেরণা যোগায়, আর উপনিবেশবাদের পথকে করে প্রশস্ত, প্রাচ্যের জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয় পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি, আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ছদ্মাবরণে সৃষ্টি করে নতুন নতুন সমস্যা। যুগ–যুগ ধরে প্রচলিত প্রাচ্যের মূল্যবোধ আর ঐতিহ্যকে অবমূল্যায়নের মাধ্যমে এমন এক সমাজ সৃষ্টি করার প্রয়াস পায় যে সমাজ, মেকলের ভাষায়, নামে আর জন্মগতভাবে প্রাচ্যের কিন্তু অন্তরবস্তুতে ও বাস্তবে পাশ্চাত্যের।

পশ্চিম দেশীয় শিক্ষা–বিষয়ক পরিকল্পনার মূলে রয়েছে নাস্তিক্যবাদ, অথবা ন্যূনপক্ষে এর ধারণা জন্ম লাভ করেছে মানসিক অস্থিরতা ও বুদ্ধিগত নৈরাজ্যবাদে; সেই কারণেই এই শিক্ষা একই ব্যাধি আর অসম্ভব ভাবের প্রবেশ ঘটায় তরুণদের অন্তরে, যুক্তিবাদ আর মুক্ত–চিন্তার ছদ্মাবরণে সৃষ্টি করে সংশয়বাদ, অসন্তোষ আর বিশৃংখলা। ইকবালের মতে, বিকৃত দৃষ্টির চেয়ে দৃষ্টিহীনতা ভাল, আর অজ্ঞতা ভাল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মহীনতা থেকে।

"আমার কাছ থেকে জেনে নাওঃ অন্ধ
শ্রেয়ঃ যার দৃষ্টি বক্র তার চেয়ে;
আমার কথা বিশ্বাস কর যে সৎকর্মে নিযুক্ত স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি
ভাল সেই বিজ্ঞের চেয়ে যে আল্লাহর অস্তিত্ব করে অস্বীকার।'

যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানুষকে মহাশূন্য জয়ে ও বায়ুমন্ডলে উড়ে চলার সামর্থ্য দান করতে পারে, কিন্তু উলটে ফেলে দেয় আর আধ্যাত্মিক নোঙর-ঘাট থেকে বিচ্যুত করে তার উপকারিতা সম্পর্কে ইকবালের সন্দেহ বার বার উচ্চারিত হয়েছেঃ

'কি উপযোগিতা আকাশ পরিমাপকারী বুদ্ধির
যে বুদ্ধি নক্ষত্ররাজি আর গ্রহমন্ডলকে প্রদক্ষিণ করে
আর হাওয়ার কাঁধে ভর করে ভাসমান মেঘখন্ডের মত
উদ্দেশ্যহীনভাবে নিঃস্বীম বায়ুমন্ডলে ভেসে বেড়ায়?'

মানুষ যদিও *'সৃষ্টির মহাসমুদ্রে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তো'* আর 'অস্তিত্বের শস্য-ক্ষেতে থেকে সংগৃহীত ফসল', তবু আধুনিক শিক্ষা যন্ত্র, উৎপাদন-শিল্প ও বস্তুগত অগ্রগতির অন্যান্য নিদর্শনের তুলনায় তার মূল্য হ্রাস করতে সচেষ্ট। ইকবালের মতে, দুনিয়া মানুষের তাবেদার হওয়া বিধেয়, মানুষের দুনিয়ার কাছে তাবেদার হওয়ার নয়।

"নামিয়ে রেখো না আকাঙ্ক্ষার দীপ তোমার কর থেকে,
কামনা আর পরমানন্দের দশা অর্জন কর,
হারিওনা স্বীয় আত্মা দুনিয়ার চৌরাস্তায়,
বিনাশ কর চৌরাস্তা, আর ফিরে এসো নিজের কাছে।"
"দুটো জগৎকেই টেনে নাও নিজের কাছে
ভেগো না নিজ অস্তিত্বের কাছ থেকে;

প্রত্যক্ষ করো না তোমার বর্তমানকে অতীতের আলোকে,
আজকে গতকাল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না কেউ।"
"তোমার তো কোন সামঞ্জস্য নেই আল্লাহর (অনুগত) মানুষের সঙ্গে,
তিনি বিশ্বচরাচরের কর্তা, তুমি দাসানুদাস,
তোমার মাঝে নেই সৈকতেরও অন্বেষা,
তিনি নিজের মাঝে ধারণ করেন মহাসমুদ্রের কেন্দ্রস্থল।"

অলৌকিক অনুগ্রহ আর ঐশী প্রত্যাদেশ (ওহী) ছাড়া মানবের উপলব্ধি থাকে অসম্পূর্ণ। পরিপক্কতা লাভের পূর্বে তাকে মুক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত করার অর্থ হচ্ছে খেয়ালিপনা ও উচ্ছৃংখলতাকে আমন্ত্রণ করা। ইকবাল *"আযাদি-ই-ফিক্র"* (চিন্তার স্বাধীনতা) নামের এক ক্বিতায় (দ্বি-চরণ কবিতায়) লিখেছেনঃ

"চিন্তার স্বাধীনতা ধ্বংস সাধন তাদের জন্যে
যাদের নেই বিশোধিত চিত্ত;

চিত্তটি যদি হয় অপরিণত তা হলে চিন্তার স্বাধীনতা
পরিণত হয় মানুষকে পশুতে বানাবার পন্থায়।'

অপরিণত ভাবাদর্শগুলো যে-ভাবে ব্যাপকতা লাভ করছে আর যে-ভাবে আংশিক-জীর্ণ মতবাদসমূহ বস্তুগত অসন্তোষ সৃষ্টি করছে তা হলো প্রতিটি মস্তিষ্ক-তরঙ্গকে দর্শন নামক মর্যাদাবান নামে অভিহিত করার আধুনিক

যে বাতিক তার পরিণামঃ

''শাস্ত্রীয় বিদ্যাদান কেন্দ্রের লোকেরা পাণ্ডিত্যের গোলক ধাঁধায় দিশাহারা,
আধুনিক যুগে কে আর ভাল মন্দের হিসাব কষবার ধার ধারে?"

'*আসূর্-ই-হাযির*' (আধুনিক যুগ)-শীর্ষক আরও একটা কবিতায় ইকবাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় গোলার্ধের ত্রুটিগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন যে, প্রযুক্তিবিদ্যার যুগের অশোভন ত্বরা ও অধৈর্য সবকিছুর কাঠিন্য ধ্বংস করেছে আর দর্শনকে পরিণত করেছে কতগুলো চিন্তার অবিন্যস্ত সমষ্টিতে। পাশ্চাত্য জগতে প্রেম (হৃদয়সঞ্জাত আবেগাদি) তার যথার্থ স্থান লাভ করেনি, কারণ সেখানে নিরীশ্বরবাদ প্রেমের আবর্তনের জন্যে কোন অক্ষ রাখেনি, আর চিন্তায় কোন সংগতি ছিল না বলে প্রাচ্যে বুদ্ধি তার ন্যায়সংগত স্থান পায়নি।

পরিণত ভাবরাজি, পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত চিন্তা, কে আছে
এ-সবখোঁজবার
বর্তমান যুগের জলবায়ু সব-কিছুকেই অপরিণত রাখে।
বিদ্যায়তন বুদ্ধিকে লাগাম ছেড়ে দেয়, কিন্তু
প্রেমকে তা না দিয়ে মতগুলোকে অস্পষ্ট, সংগতিহীন আর বিশৃংখল রেখে দেয়।
চিত্তের নাস্তিক্যবাদী প্রবণতার কল্যাণে পাশ্চাত্যে প্রেমের ঘটেছে মৃত্যু।'
চিন্তার অসঙ্গতির কারণে প্রাচ্যে বুদ্দি স্বাধীনতাহীন।'

আধুনিক শিক্ষা যুবকদের মধ্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে এতদূর উৎসাহিত করে যে পরিণামে মৌলিকত্বের ধাত বা স্বাধীন কর্মস্পৃহার অণু-মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। পৃথিবীটাই প্রচলিত রীতির দাস কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বেশ সংকীর্ণ ও গোঁড়ামি-শৃংখলিত, আর সেখানে অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যুগ-নেতার ভূমিকা পালন করার চেয়ে স্বদলত্যাগী, সুযোগসন্ধানী ও কালের গোলাম হওয়ার গৌরবের মনে করেন।

বাদাকশানের চুনির চাষ যদি তোমার হয় উদ্দেশ্য
তা হলে খেয়ালী সূর্যের প্রতিবিম্ব তুচ্ছ।

বিশ্বটা প্রচলিত রীতির জালে আবদ্ধ,
বিদ্যায়তনের কি মূল্য, কি দাম জনদের চেষ্টার?
যারা যুগ-নেতার কাজ করতে পারত,
হায়! তারাই হয়েছে যুগের আজ্ঞাবহ।

ইকবাল মনে করেন মুসলিম তরুণ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই; তারা পাশ্চাত্যের ছায়া মাত্র এবং তারা কৃত্রিম জীবন যাপন করে তাও ধার করা। নতুন বংশধররা পশ্চিমা কারিগর দ্বারা পিটিয়ে তৈরি করা মাংস আর বস্তুর কাঠামো, কিন্তু এর মাঝে তারা আত্মা প্রবিষ্ট করেনি। এটা এমন একখানা খাপ যার গায়ে অলংকরণের অভাব নেই, কিন্তু ভিতরে নেই অসির অস্তিত্ব। ইকবাল সুতীব্র ক্ষোভের সাথে মন্তব্য করেন যে, তরুণদের দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব একটি কল্পকথা আর তার নিজ অস্তিত্ব ছায়তুল্য ও অবাস্তব।

তোমার সত্তা ইউরোপ থেকে সংগ্রহ করে আলোঃ
তুমি ইউরোপের স্থপতিদের দ্বারা নির্মিত চার দেয়াল;
কিন্তু বাসকারীবিহীন কদর্মনির্মিত এ এমারত,
পুষ্প-চিত্রিত, অলঙ্করণ সজ্জিত শূন্য অসি-আধার;
আমার সত্তার কাছে
তোমার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত।
তাকেই বলে জীবন যা থেকে বিচ্ছুরিত হয় আত্মার স্ফুলিঙ্গ,
এটা খেয়াল কর! তোমার আত্মার জ্যোতি পড়ে না আমার নজরে।'

পশ্চিমের শিক্ষা সম্পর্কীয় পরিকল্পনা মুসলিম তরুণের আত্মাকে চূর্ণ করেছে, আশা আর উচ্চাভিলাষের অগ্নি-প্রজ্বলিত করার পরিবর্তে তাতে ভরে দিয়েছে যন্ত্রণা আর বিতৃষ্ণা। এ শিক্ষা তরুণদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন শিক্ষা দিয়েছে, তাদের কোমল আর স্ত্রৈণ করেছে আর জীবনের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবার ক্ষমতা থেকে করেছে বঞ্চিত। যে শিক্ষা মানুষকে মুজাহিদদের পুরুষোচিত গুণাবলী থেকে বঞ্চিত করে আর জীবনের রণক্ষেত্রে বিলাস-সামগ্রী সরবরাহ করে, যুদ্ধাস্ত্র ছিনিয়ে নেয় সে-শিক্ষাকে ইকবাল মূল্যহীন-অসার বলে মনে করেন।

যে বংশধররা আজ বড় হয়ে উঠছে তাদের কল্যাণে ব্রতীদের কাছে ইকবাল আকুল আবেদন জানান, আর যখন এক ছাত্রবৎসল শিক্ষক ও এক স্নেহশীল অভিভাবকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ভাবাবেগ প্রকাশ করেন তখন মনে হয় সারা বিশ্বের যন্ত্রণা ঘনীভূত হয়ে তাঁর হৃদয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আর গোটা মুসলিম মিল্লাতের দুঃখ-বেদনা তাঁর অস্তিত্বকে করেছে অভিভূত ঃ

'হে হরমের বৃদ্ধ! আশ্রমের পোশাক ত্যাগ কর,
আমার বিলাপের মর্ম কর হৃদয়ঙ্গম;

আল্লাহ তোমার তরুণদের সালামতে রাখুন !
তাদের ব্যক্তিত্বের, আত্মকৃচ্ছ্রতার শিক্ষা দাও !
তাদের শিলা বিদ্ধ করার পথ বলে দাও,
পাশ্চাত্য তাদের কাঁচের জিনিসপত্র তৈরির প্রণালী শিখিয়েছে;
দু'শো বছরের দাসত্ব তাদের হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছে;
এখন ভেবে–চিন্তে তাদের বিভ্রান্তিমুক্ত করার একটা দাওয়াই বের কর;
আমার প্রমত্ততায় তোমার গোপন কথাগুলো প্রকাশ করছি,
আমার মর্মযন্ত্র গাও রেখো খেয়ালে।'

জওয়াবেশোকোয়া

।১৬।

কওমের যারা ওয়ায়েজ, তারা ধার ধারে নাক' সুচিন্তার,
বিদ্যুৎ সম তাদের কথায় হয় না এখন আছর আর।
ফল সুফা আছে, প্রাণহীন পড়ে', আল–গাজালীরে কোথায় পাই!
মসজিদ আজি মর্সিয়া গায়–নামাযী নাহিক' তার ভিতর,
হেজাযীরা ছিল যেমন–তেমন কোথায় মিলিবে ধরার' পর!

।১৭।

খুবত কহিছঃ দুনিয়া হইতে বিদায় হইতে বিদায় নিতেছে মুসলমান!
প্রশ্ন আমারঃ মুসলিম কোথা ? সে কি আজো আছে বিদ্যমান ?
চলন তোমার খৃষ্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন,
ইহুদীও আজি শরম পাইবে দেখিলে তোমার এ–সব গুণ!
হ'তে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হতে পার তুমি সে আফগান,
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাইঃ বলত' তুমি কি মুসলমান?

।১৮।

সত্য–ভাষণে মুসলামানের কণ্ঠ ছিল সে সুনির্ভীক,
সবার প্রতিই অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিত ঠিক।
বৃক্ষের মত স্বভাব তাহার নম্র হইতে ফল–ভরে,
ধৈর্য, সাহস, বীর্য ও বল ছিল তাহাদের অন্তরে।
প্রীতি–উৎসবে সে ছিল যেমন অধরে স্নিগ্ধ লাল–শারাব,
ত্যাগে ছিল তার তেমনি আবার পান–পিয়ালার রিক্তভাব।

।১৯।

ক্ষতের যেমন ছুরিকা, তেমন মিথ্যার ছিল মুসলমান
আর্শিতে তার পান্নার মত কীর্তি ছিল সে দীপ্তমান।
আপন বাহুর তাকতের পরে ছিল সুগভীর আস্থা তার,
মৃত্যুর ভয়ে তোমরা কাতর–ভয় ছিল তার শুধু খোদার!
পুত্র যদি সে লায়েক না হয়, পিতার শিক্ষা যদি না পায়,
পিতৃধনে সে কেমন করিয়া অধিকারী, বল হইতে চায়।

ইকবাল কাব্য ঃ আল-কোরআনের ব্যাখ্যা

মূলঃ ডক্টর মুহাম্মাদ বাকের
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম অনূদিত

ইকবালের মতে *ইসলাম* এমন এক সর্বব্যাপী এবং সার্বজনীন জীবন–ব্যবস্থা, যা মানুষের ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনে শান্তি ও মুক্তির অনুপম দিক–নির্দেশনা, সুস্পষ্ট হেদায়েত পেশ করে। দ্বীনে হক বা ইসলামী জীবন–ব্যবস্থা সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল আজীবন এই প্রত্যয় ঘোষণা করে গিয়েছেনঃ

'' নবী মোস্তফার (সঃ) আনীত দ্বীন
সেই তো জিন্দেগীর প্রাণসত্তা,
এরব্যাখ্যাপ্রাণশক্তিতে
উজ্জীবিত থাকারই বলিষ্ঠ উচ্ছলতা।''

এই সত্য যদি আমরা স্বীকার করে নিই যে, আল্লামা ইকবাল একমাত্র ইসলামকেই মানবতার জন্যে জীবন–ব্যবস্থা হিসেবে মনে করতেন, তাহলে এটা ধারণা করার কোন অবকাশ থাকে না যে, আল্লামার চিন্তাধারাকে সূফীবাদ ও সূফীবাদের ধ্যান–ধারণা প্রভাবিত করেছে। কারণ, সূফীবাদের ধ্যান–ধারণা ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করে না; বরং, *আল–কোরআনই* একে একটি গতিশীল জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। আল–কোরআন সম্পর্কে ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি সুদৃঢ় ভিত্তি এবং অনড় প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার একটি সম্যক ধারণা আমরা বাস্তব কয়েকটি উদাহরণ থেকে পেতে পারি। কর্নেল সাইয়্যেদ ওহীদ উদ্দীন একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেনঃ

"সেই সময়ের কথা, যখন ডক্টর ইকবাল ম্যাকলিয়ড রোডের একটি বাড়ীতে থাকতেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে একজন নতুন সাক্ষাতপ্রার্থী আসেন। সাক্ষাতকালে বিভিন্ন বিষয়ে কথা–বার্তা চলছিল। এরই মাঝে আগন্তুক ডক্টর ইকবালকে একটি প্রশ্ন করে বসলেনঃ আপনি ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস ও দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত জ্ঞান–বিজ্ঞানের বই–পুস্তক পড়েছেন, এর মধ্যে সবচাইতে উঁচু মর্যাদা এবং বিজ্ঞানময় কোন্‌টিকে পেয়েছেন? তিনি প্রশ্নটি শুনে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। হাতের ইশারায় আগন্তুককে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে বললেন, আমি এক্ষুণি আসছি। তিনি ভেতরে গেলেন। দুই–তিন মিনিট পর ফিরে এলেন। তাঁর হাতে ছিল তখন একখনা কিতাব। এই কিতাবকে লোকটির হাতের ওপর রেখে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেনঃ "মহাগ্রন্থ আল–কোরআন"।

বস্তুতঃ ইকবালের চিন্তা ও মনন জগতে যে মহাগ্রন্থ মহাআলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, প্রজ্বলিত করেছিল বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিংগ, সেই গ্রন্থ হচ্ছেঃ আল-কোরআন। অবশ্য একশ্রেণীর আলেম এই মহান চিন্তানায়কের সাথে একমত পোষণ করতে পারেননি। এর প্রমাণ আমরা পাই তাঁর সাথে হোসাইন কোরাইশীর অনুষ্ঠিত নিম্নের কথোপকথনের মধ্যেঃ

হোসাইন কোরাইশীঃ মা'রিফাতে ইলাহী বা আল্লাহ দর্শনের তাৎপর্য কি?

ইকবাল ঃ জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ)-এর মতে, মা'রিফাত বা ইরফান প্রভৃতি শব্দকে আল্লাহর দিকে নির্দেশ বা উদ্দিষ্ট করা উচিত নয়। কারণ, আল কোরআনে এসব শব্দের এ ধরনের ব্যবহার করা হয়নি। অবশ্য, আল-কোরআনে ইল্‌ম ও ঈমান শব্দের পৌনপুনিক ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা না আরিফ, না মারুফ। হ্যাঁ, তাঁর পরিচয় পেশ করা হয়েছে *'আলিম'* ও *'আলেম'* হিসেবেবহুআয়াতে।

'ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল ওলামাউ' (আল-কোরআন-৩৫ঃ২৮) অর্থাৎ আল্লাহকে ওসব লোকই ভয় করে যারা তাঁর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এখানে ইরফান নয়—ওলামা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (মালফূজাতে ইকবালঃ মাহমুদ নিজামী -৪৪-৪৫ পৃঃ)।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, আল্লামা ইকবাল মানুষকে কোরআনের নীতি-নির্দেশের চৌহদ্দিতে থেকেও মা'রিফাতে ইলাহীর দাবী পেশ করার অধিকার দেননি। কারণ, কোরআন মাজীদে এ ধরনের দাবী উথাপনের কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

১৯৩৫ সালের ১২ এপ্রিল আরশী নামক জনৈক ব্যক্তি আল্লামা ইকবালের কাছে জানতে চাইলেনঃ

'ইসলাম কি সামগ্রিক দিক থেকে কোরআনের আবেষ্টনিতে আবদ্ধ' ?

ইকবালঃ আরো স্পষ্ট করে বলুন।

আমি (প্রশ্নকারী) বললামঃ কোরআন ছাড়া সমুদয় হাদীস সংগ্রহ, ইতিহাস বর্ণনা এবং সমস্ত ইসলামী সাহিত্য ও ফিকাহর গ্রন্থাবলী--ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে কি ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ পেশ করে, না এ ক্ষেত্রে কোরআনই যথার্থ?

আল্লামা ইকবাল বললেনঃ এসব কিছু ইতিহাস ও আচরণের অন্তর্ভুক্ত। এসবেরও প্রয়োজন আছে বৈ কি।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, কোন্ ধরনের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে এগুলোর ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু, ইসলামের প্রাণসত্তার পেছনে আল্লাহর যে পরিকল্পনা রয়েছে তা বুঝার জন্যে আল-কোরআনের বাইরে কোন অবলম্বন ধরার প্রয়োজন নেই। (মালফূজাতে ইকবাল, মাহমুদ নিযামীঃ পৃঃ ৫৫-৬৪)।

এই নিবন্ধে আমি ইতিপূর্বে মন্তব্য করেছি যে, আল্লামা ইকবাল ইসলামকে শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের জন্যেই নয়; বরং, পরকালীন জীবনের জন্যেও সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা মনে করতেন। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে আল্লামা বলেনঃ

'ইসলাম মানুষকে জীবন্ত ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা দান করেছে। মানুষের জীবন সম্পর্কে কোরআনের এই চিন্তাধারা শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; বরং, মানুষের পরকাল এবং মৃত্যুর পরবর্তী সকল অধ্যায়েও এই জীবন–ব্যবস্থার ব্যাপ্তি রয়েছে; যাতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মানুষের জন্যে যে নির্ধারিত পুরস্কার অথবা শাস্তির ব্যাপারে কোরআনে বার বার আলোচনা করা হয়েছে সেই পুরস্কার ও শাস্তি যেমনি হবে আত্মিক, তেমনি হবে দৈহিকও। (আসারে ইকবালঃ ৭২–৭৩)।

ইসলামের ব্যাপারে আল্লামার এই দৃঢ় প্রত্যয় চিন্তাশীল মানুষকে এটা ভাবতে বাধ্য করে যে, ইকবাল আসলে ইসলামকে কোন্ অর্থে বুঝতেন। এটা সবারই জানা, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে তৌহিদ। তাই, ইকবাল রমুয–এ–বেখুদী কাব্য গ্রন্থের সূচনাই করেন তৌহিদের আক্বিদা প্রচারের মাধ্যমে। তিনি তৌহিদকে মিল্লাতে ইসলামিয়ার মৌলিক ভিত্তি এবং মুক্তির উৎস হিসেবে ঘোষণা করে বলেনঃ

"আত্মস্থ করেছে আহলে হক
তৌহিদেররহস্যকে,
আরএতোকোরআনেরইনির্দেশনাঃ
যা কিছু আছে আসমান ও জমিনে,
সমর্পিত গোলামের রূপে,
সবই হবে হাজির তারই সকাশে।"
(রমুযে বেখুদীঃ ৯১, সূরা ১৯ঃ৯৩)

ইকবালের রমুযে বেখুদী কাব্যগ্রন্থের প্রতি ছত্র থেকে এটা পরিস্ফুট হয় যে, তাঁর সমগ্র চিন্তাজগতকে কোরআনের আদর্শ আবিষ্ট করে রেখেছিল। হেদায়েতের এই মূল উৎস থেকে তিনি শুধু কল্যাণের ফসলধারাই সংগ্রহ করেননি; বরং, স্বীয় চিন্তা–দর্শনের বাণী উপস্থাপনের সময় অকুণ্ঠ চিত্তে একের পর এক কোরআনের সূত্র উল্লেখ করেছেন এভাবেঃ

"আমরা মুসলমান, আমরা বংশধর খলিলের"
প্রমাণ যদি চাও–
তাহলে পড়ো এই মহান আয়াতঃ
'আপনপিতাইব্রাহীমের
মিল্লাতে হয়ে যাও প্রতিষ্ঠিত।'
আল্লাহই তো তোমাদের নাম

প্রথমেই রেখেছেন মুসলমান
আর এই কোরআনও তোমাদের দিয়েছে সেই একই নাম।
(কোরআনঃ ৭৮ঃ২২)

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই মুসলিম মিল্লাত তৌহিদের আক্বিদার সাথে কোন্ ধরনের আচরণ করেছে? এর তীব্র সমালোচনা করে আল্লামা ইকবাল বলেনঃ

"আল্লাহ সৃষ্টি করেন প্রথমে আমাদের দেহ
মাটির পিঞ্জিরে ফুঁকে দেন
রিসালাতের মাধ্যমে প্রাণসত্তা রূহ
আমাদের সৃষ্টি এই বিশ্বে রিসালাতের বদৌলতে,
আমাদের দ্বীন, আমাদের আইন–
সবই রিসালাতের অমীয় ফসল।
রিসালাতের সূত্রে
আমাদের লাখো প্রাণ একতার বন্ধনে একীভূত;
সীসাঢালা প্রাচীরের মতো
অভিন্ন, অচ্ছেদ্য মিল্লাত।
সেই সত্তাই মালিক সর্বক্ষমতার।
যাকে চান, তিনি দেখান আলোর পথ
তিনিই অংকিত করে দিয়েছেন
আমাদের রিসালাতের সীমানা।
যাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমাদের দিয়েছে মিল্লাতের মর্যাদা
রিসালাত, সেতো দুনিয়াবাসীর
জন্যে অবারিত রহমতেরই উৎসধারা।"

উপরোল্লিখিত কবিতা ছত্রগুলোতে কোরআনের কোন আয়াত সরাসরি উৎকলন করা হয়নি, শুধু ইংগিতই দেয়া হয়েছে। কিন্তু, এগুলোর ওপর একটু চিন্তা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইকবাল তাঁর চিন্তাদর্শের কাব্যিক প্রকাশে কোরআন থেকে শুধু উপকরণই সংগ্রহ করেননি; বরং, শব্দাবলীও চয়ন করেছেন।

রিসালাতের বরকত ও সুনির্দিষ্ট তাৎপর্যের ব্যাখ্যা আল্লামা ইকবাল এভাবে দিয়েছেনঃ

"রিসালাতের বদৌলতে আমরা হয়েছি
একে অপরের সাথী,
এক আত্মা

একইআকা ঙ্ক্ষারঅধিকারী।
অভিন্ন আকা ঙ্ক্ষা পোষণকারী
এমনি বহু মানুষ আমরা
রচনা করেছি ঐক্যের ব্যূহ।
সব আধিক্য এককের বন্ধন
থেকেই হয় সঞ্জীবিত।
আর মুসলিম মিল্লাতের
ঐক্যের ভিত্তি গড়ে ওঠে
দ্বীন-এ-ফিৎরাতের
একনিষ্ঠ অনুসরণ থেকে।
সেই দ্বীনে ফিৎরাত
যার শিক্ষা আমরা
পেয়েছি নবীর কাছ থেকে।
যারহেদায়েতেরআলোয়
প্রজ্বলিত হয়ে আমরা জ্বালিয়েছি
হকের রাহে দীপ্ত মশাল।
(এরই ফলে) মহান আল্লাহ্ পূর্ণতা
দিয়েছেন আমাদের ওপর শরীয়তের,
রিসালাতের ধারায়সমাপ্তি টেনেছেন
রাসূল মোহাম্মাদের সত্তায়।
(এ যেন তাঁরই ঘোষণা,
আমার পর আসবে না কেউ
আরনবী হয়ে
আলাহর বড় এক ইহসান,
দ্বীনে মোস্তফার পবিত্রতা
রক্ষাকারী)।

উপরোল্লিখিত বিশ্লেষণের নিরিখে বিচার করলে কোরআনের সেই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট হয়, যাতে বলাহয়েছেঃ

"তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে আকড়ে ধরো, পরস্পর থেকে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেওনা। স্মরণ করো আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা, যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের দুষমন তখন তোমাদের অন্তরগুলোকে একই সূত্রে বেঁধে দিয়েছি, সৃষ্টি করে দিয়েছি তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। তোমরা ছিলে দাঁড়িয়ে অগ্নিকুন্ডের প্রান্তসীমায় তাঁর থেকে তোমাদেরকে আমিই রক্ষা করেছি।" (আল- কোরআন ৩ঃ১০৩)

তওহীদ ও রিসালতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল স্বয়ং তাঁর বক্তব্যের প্রান্তটীকায় সংশ্লিষ্ট আয়াত উল্লেখ করেছেন অথবা ঐসব ইশারা-ইংগিতের ব্যাখ্যা করেছেন যা আয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইকবাল তাঁর প্রচারিত চিন্তা দর্শনের ভিত্তি হিসেবে আল-কোরআনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ছিলেন অটল। ফলে, কবিতা ও গদ্য রচনার উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর চিন্তাধারা কোরআনের আয়াতের তাৎপর্যের চৌহদ্দি কোন অবস্থায়ই ডিংগিয়ে যায়নি। তাই এটা নিশ্চিন্তে বলা যায়, তিনি স্বকপোল-কল্পিত কোন চিন্তাদর্শ অথবা ভিন্ন কোন আক্বিদা-বিশ্বাসের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত ছিলেন।

তাওহীদ ও রিসালাতের মৌলিক আক্বিদা ছাড়াও সমাজ ও ব্যক্তির জন্যে দ্বীন যেসব বিধি-বিধান দিয়ে থাকে, যেমন--ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, ইবাদাত, স্বাধীনতা স্পৃহা, ঐক্য ও একতা এবং একটি জাতি হবার চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি উপাদানে ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তাঁর সব কিছুকে আল্লামা ইকবাল নিরেট ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেই সেসবের প্রচার করেন। দ্বীনের পরিমন্ডলের বাইরের কোন বক্তব্য তিনি পেশ করেননি। স্বীয় বাণীর প্রচার-প্রসারের জন্যে তিনি কোরআনের আয়াত অথবা হাদীসের উল্লেখ করেছেন অকুন্ঠভাবে। যে সব ক্ষেত্রে আয়াত অথবা হাদীসের অংশবিশেষ তিনি বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে পাদটীকায় পুরো অংশই উদ্ধৃত করেছেন। এতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোরআন ও হাদীসের ওপর তাঁর দৃষ্টি কতো গভীর ও ঘনিষ্ঠ ছিলো বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনাকারীর মধ্য থেকেও তিনি যথাযথ ফায়দা অর্জন করতেন। রাসূলে করিম (সঃ)-এর অনেক পবিত্র বাণী তিনি এমনভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছেন যে, নিজের বক্তব্যের সাথে সে সবের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লিখনীর এক বিস্ময়কর ফসল তিনি উপহার দিয়েছেন। পায়ামে মাশরিকে তিনি নীচে (Nietzsche) সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখেন, যার একটি পংক্তি এরূপঃ

এই তো তৈরি করেছে
হারাম-এরই মতো বুত্‌খানা,
কেননা, এর অন্তর মুমেন হলেও
মস্তিষ্ক ছিলো এর কাফির। (পৃঃ ২০১)

আল্লামা পাদটীকায় পুনরায় একথার পুনরুল্লেখ করে নিজেই লিখেছেন যে, রাসূলে করিম (সঃ) এর এক পবিত্র বাণীকে ভিত্তি করেই কবিতাটি রচনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে এইঃ

"নীচে (Nietzsche) ঈসায়ী নৈতিক দর্শনের ওপর তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এই ব্যক্তির মস্তিষ্ক এ জন্যেই কাফির যে, তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন না। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাঁর চিন্তাদর্শন ইসলামী জীবন-দর্শনের খুব নিকটতর ছিলো। "তাঁর অন্তর মুমিন, কিন্তু মস্তিষ্ক ছিলো কাফির।' নবী করিম (সঃ) এ ধরনের মন্তব্যই আরবী কবি উমাইয়্যা ইবনে ছালত সম্পর্কে করেছেন, "কণ্ঠে ঈমানের স্বীকৃতি থাকলেও তার অন্তর মূলতঃ কুফুরির লালনক্ষেত্র।"

ইলমে হাদীসের প্রতি আল্লামার গভীর অনুরাগ এবং দৃঢ় প্রত্যয় সম্পর্কে মাওলানা মওদুদী (রাঃ) ১৯৩৮

সালে এভাবে মূল্যায়ন করেনঃ

"একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর (ইকবাল) সামনে অতি বিস্ময়করভাবে ঐ হাদীসখানা সম্পর্কে উল্লেখ করেন, যাতে এই বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলে করিম (সঃ) তিনজন সাহাবীর সাথে ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করছিলেন। এ সময় ওহোদ পাহাড় কাঁপতে লাগলো। রাসূল (সঃ) পাহাড়কে নির্দেশ দিলেনঃ স্থির হয়ে যাও। তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ আরোহণ করেছেন। একথা শুনেই পাহাড় থেমে গেল।" হাদীসখানা শুনেই ইকবাল বললেনঃ এতে আশ্চর্য হবার এমন কি আছে। আমি একে রূপক বা অবাস্তব কিছু মনে করছি না; বরং, একে নিরেট বাস্তব বলেই মনে করছি। এ ঘটনাকে মেনে নেয়ার জন্যে আমার কোন ব্যাখ্যা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তোমার কাছে মহাসত্যের সন্ধান যদি থাকতো, তাহলে তুমি বুঝতে পারতে কিভাবে একজন নবীর পবিত্র পায়ের নীচে এসে বড় বড় পাহাড়ের চূড়ো প্রকম্পিত হয়ে যেতো। এ কম্পন রূপক কম্পনই নয়, বাস্তব ঘটনা।"

প্রসঙ্গত এখানে এক ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটনেরও প্রয়োজন রয়েছে। আল্লামার ব্যাপারে তাঁর তথাকথিত গুণগ্রাহী অথবা বিরোধীরাও এই মন্তব্য করেনঃ তিনি আসলে আক্বিদার ক্ষেত্রেই মুসলমান ছিলেন। তাঁদের এই মন্তব্য নিতান্তই ভিত্তিহীন এবং সত্যের অপলাপ বই কিছু নয়। এ প্রসংগে মাওলানা মওদুদীর একটি বিবৃতির উল্লেখ করছিঃ

"ইকবাল সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণার বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে যে, তিনি শুধু আক্বিদার দিক থেকেই মুসলমান ছিলেন। আমলের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। এই ভুল ধারণা সৃষ্টির পেছনে তাঁর প্রকৃতিগত কিছু উপাদানও দায়ী। এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে ছিদ্রান্বেষীদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। আর ইকবাল নিজের বিরূপ সমালোচনায় তৃপ্তি পেতেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি আমল–বিমুখ ছিলেন না। কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে ছিলো তাঁর গভীর অনুরাগ। ফজরের সময় সুললিত কণ্ঠে তিনি তেলাওয়াতে পাকে নিবিষ্ট হয়ে যেতেন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তেলাওয়াতের সময় অবিরত কান্নার ভারে তাঁর হিচ্‌কি বন্ধ হয়ে যেতো, তিনি পড়ায় আর এগুতে পারতেন না। নামাজ পড়তেন তিনি গভীর খুশু খুজুর সাথে। নীরব পরিবেশে। কিন্তু সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ ছিলঃ "আমি কথারই গাজী"। মুজাল্লা–এ জওহারঃ ইকবাল সংখ্যা, জামেয়া–এ মিল্লিয়া, দিল্লী–১৯৩৮। কোরআন মজীদ ও হাদীসে রাসূল–এর সাথে আল্লামার গভীর ভালবাসার প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের মধ্যেও প্রতিভাত। শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে কাইয়েম আল জাওজী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইসলামী তাসাউফ্–এ লিখেছেনঃ

"তুমি যদি তোমার অতীত জীবন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা কর, তাহলে তোমার স্মৃতিপটে এটা ভেসে উঠবে, তোমার আত্মীয়–স্বজন তোমাকে দ্বীন ও দুনিয়ার কত বিষয় থেকে নিস্পৃহ করেছে। আর তোমার পরকালীন অনন্ত জীবন পথের সোপানগুলো অতিক্রম করার ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারাকে কতভাবে তারা ব্যাহত করেছে। একনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, আত্মোৎসর্গী ও অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরম

আত্মীয়তার দাবী নিয়েই তো তারা পথে আড় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু খোদার কসম ! এদের এ দাবী প্রদর্শনী বৈ কিছু নয়।

আল–কোরআনের ঘোষণাঃ

"হে মোমিনগণ তোমাদের মাল–সম্পদ, তোমাদের সন্তান–সন্ততি––যাতে তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে না দেয়। আর যারাই এ কাজ করবে, তারাই হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।" লক্ষ্য করুন, কত চমৎকারভাবে এই বিস্তারিত আলোচনাকে আল্লামা ইকবাল কবিতার দু'টি পংক্তিতে প্রকাশ করেছেনঃ

'ধন–সম্পদ দুনিয়ার, বন্ধন–সম্পর্ক আত্মীয়তার
স্পষ্ট করে দেয়–সব কিছু ধারণা
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর।'

কোরআন পাক ও হাদীসের সাথে গভীর সম্পর্ক এবং জ্ঞান ও হেদায়েতের এ দুটো মূল উৎসকে নিজের জাতীয় চিন্তা–চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে নেবার পর আল্লামা ইকবাল যে বিষয়টির মাধ্যমে তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে তাঁর 'খুদী দর্শন'। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অবহিতি ছিল না যে, আল্লামার চিন্তা–উপলব্ধির বিপ্লবী দর্শনের ভিত্তিও কোরআনের একটি আয়াত। এ সম্পর্কে তিনি নিজে প্রফেসর সলীম চিশ্‌তীকে বলেনঃ এর ভিত্তি হচ্ছে সূরা আল মায়িদার ১০৫ নম্বর আয়াতঃ

"হে মোমিনগণ! আপন খুদীর (সত্তার) হেফাজত করা তোমাদের নিজেদেরই অপরিহার্য দায়িত্ব। তোমরা নিজেরা যদি হেদায়েতের ওপর থাক, তাহলে ওসব লোক তোমাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না–যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কাজ করছিলে।"

অর্থাৎ, খুদীর যথাযথ সংরক্ষণের শিক্ষা এই আয়াতে দেয়া হয়েছে। আর আল্লামার জন্যে এটাই স্পষ্ট ইলহামের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এ আয়াতে এই বক্তব্য স্পষ্টঃ মানুষের ভেবে দেখা উচিত কোন্ ধরনের জীবন–আচরণ সে অবলম্বন করেছে। আত্ম–বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার, খোদা ও বান্দার যেসব অধিকার তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে, সেসব অধিকার সে যথাযথভাবে আদায় করছে কি, করছে না। ভেবে দেখা দরকার, সে কি সরল সঠিক পথ ধরে চলছে, সেকি ন্যায়–ইনসাফের আচরণ করছে? আর এতে 'আমর বিল্ মারূফ ওয়া নেহিয়া আনীল মুনকার–অর্থাৎ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের অপরিহার্য বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। উদ্ধৃত আয়াতের লক্ষ্য কিন্তু এটা নয়, অপরের সংশোধনের সব চেষ্টা প্রচেষ্টা ছেড়ে শুধু নিজের মুক্তি চিন্তা নিয়েই স্বার্থপরের মতো নিবিষ্ট হয়ে থাক। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এই ভুল ধারণার অপনোদন করে এক বক্তৃতায় বলেনঃ

"দ্বীনী ভাইয়েরা সাবধান! তোমরা এই আয়াতটি পড়ছ, কিন্তু এর অর্থ করছ ভুল। আমি রাসূলে আকরাম (সাঃ)–কে এটা বলতে শুনেছি যে, মানুষের অবস্থা যখন এমন স্তরে পৌঁছবে–সে চোখের সামনে অন্যায় অনুষ্ঠিত হতে দেখেও তা প্রতিরোধের চেষ্টা করবে না, অত্যাচারীকে দেখবে অত্যাচার করতে, কিন্তু তাকে প্রতিহত করবে না। এ অবস্থায় সেই আশংকা দূরে নয়, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক চরম আজাব সবাইকে ঘিরে নেবে। তাই খোদার কসম করে বলছি, তোমাদের ওপর এটা অপরিহার্য, তোমরা সুকৃতির নির্দেশ দাও, দুষ্কৃতি–অন্যায় থেকে মানুষকে বিরত রাখো। না হয় আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন সব লোকদের শাসন চাপিয়ে দেবেন, যারা তোমাদের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্টতম। এরা তোমাদের ওপর কঠিন জুলম–নির্যাতন চালাবে। এই অবস্থায় তোমাদের মধ্যেকার ন্যায়–নিষ্ঠ লোকরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, কিন্তু তাঁদের কোন দোয়া কবুল করা হবে না।"

আল্লামা ইকবালের আসরার–এ খুদী ও রমুজ–এ–বেখুদী, উভয় কাব্য গ্রন্থের সামগ্রিক কাঠামো ও রূপরেখা আল–কোরআনের আলোচিত আয়াতের মর্মবাণীরই প্রতিচ্ছবি।

শেখ মোহাম্মাদ বিন আবি তালিব মক্কী –(মৃত্যুঃ ৩৮৩ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কুওয়াতুল কুলুব' (আত্মার শক্তি) নামক গ্রন্থে বলেনঃ

"যখন তুমি কোন বিষয় জানার জন্যে ওলামার শরণাপন্ন হবে, তখন এই পদ্ধতিতে প্রশ্ন করবেঃ এই বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্ধারিত বিধান কি? অথবা এ ব্যাপারে সাহাবা–এ কেরামের হুকুম কি ছিলো? আলেম সে আলোকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলে তো তোমার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেলো। কিন্তু তিনি আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)–এর নির্দেশ –এর সূত্র উল্লেখ না করে যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমামদের মধ্যেকার মতভেদ এবং তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন, তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে এ বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)–এর নির্দেশাবলী সম্পর্কে তাঁর জানা নেই। এ অবস্থায় তোমার সেই স্থান ত্যাগ করে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)–এর নির্দেশাবলী সম্পর্কে জানেন––এমন ব্যক্তিত্বেরই শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এতে করেই আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)–এর নির্দেশ মত কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে। (আওয়ারাদুল আহইয়াব ওয়া নুসুসুল আদবঃ আবুল মাখের ইয়াহইয়া বাখেরজী, পৃঃ ২–৪৪)।

জাতীয় চিন্তা–দর্শনের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের ব্যাপারে আল্লামা ইকবালের টেকনিক হচ্ছে তিনি কোন বিষয়েই আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) নির্দেশনার চৌহদ্দি ডিংগিয়ে কখনও সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। প্রসংগত এটা স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে, ইকবাল চর্চাকারীদের কেউ কেউ– অথবা তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন এমন ব্যক্তিও নিছক ব্যক্তিগত ধারণার ভিত্তিতে অথবা গল্প উপাখ্যান তৈরীর জন্যে আল্লামাকে কেন্দ্র করে এমনসব কিংবদন্তীর আশ্রয় নিয়েছেন, যে সবের সাথে না ইকবালের চিন্তার সাযুজ্য রয়েছে, না মিল রয়েছে তাঁর কোন জীবনাচরণের।

আবদুস্ সাত্তার

॥ সৌন্দর্যের মর্মকথা ॥

সৌন্দর্য করেছে প্রশ্ন মহান খোদাকে একদিনঃ
আমাকে করনি কেন চিরঞ্জীব তোমার জগতে?

উত্তরে বলেছে খোদাঃ এ–পৃথিবী, দৃশ্যপট আর
সমস্ত কিছুই এর মৃত্যুময়; রাতের কাহিনী
এবং এখানে দ্যাখো প্রকৃতি সমস্ত কাজ করে
গতিশীল কালের নিয়মে।
সুন্দরের মর্ম সে–ই –যা নাকি বিলয় হতে জানে।

নিকটে দাঁড়ানো চাঁদ শুনেছিল এই সব কথা
এবং কথারা সব পাখা মেলে আকাশের দিকে
প্রভাত তারার কাছে পৌছে গেল নির্বিঘ্নে তখন।

সকাল তা জেনে নিয়ে প্রভাত–তারার কাছ থেকে
বললো শিশিরে ডেকে; এমন কি পরিচিত মাটি
শিশির বিন্দুর কাছে শুনে নিলো স্বগীয়– সে বাণী।
শিশিরের কথা শুনে ফুল তার আঁখি ভরে নিলো–
যন্ত্রণায় কেঁপেছিল ছোট ছোট কুঁড়ির হৃদয়
সুন্দর বাগান থেকে কেঁদে গেলো বসন্ত একাকী–
যে–যৌবন এসেছিল একদিন বেড়াতে সেখানে
চলে গেল দুঃখের পা ফেলে।

ফারুক মাহমুদ

।। গণতন্ত্র ।।

যদিও এসব গোপন বারতা বলবে না কোন দানেশমন্দ্,
ফিরিঙ্গী এক বে-খেয়ালভাবে ফাঁস করে দেয় অকস্মাৎঃ
গণতন্ত্র কি জানতে পেরেছো? এক ধরনের সে হুকুমত্,
মানুষের সেথা শুধু গোণা হয়, হয় না ভুলেও করা ওজন।

।। ইসলাম ।।

ইসলামের রুহ হলো অগ্নি আর আলোক খুদীর;
আর সে খুদীর অগ্নি অস্তিত্ব ও আলো জিন্দেগীর।
যদিও প্রকৃতি আজো রেখেছে গোপন এ-বারতা,
তবুও এটাই সব বস্তুর আদি ও ইতিকথা।
ইউরোপ বিরক্ত হলে হোক শুনে ইসলামের নাম,
সঙ্কটে স্ব-নির্ভরতা, এইতো সে রুহুর পয়গাম।

।। আসমান ও জমিন ।।

তুমি যাকে মনে করো মধুগন্ধা বাসন্তী প্রহর,
অন্যের দৃষ্টিতে সেটা হতে পারে ভাদ্রের দুপুর।
সর্বত্রই পরিশার্শ্বে মূর্ত পরিবর্তনের সূর;
কি কায়দা, হে সালেক ভালোমন্দ ভেবে' অতঃপর!
তুমি যাকে মনে করো, নীলিম খিলান আকাশের;
জমিন তা' হতে পারে অন্য কারো দুনিয়াতে ফের!

।। তকদীর ।।

অপদার্থ ব্যক্তিরাও অধিকারী হয় শক্তি আর ক্ষমতার,
এবং প্রতিভাবান গুণীরাও মাঝে মাঝে বেইজ্জত হন;
তবুও এদের মাঝে হয়তো রয়েছে কোন যুক্তি ক্ষুরধার।
যদিও বা মনে হয়, তক্‌দীর মানে না কোন যুক্তির বন্ধন!
পৃথিবীতে মানুষের উত্থান ও পতনের দীর্ঘ ইতিকথা
আমাদের দৃষ্টি হতে এই সত্য কথাটি তো রাখেনি গোপন,
কর্মধারা পানে সব কওমের-
নিয়ে তন্দ্রাহীন সতকর্তা-
তক্‌দীর তাকিয়ে আছে সুতীক্ষ্ণ দ'ধারী মুক্ত
অসির মতন। [যরব্-ই-কলীম]

ইকবাল-প্রসঙ্গ

ফররুখ আহমদ

[ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পেঁটরায় বন্ধ রেখে যখন রাজনৈতিক চালের কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে ঐ দু'টি বিষয়ের নাম ব্যবহার করা হয় তখন জাতি অবনতির যে স্পর্শ অনুভব করে সে স্পর্শ আত্মঘাতী। সংক্রামক ব্যাধির মত। সেই মৃত্যুর ছোঁয়াচ জাতিকে বিকলাঙ্গ করে ফেলে। সম্প্রতি আমরা এসে পড়েছি সেই সংকটের সামনে যখন দ্বীন ও তমদ্দুনের কথা সর্বদাই উচ্চারিত হতে শুনছি আমাদের রাজনৈতিক ঝান্ডাবাহীদের মুখে, কিন্তু প্রতিক্ষণেই অনুভব করছি ঐ দু'টি অস্ত্রে নেতৃস্থানীয়দের বৈষয়িক সুযোগ সন্ধান। দুঃখের বিষয় এই যে, ছাত্র ও সুধী সমাজও এই সুবিধাজনক রাজনৈতিক ঐকতানে নিজেদের কণ্ঠ ডুবিয়ে জাতির তমদ্দুনের সমাধি রচনা করতে দ্বিধাবোধ করছেন না। ফলে, মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সাহচর্য্য থেকে ক্রমাগত আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। এই অবহেলার ফলে নিকট ও সুদূর অতীতের চিন্তাধারার কোন সন্ধানই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং সে দিনও যিনি আমাদের মধ্যে সশরীরে বেঁচে ছিলেন প্রাচ্য ভূখন্ডের সেই শ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা ইকবালের প্রতিভার ও আদর্শের কথা যেন আজ আমরাভুলতেবসেছি।

বিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও তামদ্দুনিক কবি হিসাবে সকল দিগন্তবাসীর অভিনন্দন পেলেও আল্লামা ইকবালের কবিতা– দুয়েকটি জনপ্রিয় (এবং নিম্ন স্তরের) কবিতা ছাড়া বাংলা ভাষায় ইকবালের বিশাল কাব্য–ভান্ডার পাঠক সাধারণের কাছে এক রকম অবরুদ্ধ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। সম্প্রতি কয়েকজন উৎসাহী কবি ও সাহিত্যিকের দৃষ্টি ইকবালের কাব্য–সাহিত্য ও তাঁর অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁদের এই উৎসাহ প্রশংসাজনক হলেও ইকবালের যে বিশাল কাব্য–সম্পদ শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অনধিগম্য হয়ে রয়েছে সেই অপরিচিত মঞ্জুষার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় নিবিড়তরো করাতে হ'লে মুসলিম লেখক সম্প্রদায়কে এদিকে আরো অনেক বেশী মনোযোগী হতে হবে।

ইকবালের কবিতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে– পৃথিবীর কাব্য–ভান্ডারে ইকবাল যে বিশিষ্ট জাগরণের বাণী বয়ে এনেছেন তা সকল দেশ ও সকল কালের উপযোগী হলেও আদর্শচ্যুত, পরাধীন মুসলমান সমাজের জন্যই তার প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশী। একথা অনস্বীকার্য যে, ইকবালের বিপ্লবী–চিন্তার অগ্নি–স্ফুলিংগেই ভারতীয় মুসলিমের মনে আযাদীর স্বপ্ন–বহ্নি মেঘের মত পক্ষ বিস্তার করেছে। আমাদের রাজনৈতিক ঝান্ডাবাহীর

দল প্রয়োজন মত ভুলে গেলেও লেখক সম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে একথা। বক্ষমান প্রবন্ধে আল্লামা ইকবালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'আসরার–ই–খুদী'র সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।]

'আসরার–ই–খুদী'র প্রকাশকাল স্মরণীয়; কারণ, বর্ষচক্রে গাণিতিক হিসাবের সংগে প্রতিভার আবির্ভাব সংযুক্ত না হলেও ইকবালের আত্মপ্রকাশ সময়ের দিক দিয়েও বিস্ময়কর। সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য তখন প্রয়োজ হয়ে পড়েছিল একজন শক্তিশালী নকীবের; কারণ, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সংকটের ঘূর্ণিচক্রে নিষ্ফল সংগ্রাম করে দুনিয়ার মুসলমান অবষণ্ন হয়ে পড়েছিল। পলাশী প্রান্তরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ভারতীয় মুসলিমের স্বাধীনতার পথে যে বাধা এনেছিল, ওহাবী আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহেও সেই জগদ্দল শিলা স্থানচ্যুত হয়নি। কয়েকজন কৌশলী নেতা বৃটিশের মনোরঞ্জন করে জাতির অস্তিত্ব কোন মতে বাঁচিয়ে রেখেছিলো; কিন্তু তাতে গোলামীর দৈন্যই ফুটে উঠেছিল মারাত্মকভাবে। আফগানিস্তান, পারস্য, আরব, মিসর ও তুরস্ক তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রেতনৃত্যে মুখরিত।

উনিশ শতকের প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন মুসলিম প্রধান দেশগুলিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়নি। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত তিনি যে প্রাণ–বন্যার সঞ্চার করেছিলেন, উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁর দেহাবসানের পর ইকবাল এলেন তাঁরই উত্তরাধিকারী হয়ে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শনে সমান অভিজ্ঞ আল্লামা ইকবাল প্রচার করলেন মূল ইসলামের প্রাণ–বাণী।

দাস মনোভাবাপন্ন স্থবির জাতি একদিন বিস্ময়ে শুনলো স্বাধীন জীবনের প্রবহমান সংগীতঃ

দুর্বার তরংগ এক বয়ে গেল তীর তীব্র বেগে
বলে গেলঃ আমি আছি যে মুহূর্তে আমি গতিমান
যখনি হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই।

ইকবাল তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন আমিত্বের দিকে। মূল ইসলামী ভাবধারায় তিনি ব্যাখ্যা করলেন সত্তার রহস্য। কারণ, ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তি–সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশেই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে এবং এই পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিহিত আছে।

যদিও কণিকা আমি তবু জানি খরপ্রভা সূর্য সে আমারি,
শত প্রভাতের বহ্নি সংগোপন মোর বক্ষ মাঝে,
জামশীদের পাত্র হতে উজ্জ্বল আমার ধূলি জানে সেই নাম
জন্ম যে নেয়নি আজও ধূলিম্লান ধরিত্রীর বুকে,

হরিয়া এনেছে মোর চিন্তাধারা সেই হরিণীকে
বাহিরে আসেনি ছুটে যে আজিও অনস্তিত্ব অন্ধকার হ'তে।

আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মতবাদ ইকবাল গ্রহণ করেছিলেন মূল কোরান থেকে, ইরানী কবিদের বিশিষ্ট ভংগিতে প্রকাশ করেছেন তিনি সেই মতবাদ।

অস্তিত্বে রূপ সেতো আত্মার অলংঘ পরিণাম
যা কিছু সম্মুখে জাগে সবই জেনো রহস্য আত্মার
চেতনার দীপ্তি নিয়ে সে যখন তাকায় সম্মুখে
জাগায় চিন্তার বিশ্ব নিবিড় নির্যাসে যার
সংগোপন আছে বিশ্ব শত

বেখুদীর রূপ সেই মুক্ত করে প্রকাশের দীপ্ত দিবালোক।
জানি জানি এই আত্মা ধরিত্রীর বুকে রাখে বৈষম্যের বীজ
নিজেকে সে অন্যরূপে করে অনুভব,
আপনার রূপ নিয়ে গড়ে যায় অপরের রূপ,
প্রকাশের মুক্ত ছন্দে গড়ে তোলে আনন্দ দন্দ্বের।
তার হত্যামূলে শুধু আপনার শক্তি অনুভব
আত্মপ্রবঞ্চনা তার জীবন রওগন
রক্তধারে স্নান করি বেঁচে ওঠে গোলাবের মত।

শতেক গোলাব বন ধ্বংস করে ফোটাতে সে একটি গোলাব
একটি সুরের লাগি সৃষ্টি করে শত আর্তনাদ,
এক আকাশের লাগি, প্রকাশ করে সে শত চাঁদ,
একটি বাণীর তরে সৃষ্টি করে কথা অফুরান।

জানি এই নিষ্ঠুরতা অপব্যয় তার
পূর্ণ করে সৌন্দর্য আত্মার;
ফরহাদের তিক্ত ব্যথা মেনে নেয় সৌন্দর্য শিরায়;
এক মৃগনাভি মানে মৃত্যু শত কস্তুরী মৃগীর;
লেলিহ আতশে ধ্বংস পতংগের সেই তকদীর;
উজ্জ্বল চেরাগ জানি সে যন্ত্রণা করে সমর্থন।

আত্মবিকাশের জন্য যে সংগ্রাম-ইকবাল সমর্থন করেছেন সব সময়, কারণ তাঁর আদর্শ পুরুষ কখনো প্রগতি- বিরোধী বা প্রতিক্রিয়াশীল নন। নিখিল মানব সমাজের জন্য যে পুরুষ অথবা প্রকৃত মুসলিমের অভ্যুদয়, ইকবালের মানস চক্ষে আমরা দেখেছি সেই পুরুষরূপ। সেই

পুরুষের আদর্শেই ইকবাল গড়তে চেয়েছেন বর্তমান সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে। ধর্ম বলতে ইকবাল বুঝেছেন মূল ইসলামকে।

'আল্লার গুণরাজিতে সমৃদ্ধ হও' –এই হাদীসের উপর ইকবালের সম্পূর্ণ সত্তা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করছে বলা যেতে পারে। কারণ, উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ইকবাল বুঝতে পেরেছিলেন যে, ক্ষুদ্রতম সত্তার পক্ষেও কামালিয়াত বা পরিপূর্ণতা লাভ করা আদৌ অসম্ভব নয়। পরিপূর্ণতার পথে ইকবাল সর্বদা প্রবহমান জীবনের কল্পনা করেছেন। অবশ্য তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত। প্রবহমান জীবন ধারার সংগে যখন সম্প্রসারণশীলতা সংযুক্ত হয়, তখনই মুক্ত হয় পূর্ণতার পথ। এই পথে প্রয়োজন আছে সত্যিকারের পথ–প্রদর্শকের অথবা তাঁর ব্যাখ্যাতার। রাসূলুল্লাহ (সঃ)–কে প্রকৃত পথ–প্রদর্শক এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও ফকীরদিগকে রাসূলুল্লার বাণী ও জীবনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে ইকবাল গ্রহণ করেছেন। পীর হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত সাধক ও মহাকবি জালাল উদ্দীন রুমীকে। আসরার–ই–খুদীর 'পূর্বাশা'য় ইকবালের বর্ণনা পাওয়া যায় পীর–ই–রুম সম্পর্কেঃ

রুমীর প্রতিভা–দীপ্তি উজ্জীবিত করেছে আমারে
রহস্যের গ্রন্থ হতে আমি গেয়ে যাই গান
আত্মা তাঁর অগ্নিকুন্ড শাশ্বত, প্রোজ্জ্বল
আমি শুধু ক্ষণপ্রভা অগ্নিকণা এক।
মোর পতঙ্গেরে গ্রাস করিয়াছে তাঁর অগ্নিশিখা,
আমার পেয়ালা পূর্ণ করিয়াছে কানায় কানায়।
স্বর্ণ মহিমায় মোর মৃত্তিকারে ফেরায়েছে রুমী;
প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ড করেছে সে মোর বিভূতিরে।
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, বিভা কেড়ে নিতে বালুকণা
উঠে এল মরুভূমি হ'তে।
পথিক তরঙ্গ আমি তাঁর সমুদ্রের বুকে
ফিরে আসি বিশ্রাম আশায়।

ইসলামের শক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ

ক্ষুদ্র এক পরমাণু করেছিল সে কভু বপন
পরিপূর্ণ সূর্য এক তুলে নিয়ে গেল অবশেষে।

এই ইসলামকেই ইকবাল চিরন্তন ধর্মের মর্যাদা দিয়েছেন, ইকবালের কাছে ইসলামের সম্ভাবনা অপরিসীম। দার্শনিক কবি ঘোষণা করেছেনঃ

দেখিয়াছি আকাশের গতিমান স্নায়ুর স্পন্দন,
চাঁদের শিরায় আমি দেখেছি শোনিত বহমান,
এ জীবন রহস্যের যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে দিতে,

প্রকৃতির জ্ঞানাগারে জেনে নিতে জীবন কৌশল,
ক্রন্দন করেছি আমি কত রাত্রি মানুষের লাগি।
নিরন্ধ্র তিমির বক্ষে ছড়ায়েছি চাঁদের সুষমা।
ভক্তি নত আমি শুধু এক সত্য ধর্মের নিকট
পরিচয় আছে যার পর্বত প্রান্তরে;
আমার সুরের বহ্নি জ্বালায়ে যায় যে নিত্য
মানুষেরহৃদয়েরমাঝে।

আত্ম–সংরক্ষণ অথবা আত্মার পরিপূর্ণতার জন্য মূল ইসলামের প্রয়োজনীয়তা তিনি ঘোষণা করেছেন। আজীবন তাঁর কাব্যের বিশাল অংশ ইসলাম ও আত্মা সম্পর্কে মুখরিত, যে আত্মা ইসলামের বিধান মেনে ইশ্‌ক্ বা প্রেমে সংরক্ষিত হয়– সেই প্রেমিক মুসলমানের মধ্যে ইকবাল দেখেছেন ইনসান–ই–কামেল বা পূর্ণমানবের প্রতিশ্রুতি। 'আসরার–ই–খুদী'র বহুস্থানে আলোচনা করা হয়েছে ইনসান–ই–কামেল সম্পর্কে। ইনসান–ই–কামেল ও ইশ্‌ক্ সম্পর্কেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে পারব নিম্নোদ্ধৃত অধ্যায়ে। ফারসী কবিদের অনুসরণে ইকবাল একটি কাহিনীর মধ্যদিয়ে আশেক ও কামেল মুসলমানের নিখুঁত ছবি এঁকেছেনঃ

মুহব্বতের কুণ্ডতে যখন সত্তার পূর্ণতা।
শক্তি তাহার মুষ্ঠিতে আনে সসাগরা ধরাতল
তার কব্জিতে ঝলসিয়া ওঠে আল্লার দেওয়া বল
ধরা পড়ে তার মুষ্টিতে জল–স্থল।
ভাঙে রাত্রির নিদ
নির্দেশ তার মেনে চলে ভয়ে দরিয়ুস জামশীদ।
যাঁর কথা জানে তামাম হিন্দুস্তান;
জালালী ফকীর বু'আলী কলন্দর!
যাঁর পরশনে মরুভূমি হল জান্নাত সুন্দর
যাঁর কথা ফিরে নিয়ে এল বয়ে তাজা গোলাবের গান
তাঁর জীবনের একটি কাহিনী শোনাবো অতঃপরঃ
তামাম ভারতে মশহুর যিনি বু'আলী কলন্দর।
একদিন তাঁর ভক্ত মুরীদ বাজারের পথে একা
আন্‌মনে যেতে নেহারে প্রেমের সুগভীর রাঙা লেখা,
বাদশা'র প্রিয় ওমরা তখন ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে
চলেছিল সাথে লশকর চলে তার নির্দেশ ব'য়ে।
সম্মুখে যবে পড়িল তাদের ফকীর দীওয়ানা সেই

নকীব তখন ফুকারিয়া বলে এইঃ
বেহুঁশ পথিক পথ ছেড়ে চলো আমীর ওমরাহের।
দুনিয়ার হাল ছিল না সে ফকীরের,
আপনার ভাবে বিভোর হয়ে সে চলেছিল একমনে।
ওমরার এক উদ্ধত দাস নির্ভীক সেই ক্ষণে
তীব্র আঘাত হানিল তখন শিরে সেই ফকীরের।

ওমরার পথ ছাড়িয়া আহত ফকীর চলেন ফের।

কলন্দরের জলসায় আসি ফকীর পড়িল কাঁদি
গর্জে উঠিল নিমেষের মাঝে বু'আলী কলন্দর
জাগিয়া উঠিল আগুনের মত প্রশান্ত কন্দর
গলিত লাভার বন্যা ভাসাল সুষুপ্ত বন্দর।
মিসমার করি বজ্র যেমন পড়ে পর্বত চূড়ে
তেমনি আদেশ ধ্বনিয়া উঠিল কলন্দরের সূরে
বলিলঃ এখনি ফকীরের লিপি দাও শাহী দরবারে
দরবেশী এই পত্র পাঠাও গর্বিত বাদশারে–

" মোর খাদিমেরে মারিয়াছে তব ওমরা অকস্মাৎঃ
ঢেলেছে যে তার জীবনে তীব্র জ্বলন্ত হুতাশনঃ
এখনি বন্দী কর তুমি সেই ওমরা খবীস মনঃ
নতুবা অন্য জনারে দানিব তোমার সুলতানাত।"

আল্লাওয়ালা ওলির চিঠি গেলে বাদশাহ কাছে
থর থর করি কাঁপিয়া উঠিল বাদশা বিষম ডরে
সূর্য যেমন নিষ্প্রভ হয় রোশ্‌নি আসিলে ক্ষয়ে
বিবর্ণ হ'ল বাদশা তেমনি ফকীরের চিঠি পেয়ে।

হাতকড়ি এক পাঠালো তখনি সেই ওমরার তরে
কলন্দরের কাছে মাপ চায় বাদশা বিষম ডরে।
বু'আলির কাছে দূত হয়ে এল আমীর খসরু কবি
যার কাব্যের মাধুরি জাগাতো জোছনা রাতের ছবি
যার সুরজাল জাগিত গভীর মৌলিক মন হ'তে
ভেসে যেত এই হিন্দের বুক সে সুর ধারার স্রোতে....

তার সংগীতে বু'আলির মন গলিল কাঁচের মত
কাব্য–সুষমা রাখিল সেবার বাদশাহী অক্ষত।

পাহাড়ের মত সাম্রাজ্য সে, তবু
বেঁচে গেল শুধু কাব্যের সরণিতে
আহত কোরো না ফকীরের দিল কভু
ফেলোনানিজেকেজ্বলন্তবহ্নিতে।

আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে ইকবালের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট তার দৃষ্টান্ত আমরা ভালোভাবেই পাই উদ্ধৃত কবিতার প্রথম দিকের কয়েকটি চরণে। নির্বাণ অথবা আত্মবিলোপের থিওরিকে ইকবাল বরাবর উপেক্ষা করেছেন এবং সমানভাবে ঘৃণা করেছেন ভন্ডামিকে। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ফকীরের মত আড়ম্বরশূন্য ছিলেন; কিন্তু শক্তিমান ছিল তাঁর মন–একটি নির্জীব জাতিকে দাসসুলভ নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের পঙ্ককুন্ড থেকে টেনে তোলার মত বলিষ্ঠ নির্ভীক মন।
ইকবালের সমাজ সচেতনতা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ব্যক্তি–সত্তার পূর্ণতার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেনতাসমাজবোধেরই পরিচায়ক।

কারণঃ

পীর আমাদের তাকায়ে বৌদ্ধ দিকে
ফতোয়া ব্যবসা ধরেছে মুফতী ব্যবসাদারীর টানে
এর পরে কোন পথ নেব বেছে
পীর আমাদের মুখ ফেরায়েছে শারাবখানার পানে।

জাতির এই দুর্দিনে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না। তাই কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ব্যক্তি ও সমাজকে তিনি দিয়েছেন সঠিক পথের নির্দেশ। কীটসীয় এস্কেপিজমস তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি, প্লেটোর দর্শন এবং ভারতীয় বৈরাগ্যের সুরকেও তিনি উপেক্ষা করেছেন। তাঁর মনের পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে আমাদের উঠতে হবে তাঁর মননের উচ্চস্তরে যেখানে Iqbal stands on a hill by himself (Dr. R. A. Nicholson) আর যেখানে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

ধূলিকণা তুলে নেয় সাত সেতারার মাঝে
বারি বিন্দু স্ফীত হয় সমুদ্রের মত
রোজ হাশরের মত্ত কোলাহল মাঝে আনে প্রগাঢ় স্তব্ধতা
তিতিরের পদযুগল রাঙায় সে ঈগল শোনিতে।...

সেই শব্দ ও নৈঃশব্দের রাজ্যে, সেই জ্ঞান ও অনুভূতির উচ্চ শিখরে।

রেনেসাঁ আন্দোলনঃ নজরুল-ইকবালেরপ্রভাব

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্যাহ

উপমহাদেশ বিভাগের আগেই (সাবেক) পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যারা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মপ্রচেষ্টায় দিশারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তারা শুধু এ আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমিকা এবং ঐতিহাসিক ফলশ্রুতিই তুলে ধরেননি, অধিকন্তু তারা উপমহাদেশের সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও প্রেক্ষাপটের পটভূমিতে এ সত্যও তুলে ধরতে চেয়েছেন যে, এ উপমহাদেশের হিন্দু, মুসলিম জনসম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং রূপ–পার্থক্যই স্বাতন্ত্র্যধর্মী রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, বস্তুতপক্ষে এ আন্দোলন দুই জনগোষ্ঠীর মনোবিকাশের ঐতিহাসিক ধারারই ফলশ্রুতি। বিশেষতঃ যারা তদানীন্তন পাকিস্তান আন্দোলন কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, তারা রাজনৈতিক ইতিহাসের চেয়েও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এবং এর স্বাতন্ত্র্যধর্মী সংগঠন ও পরিণতির দিকেই বিশেষভাবে অঙ্গুলি সংকেত করেছিলেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সাবেক পাকিস্তান আন্দোলনে উপমহাদেশের হিন্দু–মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপকে নিপুণভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল। ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে কেন্দ্র করে এই দুই সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের যে মনোবিকাশের ধারা গড়ে উঠেছে তার স্বাতন্ত্র্যধর্মিতার ঐতিহাসিক সত্যও দক্ষতার সাথে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন বুদ্ধিজীবীরা।

অবশ্য তারা রাজনৈতিক বক্তব্য সূত্রে সাংস্কৃতিক রূপরেখা তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু মুসলিম বাংলার সংস্কৃতিসেবীদের কাছে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে ইকবালের আবেদন ছিল অধিকতর প্রত্যক্ষ। বিশেষ করে, তদানীন্তন পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে যারা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছিলেন এবং শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা ও স্বস্থতা ফিরিয়ে আনার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তারা ইকবালের আদর্শকেই আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য আলিগড় আন্দোলন কিম্বা তারও পূর্ববতী বিভিন্নধর্মী মুসলিম জাগরণ আন্দোলনের ফলশ্রুতি যে একই উৎসে এসে মিলিত হয়েছিল তাও অনস্বীকার্য। উপমহাদেশে মুসলিম পূনর্জাগরণ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার করে দেখলে এবং এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলশ্রুতি পর্যালোচনা করলে এ সত্যিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, অবশ্য স্মরণযোগ্য যে। উপমহাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন হলেও এর চারিত্র্যলক্ষণ এক কিংবা অভিন্ন ছিল না।

ওহাবী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন কিংবা অসহযোগ আন্দোলন এর যে কোনটির চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বিচার করে দেখলে স্বাতন্ত্র্য কিংবা রূপপার্থকের স্বরূপ উদঘাটিত হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যে, সব কয়টি আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল উপমহাদেশে মুসলিম পূনর্জাগরণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং পরিণামে স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া। ধর্মীয় পুনর্জাগরণকে যারা অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তারা যেমন সে পথেই স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করতে চেয়েছেন, তেমনি যারা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের সত্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন তারাও সে পথেই স্বাধীনতার সাধনা করেছেন। তবে সময়ের পরিবর্তনে এবং স্ব-সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের মনোবিকাশের ধারার রূপ পার্থক্যের ফলে গুরুত্ব আরোপের স্বরূপ বদলেছে মাত্র। উদাহরণতঃ বলা যেতে পারে যে, ওহাবী আন্দোলনের মূলে বিশুদ্ধ ইসলামে ফিরে যাবার প্রেরণা যতখানি কার্যকর ছিল, পরবতী আন্দোলনসমূহে যে প্রেরণা তত খানি কার্যকর ছিল না, ওহাবী আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে অবশ্যই নিবেদিত ছিল, তবে তার মূল প্রেরণা উৎস ছিল ধর্মীয়। পরবর্তীকালের মুসলিম জাগরণ আন্দোলনে ধর্মীয় আদর্শের প্রেরণা এতখানি স্পষ্ট ছিল না; বরং, সে সব আন্দোলনে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের কথাই বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীরা অন্ততঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বাণীকেই তুলে ধরতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এ আন্দোলন ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষভাবে দানা বেঁধে ওঠে। দ্বিজাতিতত্ত্ব ফর্মুলা এবং ইকবালের ইসলামী ও মুসলিম সাংস্কৃতিক বিষয়ক চিন্তাধারা এবং সর্বোপরি তার তত্ত্ব এর মুলে বিশেষ অনুপ্রেরণা জোগায়। অবশ্য স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই বিশেষ পর্যায়ের মুসলিম জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের মূলে সুদীর্ঘকালের মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের ধারাও কম কার্যকর ছিল না। সব কিছুর যোগফলে এই পর্যায়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছিল।

মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের ধারাও কম কার্যকর ছিল না। সব কিছুর যোগফলে এই পর্যায়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে সে সময়ে বাংলাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও স্বাতন্ত্র্য বিশ্বাসী সাংস্কৃতিক কর্মীরা এতে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করেন। স্মরণযোগ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয়তাবাদী ধ্যান–ধারণা ও মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, বিভাগপূর্বকালে সাবেক পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তা অপেক্ষাকৃত স্থির প্রত্যয়ী রূপ পরিগ্রহ করে এবং শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা একটি বিশেষ ধারার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু বিষয়বস্তু ক্ষেত্রে নয়, কিংবা জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নয়, শিল্প সাহিত্যের প্রকাশ প্রকরণ এবং বাহ্যিক রূপান্তরণের মধ্যেও যাতে স্বকীয়তা ও স্বস্থতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেদিকেই এ–সময়ে শিল্পী–সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছিল। সে মুসলিম জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং জাতীয় জাগরণের বাণীকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মানস পরিচয়কে তুলে ধরার ব্রতচারণায় নজরুল ইসলাম তার সহজাত প্রেরণায় যে মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন তার পটভূমিতেই অধিকতর স্থির লক্ষ্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে সূচিত হয়েছিল' রেনেসাঁ আন্দোলন'। রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমি ও স্বরূপ এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের সাথে এর অন্বয় ধর্মিতা অনুসরণ ও অনুধাবনের জন্যই এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকারঅবতারণা।

ইতিপূর্বে রেনেসাঁ আন্দোলনের নায়কদের সাহিত্যচিন্তা এবং সাংস্কৃতিক ধ্যান–ধারণার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিম বাংলার স্বকীয় সাহিত্যের প্রকৃতি কি হওয়া উচিত এবং এর মূলে রেনেসাঁর মর্মবাণী কতখানি কার্যকর কিংবা কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় এই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হতে পারে তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ এরা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গ, কোনরূপ নিয়ম–নির্দেশে সত্যিকার সৃজনশীল সৃষ্টি সম্ভবপর কি না এবং সাহিত্য আন্দোলনে সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসার ভূমিকাই বা কতখানি– এ ধরনের কূটতর্ক দেখা দিতে পারে। এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ব্যক্তি প্রতিভার সৃষ্টি হলেও তার মূলে জাতিগত চৈতন্য এবং সামাজিক আন্দোলন–প্রতি–আন্দোলন কিংবা সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং যুগ–ধর্ম ও যুগ–চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত সচেতনতার কল্যাণে মহৎ শিল্প সৃষ্টি এক্ষেত্রেও সম্ভবপর। আর এখানেই আত্মপরিচয় আবিষ্কারের অনিবার্য প্রশ্নটি উচিয়ে ওঠে। মুসলিম নবজাগরণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এভাবেই সাহিত্য শিল্পে বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচয় ফুটিয়ে তোলার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। জাতিগত চৈতন্যকে ব্যক্তি প্রতিভার স্পর্শে এবং সৃজনবুদ্ধির কল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দুর্মর আকাংঙ্খা শুধু উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগৃতির ফল নয়, তারো বহু আগে থেকেই এর সূচনা। পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালেই এ তথ্যের সত্যতার সন্ধান মিলবে। উল্লেখ যোগ্য যে,

অবশ্য তারা রাজনৈতিক বক্তব্য সূত্রে সাংস্কৃতিক রূপরেখা তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু মুসলিম বাংলার সংস্কৃতিসেবীদের কাছে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে ইকবালের আবেদন ছিল অধিকতর প্রত্যক্ষ। বিশেষ করে, তদানীন্তন পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে যারা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছিলেন এবং শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা ও স্বস্থতা ফিরিয়ে আনার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তারা ইকবালের আদর্শকেই আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য আলিগড় আন্দোলন কিম্বা তারও পূর্ববর্তী বিভিন্নধর্মী মুসলিম জাগরণ আন্দোলনের ফলশ্রুতি যে একই উৎসে এসে মিলিত হয়েছিল তাও অনস্বীকার্য। উপমহাদেশে মুসলিম পূনর্জাগরণ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার করে দেখলে এবং এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলশ্রুতি পর্যালোচনা করলে এ সত্যিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, অবশ্য স্মরণযোগ্য যে। উপমহাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন হলেও এর চারিত্র্যলক্ষণ এক কিংবা অভিন্ন ছিল না।

ওহাবী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন কিংবা অসহযোগ আন্দোলন এর যে কোনটির চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বিচার করে দেখলে স্বাতন্ত্র্য কিংবা রূপপার্থক্যের স্বরূপ উদঘাটিত হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যে, সব কয়টি আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল উপমহাদেশে মুসলিম পূনর্জাগরণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং পরিণামে স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া। ধর্মীয় পুনর্জাগরণকে যারা অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তারা যেমন সে পথেই স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করতে চেয়েছেন, তেমনি যারা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের সত্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন তারাও সে পথেই স্বাধীনতার সাধনা করেছেন। তবে সময়ের পরিবর্তনে এবং স্ব-সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের মনোবিকাশের ধারার রূপ পার্থক্যের ফলে গুরুত্ব আরোপের স্বরূপ বদলেছে মাত্র। উদাহরণতঃ বলা যেতে পারে যে, ওহাবী আন্দোলনের মূলে বিশুদ্ধ ইসলামে ফিরে যাবার প্রেরণা যতখানি কার্যকর ছিল, পরবর্তী আন্দোলনসমূহে যে প্রেরণা তত খানি কার্যকর ছিল না, ওহাবী আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে অবশ্যই নিবেদিত ছিল, তবে তার মূল প্রেরণা উৎস ছিল ধর্মীয়। পরবর্তীকালের মুসলিম জাগরণ আন্দোলনে ধর্মীয় আদর্শের প্রেরণা এতখানি স্পষ্ট ছিল না; বরং, সে সব আন্দোলনে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের কথাই বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীরা অন্ততঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বাণীকেই তুলে ধরতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এ আন্দোলন ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষভাবে দানা বেঁধে ওঠে। দ্বিজাতিতত্ত্ব ফর্মুলা এবং ইকবালের ইসলামী ও মুসলিম সাংস্কৃতিক বিষয়ক চিন্তাধারা এবং সর্বোপরি তার তত্ত্ব এর মূলে বিশেষ অনুপ্রেরণা জোগায়। অবশ্য স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই বিশেষ পর্যায়ের মুসলিম জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের মূলে সুদীর্ঘকালের মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের ধারাও কম কার্যকর ছিল না। সব কিছুর যোগফলে এই পর্যায়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছিল।

মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের ধারাও কম কার্যকর ছিল না। সব কিছুর যোগফলে এই পর্যায়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে সে সময়ে বাংলাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও স্বাতন্ত্র্য বিশ্বাসী সাংস্কৃতিক কর্মীরা এতে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করেন। স্মরণযোগ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয়তাবাদী ধ্যান–ধারণা ও মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, বিভাগপূর্বকালে সাবেক পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তা অপেক্ষাকৃত স্থির প্রত্যয়ী রূপ পরিগ্রহ করে এবং শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা একটি বিশেষ ধারার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু বিষয়বস্তু ক্ষেত্রে নয়, কিংবা জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নয়, শিল্প সাহিত্যের প্রকাশ প্রকরণ এবং বাহ্যিক রূপান্তরণের মধ্যেও যাতে স্বকীয়তা ও স্বস্থতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেদিকেই এ–সময়ে শিল্পী–সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছিল। সে মুসলিম জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং জাতীয় জাগরণের বাণীকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মানস পরিচয়কে তুলে ধরার ব্রতচারণায় নজরুল ইসলাম তার সহজাত প্রেরণায় যে মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন তার পটভূমিতেই অধিকতর স্থির লক্ষ্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে সূচিত হয়েছিল' রেনেসাঁ আন্দোলন'। রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমি ও স্বরূপ এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের সাথে এর অন্বয় ধর্মিতা অনুসরণ ও অনুধাবনের জন্যই এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকারঅবতারণা।

ইতিপূর্বে রেনেসাঁ আন্দোলনের নায়কদের সাহিত্যচিন্তা এবং সাংস্কৃতিক ধ্যান–ধারণার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিম বাংলার স্বকীয় সাহিত্যের প্রকৃতি কি হওয়া উচিত এবং এর মূলে রেনেসাঁর মর্মবাণী কতখানি কার্যকর কিংবা কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় এই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হতে পারে তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ এরা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গ, কোনরূপ নিয়ম–নির্দেশে সত্যিকার সৃজনশীল সৃষ্টি সম্ভবপর কি না এবং সাহিত্য আন্দোলনে সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসার ভূমিকাই বা কতখানি– এ ধরনের কূটতর্ক দেখা দিতে পারে। এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ব্যক্তি প্রতিভার সৃষ্টি হলেও তার মূলে জাতিগত চৈতন্য এবং সামাজিক আন্দোলন–প্রতি–আন্দোলন কিংবা সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং যুগ–ধর্ম ও যুগ–চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত সচেতনতার কল্যাণে মহৎ শিল্প সৃষ্টি এক্ষেত্রেও সম্ভবপর। আর এখানেই আত্মপরিচয় আবিষ্কারের অনিবার্য প্রশ্নটি উচিয়ে ওঠে। মুসলিম নবজাগরণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এভাবেই সাহিত্য শিল্পে বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচয় ফুটিয়ে তোলার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। জাতিগত চৈতন্যকে ব্যক্তি প্রতিভার স্পর্শে এবং সৃজনবুদ্ধির কল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দুর্মর আকাংঙ্খা শুধু উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগৃতির ফল নয়, তারো বহু আগে থেকেই এর সূচনা। পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালেই এ তথ্যের সত্যতার সন্ধান মিলবে। উল্লেখ যোগ্য যে,

ঊনবিংশ শতকে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে তার প্রতিফলনের সূত্র অনুসন্ধান করলে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এর অম্লান পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু নিজস্ব বিষয়বস্তু আহরণ সম্পর্কে সচেতনতা উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিলেও এর শিল্পগত বহিরাঙ্গিক রূপায়ণ সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছে বিংশ শতকে। বস্তুতঃপক্ষে নজরুল ইসলামকে এই মহৎ দায়িত্ব পালনে নেতৃত্বের দায়ভার গ্রহণ করতে হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, নজরুলের এ-নেতৃত্বে ছিল তাঁর সহজাত জাতীয়তাবোধ, ঐতিহ্যিক অনুপ্রেরণা এবং সর্বোপরি পুঁথি সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা ও রসবোধের ফল; কোনরূপ সচেতন এষণা কিংবা বুদ্ধিবাদী ধ্যানধারণা এর পেছনে কার্যকর ছিল না। নজরুলের মানসপ্রবণতা এবং তাঁর ঐতিহ্যবোধের পটভূমির ভিন্নতা তাঁকে মৌলিক প্রতিভাধরের মর্যাদায় চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি সহজাত আবেগ অনুপ্রেরণার ফল হওয়ায় এবং এর পেছনে বুদ্ধিবাদী ধ্যান-ধারণার কোনরূপ প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকায় তা উল্লেখযোগ্য কাব্যসৃষ্টি সম্ভব করে তুললেও, মুসলিম সাহিত্যের স্বকীয়তাকে নিঃসংশয় মহিমায় ভাস্বর করে তুলেনি। বাংলা কবিতার আধুনিক পর্যায়ে এ-ক্ষেত্রে তার ভূমিকা মহান পথিকৃতের। কারণ, পুঁথি সাহিত্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের এবং তার জাতীয় মানসের পরিচয় বিধৃত থাকলেও নজরুলের কবিতায় তা যে মহিমান্বিত রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে তার তুলনায় উদাহরণ অনাবিষ্কৃত এবং দুর্লভ। কিন্তু এই কৃতিত্ব সত্ত্বেও নজরুলের সীমাবদ্ধতা এইখানে যে, তিনি সাহিত্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেও এর ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন বহু ক্ষেত্রে। কোনরূপ বুদ্ধিবাদী কিংবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সাহিত্য রূপায়ণের প্রশ্নে এগিয়ে নিয়ে যাননি বলে তাঁর পক্ষে দ্বৈতধারায় সাধনা সম্ভবপর হয়েছিল। আর এই সীমাবদ্ধতার কারণেই আধুনিককালের এবং বিশেষ করে রেনেসাঁ আন্দোলনকালে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষে ঐতিহ্যের রূপায়ণের প্রশ্নে শুধু নজরুলের কাব্যপ্রয়াসের উদাহরণে সন্তুষ্ট কিংবা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভবপর হয়নি। তারা নজরুল থেকে নিজস্ব ও স্বকীয় কাব্য প্রয়াসের আদর্শের ইশারা নিয়েছেন সত্য, কিন্তু সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলার বাস্তব প্রয়োজনে দ্বারস্থ হয়েছেন ইকবালের। এ কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে ইকবালের সংস্কৃতি-চিন্তা আর নজরুলের কাব্যসৃষ্টির স্বতন্ত্রধর্মী উদাহরণ-এই দুইয়ের যোগফল রেনেসাঁ আন্দোলনকালীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও সৃজনধর্মী কবি-সাহিত্যিকদের রচনার উপজীব্য বিষয় ও বহিরাঙ্গিক রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ইকবাল ও নজরুল কিভাবে বুদ্ধিজীবীদের মনোবিকাশের ধারায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন এবং বিভাগ পূর্বকালেই মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার পরিচয় মিলবে রেনেসাঁ আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের রচনায়। আমাদের স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ এবং মুসলিম সভ্যতার

পুনরুত্থানের আকাঙ্খার কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ আলী আহসান একদা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেনঃ

"বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে মুসলিম সভ্যতার পুনরুত্থানের কথা অপরিজ্ঞাত ছিল না। রাজনৈতিক তরঙ্গ বিক্ষোভে বাঙালী মুসলমানদের নির্যাতিত মনও কম্পমান হলো। বিহ্বল মুসলমানদের জাগরণের কথা বললেন মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন শিরাজী ও কায়কোবাদ। এঁদের রচনায় পরাধীনতার জন্য তীব্র বেদনাবোধ ছিলো এবং ইংরেজ তোষণের মতো হীনমন্যতার প্রশ্রয় ছিলো না। শব্দবোধ শ্লথ এবং দুর্বল, কোথাও কোথাও হেম–নবীনের অনুকৃতি মাত্র; কিন্তু এর মধ্যেই কেমন একটি অকপট, নিষ্কলঙ্ক মনের পরিচয় আছে, যা আজকের দিনে আর পাওয়া যায় না।

ইকবালের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তারও অনেক পরে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুর্কীর খেলাফত যখন আর নেই যখন বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের স্বপ্ন অস্পষ্ট হয়েছে তখন নজরুল ইসলাম অতর্কিতে আমাদের প্রাণে উম্মাদনা আনলেন উদ্ভব–যুগের ইসলামের কাহিনী স্মরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্থবির শান্ত মনে প্রচন্ড আঘাত করে। নজরুল ইসলামকে পুরোভাগে রেখে বাঙালী মুসলমান যখন আপন জীবনের ভিত্তিহীনতার জন্য অভিযোগ তুলছে তখন ইকবালের 'শেকোয়া'র সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। নজরুলকে পথিকৃৎ মেনে আশরাফ আলী খান আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন আমাদের জীবনের বিপর্যয় ও স্বস্তিহীনতার জন্য এবং সত্যাদর্শের অভাবের জন্যও। 'শেকোয়া'য় তিনি আপন মনের অনুরণন শুনলেন। কাব্য হিসেবে 'শেকোয়া'র মূল্য যতই লঘু হোক না কেন, এর অভিযোগ আমাদের অনুভূতিতে শিহরণ তুলেছিলো। নজরুলকে ভাল লেগেছিলো, ইকবালকে আরো ভালো লাগলো। নজরুলের দীপ্তি অসাধারণ কিন্তু সে দীপ্তির দাহন আছে, স্নিগ্ধতা নেই; ইকবালের কাব্যে জ্বালা আছে কিন্তু ধর্মের স্থির সত্যের সঙ্গে তার অসদ্ভাব নেই, তাই মূলতঃ তা প্রশান্ত এবং জীবনানুভূতিতে অতুলনীয়।"

"এর পর যখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে ভারতীয় মুসলমানকে অন্য এক জাতীয় ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান করতে বললেন, তখন তাঁকে আমরা নেতৃপদ দিলাম। ১৯৩০ সালের এলাহাবাদ মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে ইকবাল দ্বিজাতি–তত্ত্বের যে তথ্য প্রকাশ করলেন পরবর্তীকালে তা–ই হয়ে দাঁড়ালো (সাবেক) পাকিস্তান পরিকল্পনার অঙ্কুর। অভিভাষণে ইকবাল বললেন যে, রেনে বলেন, মানুষ তার গোত্র বা ধর্মের দাসত্বে আবদ্ধ থাকে না। ভৌগোলিক সীমারেখাও তাকে বন্ধন দশায় রাখতে পারে না; উদার হৃদয়, বিদগ্ধমনা মানুষের সমষ্টি একটি বিশেষ আদর্শ ও বোধের সৃষ্টি করে থাকে যাকে আমরা জাতি বলে আখ্যায়িত করি। এহেন জাতির সৃষ্টি একেবারে যে অসম্ভব তা নয়, যদিও এর সম্ভাব্যতার জন্য মানুষের মনকে নতুন করে সংগঠন করবার একটি বিলম্বিত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন করে। এমন অবস্থা সত্য হতে পারত, যদি কবীরের শিক্ষা এবং আকবরের বিশ্বাস জনসাধারণের

মনকে স্পর্শ করতো। কিন্তু অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয় যে, একটি বৃহত্তর পরিবেশে সম্মিলিত হবার আকাঙ্খায় ভারতের কোন ধর্মাবলম্বীই আপন বিশ্বাস ও আদর্শকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সম্মিলিত অস্তিত্বের জন্য কারোই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না এবং সেজন্য যে মূল্য দিতে হবে তাও কেউ দিতে চায় না। ভারতীয় ঐক্যবোধের জন্য প্রয়োজনী অনেক আদর্শ এবং জাতির অনস্তিত্বের নয় কিন্তু সে সবার মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার। একমাত্র যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তব পন্থা হচ্ছে যা নেই তা মেনে নেওয়া নয় কিন্তু প্রচলিত অবস্থাকে স্বীকার করা। (সাবেক) পাকিস্তান পরিকল্পনার উন্মেষ হলো এভাবেই। রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা নয় কিন্তু আদর্শের স্বীকার। সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা শুনা যেতে লাগলো আরো পরে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের পর। বলা হলো প্রকাশ্যেই যে, আমাদের সাহিত্য হবে আলাদা, কেননা আমাদের জীবনবোধ হিন্দুদের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। কবিতার ক্ষেত্রেই এ আদর্শের অনুসৃতি হলো সার্থক। পাকিস্তান তখনও পর্যন্ত আবেগ, উল্লাস ও কল্পনার এবং কবিতাই হলো এ আবেগ প্রকাশের একমাত্র পরিসর। এ বক্তব্যের সঙ্গে রূপকল্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের পর কখনও কখনও কারো কবিতা শ্রোত্ররসায়নও হয়েছে। কিছুটা অগভীর হলেও কাব্যক্ষেত্রে তিনটি ধারার চিহ্ন দেখা গেলো–ইসলামী ঐতিহ্যের কাহিনী ও সৌন্দর্যের ধারা, ইসলামের সত্য বিশ্বাস এবং উপলব্ধি গত আদর্শ জীবনবোধ এবং সর্বশেষে পুঁথি সাহিত্য ও পল্লী গীতির রূপ এবং কল্পনার জীবন। ইকবালের প্রভাব কার্যকরী হয়েছিলো প্রথম দু'টি ক্ষেত্রে। ইকবালের প্রভাবে এ দু'টি ধারা বলিষ্ঠ হয়েছিলো এবং নতুন রূপ নিয়েছিলো–ক্ষীণ প্রাণধারা স্রোতবেগ পেয়েছিল।" [ইকবালের কবিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য আগষ্ট ১৯৫২]

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর বিপ্লবী আইডিয়াকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা ইকবালের বাণীর আলোকে এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতিবিষয়ক চিন্তাধারার দিক–নির্দেশে রেনেসাঁ আনয়নের প্রচেষ্টায় ব্রতি হয়েছিলেন । নজরুল মুসলিম পুণর্জাগরণে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন তাঁর হৃদয়ের আবেগে এবং সহজাত প্রবণতায়। এ–ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদী ধ্যান–ধারণা কিংবা কোনো বিপ্লবী আইডিয়া তার ছিল না। ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনপ্রতিষ্ঠাও তিনি কামনা করেছেন একই আবেগ ও উদ্দীপনায়। শুধু মুসলিম বিষয়বস্তু এবং উপজীব্য সম্পদ আহরণেই নয়, তার সামগ্রিক কবিকর্মেই এ–ধারা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, নিজস্ব ঐতিহ্যের উত্তরাধীকারীরূপে এবং মুসলমান মানসিকতার অধিকারী হিসাবে তিনি যেমন কবিতায় বিশিষ্ট স্বাক্ষর এবং চারিত্র্যলক্ষণ আরোপিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তেমনি হিন্দু জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারও তার রচনায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইকবালের মতো নিজস্ব ধর্মীয় আদর্শ এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্থির প্রত্যয়ী হলে এবং কাব্যক্ষেত্রে সহজাত আবেগের ভূমিকাকে গৌন করে দেখলে এমনটি হয়তো নজরুলের পক্ষে সম্ভব হতো না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যে নজরুল মধ্যযুগের কিছুসংখ্যক মুসলিম কবির কাছ থেকে আদর্শের

না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যে নজরুল মধ্যযুগের কিছুসংখ্যক মুসলিম কবির কাছ থেকে আদর্শের ইশারা পেয়েছেন তা বলাই বাহুল্য । ধর্মীয় আদর্শ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কিত মনোভাব ও ধারণার এই ব্যতিক্রমের জন্যই বাংলা কাব্যে ইসলামী আদর্শ এবং মুসলিম ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম রূপকার হওয়া সত্ত্বেও নজরুলের কবিতা রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমিতে সেকালে তদানীন্তন পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবী কিংবা কবি কর্মীদের মনোবিকাশের ধারায় সীমাবদ্ধ অর্থে আবেগ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে ইকবালের অবদানই হয়েছে অধিকতর স্পষ্ট–বিশেষ করে কবিদের মনন–চিন্তনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ঐতিহাসিক।

অবশ্য স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, নজরুলের কবিতা কবিদের রচনার বহিরাঙ্গিক প্রকাশে তার অম্লান স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়েছে। একই ভাষায় কবিতাচর্চার ফলে এ–প্রভাব ছিল স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। রেনেসাঁ–পন্থী কবিদের রচনার মননশীল আর্তিতে ইকবালের ভূমিকা মুখ্য হলেও ভাষার পার্থক্যের দরুন বাঙালী কবিদের রচনার বহিরাঙ্গিক প্রকাশে তা নজরুলের তুল্য প্রভাব অঙ্কিত কতে পারেনি। নজরুলের প্রভাব ঐ ক্ষেত্রে অনিবার্য ছিল এই কারণে যে, ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐহিত্যবিষয়ক কবিতায় নজরুল প্রধানত পুঁথি সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে আশ্রয় করেছিলেন; উপজীব্য বিষয় সংগ্রহ প্রকাশ প্রকরণের অনুসরণ এই উভয় ক্ষেত্রেই একথা সত্য। আর যেহেতু রেনেসাঁ আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত কবিরাও কাব্যক্ষেত্রে পুঁথি সাহিত্যের উত্তরাধিকারের দিকেই ফিরে তাকিয়েছিলেন সে কারণে এ ক্ষেত্রে নজরুলের প্রভাব হয়ে পড়েছিল অনিবার্য। ইকবালের কবিতা প্রকাশপ্রকরণ ও আঙ্গিক প্রকরণের দিক থেকে তেমন প্রভাব বিস্তার না করলেও তা কবিদের বুদ্ধিবাদী মানস গঠনে সংযোজিত করেছিলো ঐতিহাসিক অবদান। কবিতায় রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের আগ্রহ এবং সচেতনতা সম্ভবত ইকবালের অনুসরণেই দেখা দিয়েছিল। নজরুলের প্রতীক কিংবা রূপকের তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নেই, রেনেসাঁপন্থী কবিরা এর ইশারা পেয়েছিলেন প্রধানত ইকবাল থেকেই। ফররুখ আহমদ প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিম বাংলার কাব্য সাধনায় নতুনত্বের সঞ্চার করেছিলেন।

"ফররুখ আহমদে এসে আমরা মুসলিম চেতনার এক নতুন এলাকায় প্রবেশ করি। তিনি (সাবেক) পাকিস্তান আন্দোলনের সময় লেখনী ধারণ করেন। এ কারণেই আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মধ্যে অতি সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়, কারো কারো মতে এ সচেতনতা ক্ষতিকর। কিন্তু ফররুখ আহমদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হচ্ছে এই যে, তিনি সিন্দাবাদ কাহিনীকে রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে ব্যবহার করেছেন। নজরুল রূপকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না, এমনকি তিনি প্রতীকধর্মী ছিলেন না । তিনি রূপকল্প সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে কিন্তু ফররুখ আহমদ পুরাকাহিনীর ব্যবহারে সব সময়ই প্রতীকবাদী;

তাঁর কবিতায় সিন্দাবাদ মুসলিম সমাজ, মুসলিম চেতনা, মুসলিম সৌর্য; মুসলিম গৌরব ও মুসলিম অভিযানের প্রতীক; হেরা পর্বত অনুপ্রেরণা উৎস আদর্শ ভূমি ও স্বর্গের প্রতীক–যেখানে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঐশী আহবান লাভ করেছিলেন। ফররুখ আহমদই প্রথম কবি যিনি সাফল্যের সঙ্গে মুসলিম অতীত ও মুসলিম পুরাকাহিনী বাংলা কাব্যে কাজে লাগিয়েছেন, উর্দু কাব্যে যেমন কাজে লাগিয়েছেন ইকবাল। [সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য]

অবশ্য মনে রাখা আবশ্যক যে, রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমিতে সাহিত্যে স্বকীয়তা ও স্বস্থতা ফিরিয়ে আনার এবং মুসলিম বৈশিষ্ট্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের পক্ষে ইকবালের বুদ্ধিবাদী আহবানে সাড়া দেওয়া এবং উদ্দীপিত বোধ করাই স্বাভবিক ছিল। নজরুল যখন বাংলা কাব্যে ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম বৈশিষ্ট্য রূপান্তিত করার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন তখন তার পেছনে কোনরূপ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি কিংবা দিক-নির্দেশনা ছিল না। নজরুল নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকেই সহজাত প্রতিভায় কাজে লাগিয়েছিলেন। অধিকন্তু তিনি একটি বিশেষ সমাজ পটভূমিকায় ও রাজনৈতিক জাগরণের ধারাস্রোতে অবগাহন করে সামগ্রিক জাতীয় জাগরণ কামনা করেছিলেন। ফলে হিন্দু সমাজের জাগৃতির সাধনায়ও তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। ফলে এ ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম–এই উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে তাঁর পক্ষে কাব্যে রূপায়িত না করে উপায় ছিল না। কিন্তু রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমিতে যাঁরা কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সম্পর্কে অধিকতর স্পষ্ট এবং স্থিতধী ধ্যানধারণা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন । সমগ্র বাংলা কাব্যের অবয়বে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপরেখা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার স্বরূপ সন্ধানে এবং ভবিষ্যৎ কাব্যপ্রচেষ্টায় নিজদের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করার সাধনায় এঁরা সচেতনভাবে আত্মনিয়োগের পটভূমিও খুঁজে পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সেদিন বলা হয়েছিলঃ

উনিশ শতকের পূর্বের বাংলা কাব্যে আত্মবিশ্লেষণ নেই, হৃদয়াবেগের সঞ্চরণ নেই–তার মূল্য কাহিনী মাহাত্মে কখনও কখনও বস্তু–প্রকৃতি, দেব বিগ্রহ বা ভগবানের কাছে নিবেদিত চিত্ততায়। যা–ই হোক, উনিশ শতকের মুসলিম সাহিত্যিক মীর মুশাররফ হোসেনের রচনায় এবং পরবর্তীকালে মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন শিরাজীর কাব্যে ইসলামের ইতিহাসের অপরিমিত প্রয়োগ দেখি উপাদান হিসাবে। এঁদের রচনায় ইতিহাসের সংবাদ আছে অর্থাৎ ইতিহাস মিশ্রিত জ্ঞানের পরিচয় আছে। যে বস্তুর অভাব মনে হয় তা হচ্ছে ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যবোধ। অনেক পরে নজরুল ইসলামের কাব্যে ইসলামের ইতিহাস নিছক পটভূমি বা উপাদান নয় কিন্তু অনুভূতির লালনভূমির সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র

ইতিহাস নিছক পটভূমি বা উপাদান নয় কিন্তু অনুভূতির লালনভূমির সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র এবং জীবনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনায় পরিণত হয়। নজরুল ইসলামের কাব্যে অভাব ছিলো তওহীদ বা নিঃসংশয় একত্ববাদের এবং কোরআনের ইসলামের সৌন্দর্য ও উপলব্ধি চিত্রের। বিপর্যয়ের জন্য বেদনা এবং বিদ্রোহের অগ্নিবর্ষণ আছে কিন্তু আত্মবিশ্লেষণের অভাবের জন্য গ্লানি ও হতচেতনার সত্যিকারের প্রতিষেধক নির্ণিত হয়নি। ইকবাল মুসলমানের নিশ্চেষ্টতা ও হতোদ্যমের যথাযথ চিত্র অংকন করেছেন এবং এই পতন ও সর্বনাশের জন্য তার ক্ষোভ নিদারুণ। জওয়াবই– শেকোয়ায় যে পথনির্দেশ আছে তাতে ইসলামের শক্তি মত্ততায় বিশ্বাসী ইকবালের নিবিড় উপব্ধির পরিচয় মেলে। তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে অবলম্বন করতে বলেছেন ইসলামের প্রবহমান সত্য এবং কোরআনের অমোঘ সঞ্জীবনী বাণীকে। এক জাগায় তিনি বলেছেন, In times of crisis in their history it is not Muslims that saved Islam on the contrary, it is Islam that saved Muslims. *ইতিহাসের সংকট মুহূর্তে মুসলমান ইসলামের ত্রাণকর্তা হয়নি অন্যপক্ষে ইসলাম রক্ষা করেছে মুসলমানকে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইসলামের অর্থ ইকবালের কাছে স্তিমিত প্রাণ ব্যক্তির আত্মসমর্পণ নয়, ইসলামের অর্থ শক্তিমত্তা, ন্যায়ানুসরণ ও সাধনা একই সঙ্গে। ইকবালের এই বলিষ্ঠ আবেগ তরুণ মুসলমানের মনকে নাড়া দিয়েছিলো প্রচন্ডভাবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ আলোড়নের সংবাদ পাই ১৯৪২–৪৩ সাল থেকে। যাদেরে অনেকটা পরিহাস করে কাজী আবদুল ওদুদ 'আত্মনিয়ন্ত্রণী' দল বলেছেন, তাদের উদ্ভব এ সময়েই দুইটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এবং পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ মুসলিম সাহিত্য সাধনার পথনির্দেশ দিতে চাইল। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতাই ছিলো এ আন্দোলনেই সজীবতার উৎস। কাব্যক্ষেত্রে নেমে এলাম ফররুখ আহমদ ও আমি। ইকবালে আদর্শের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করলেন ফররুখ আহমদ। তার কাছে পরম মূল্যবান হলো উন্মেষ যুগের ইসলাম। আজ হয়তো বিপর্যয় এবং পরিবেশের সঙ্গে অসদ্ভাব আছে কিন্তু বিশ্বাস ও উপলব্ধির পথে প্রথম যাত্রায় উৎসাহ ছিলো অদম্য এবং স্বস্তিও ছিলো প্রগাঢ়। তাই হেরার রাজতোরণই তার লক্ষ্য–যে লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যবোধ, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি খিলাফতের প্রয়োজন। মুজীবুর রহমান খাঁ অবতীর্ণ হলেন স্বতন্ত্র তমদ্দুনের তূর্যবাদক হিসেবে। [সৈয়দ আলী আহসান, ইকবালের কবিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য। আগষ্ট, ১৯৫২] !*

ঐক্য, সংহতি ও সংগঠন
মূলঃ ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল
সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত

[১৯৩২ সালের ২১শে মার্চ লাহোরে নিখিল-ভারত মুসলিম সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে আল্লামা ইকবালের প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ]

ভদ্রমন্ডলী, ভারতীয় মুসলিমরা তাঁদের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে এত বেশী বক্তৃতা শুনেছেন যে, তাঁদের মধ্যে অধিকতর অধৈর্যপরায়ণ ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই আমাদের আলোচনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। তাঁদের ধারণা, এই ধরনের আলোচনা ইসলামের অন্তর্নিহিত ঘুমন্ত কর্মস্পৃহাকে দুর্বল করবে এবং পরিণামে তার বিনাশ সাধন করবে। তাঁদের মধ্যে একজন বলেছেনঃ ' দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের কর্মের ক্ষুধাকে তীব্রতর করছে এবং আমাদের নেতৃবৃন্দ যদি ভারতীয় মুসলিমদের বিচিত্র অবস্থার উপযোগী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্দেশ করতে না পারেন, তা'হোলে কেবল পরানুকরণের শক্তিই কাজ করে যাবে এবং আমাদের তরুণ সমাজকে পরিণাম চিন্তা না ক'রে ঘটনা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবার পথে পরিচালিত করবে।' অপর একজন যুবজনোচিত অধৈর্য সহকারে বলেছেনঃ 'কর্মের জন্য কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত পন্থার প্রয়োজন হয় না; কর্ম বিদ্যালয়ে অধীত ন্যায়শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে না, বরং তা' মানুষের অন্তর থেকে বাইরে আত্মপ্রকাশ করার সাথে সাথেই তার নিজস্ব বিচিত্র যুক্তি রচনা করে নেয়।' আমাদের যুবসমাজের বর্তমান মনস্তত্ত্ব হচ্ছে এইরূপ। এই সংকট মুহূর্তে আপনারা আমার প্রতি আস্থা স্থাপন করেছেন, সে জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ; কিন্তু যে লোকটি স্বাপ্নিক আদর্শবাদীর বেশী কিছু নয়, তাকে মনোনয়ন করেছেন ব'লে আমি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে অভিনন্দিত করতে পারৃছি না। সম্ভবতঃ আপনারা মনে করেন যে, এই সংকট-সন্ধিক্ষণে আপনাদের প্রয়োজন একজন স্বাপ্নিকের; কারণ যেখানে স্বপ্ন নেই, সেখানেই জাতির ধ্বংস। সম্ভবতঃ, আপনারা মনে করেন যে, লন্ডন বৈঠকের অভিজ্ঞতা অর্জনের পর আমি এই সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণের অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করেছি। পার্থিব বাধা, বন্ধনমুক্ত আদর্শকে তু'লে ধরা হচ্ছে এক ধরনের কাজ, আর আদর্শকে জীবন্ত বাস্তবে রূপায়িত করার পন্থা নির্দেশ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের কাজ। ব্যক্তিবিশেষ যদি প্রবণতার দিক দিয়ে প্রথমোক্ত হয়, তা'হোলে তার কর্তব্য হয় অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ, যেসব পার্থিব বাধা, বন্ধন প্রতি পদে বাস্তব রাজনীতিকের গতিপথে তার মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ায়, তা' তাকে সহজভাবে এড়িয়ে যেতে হয়। প্রথমোক্ত থেকে শেষোক্ত কাজের দিকে এগিয়ে যাবার মতো সাহস যার আছে, তাকে ক্রমাগত সেইসব বাধা, বন্ধনের হিসাব রাখ্‌তে হয় এবং কখনো কখনো তারই শক্তির কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করৃতে হয়, সে বরাবরই উপেক্ষা

করতে অভ্যস্ত। এই ধরনের লোককে চিরন্তন মানসিক সংঘাতের মধ্যে জীবনধারণ করার দুর্ভাগ্য বরণ ক'রে নিতে হয় এবং সে সহজেই স্ববিরোধিতার অপরাধে অভিযুক্ত হোতে পারে। যা-ই হোক, আপনারা যে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমায় ফেলেছেন, তা' আমি সানন্দে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। তার কারণ এই নয় যে, আমি নিজেকে তার জন্য উপযুক্ত মনে করছি, বরং তার কারণ হচ্ছে, সৌভাগ্যক্রমে সমস্যাগুলো এতটা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির নির্দেশের উপর ততোটা নির্ভর করে না, যতোটা তা' নির্ভর করে একই উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি সকল ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার মিলিত শক্তির উপর।

রাজনীতির মূল রয়েছে মানুষের আত্মিক জীবনের অভ্যন্তরে। এটা আমার ঈমান (Belief) যে, ইসলাম কোনো ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার নয়। এ হচ্ছে একটি সমাজ, অথবা ইচ্ছা করলে একে আপনারা বলতে পারেন পৌর ধর্মমন্ডলী (civic church)। যেহেতু বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শসমূহ যেভাবে ভারতে রূপ পরিগ্রহণ করছে, তাতে তার মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে, তারই জন্য আমি রাজনীতির ব্যাপারে মনোযাগী হয়েছি। ইউরোপে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) বলতে যা' বোঝায়, আমি তার বিরোধী। তার কারণ এই নয় যে, ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধন করা হোলে তাতে মুসলিমদের বাস্তব লাভের সম্ভাবনা কম থাকবে। আমি এর বিরোধী। কারণ, আমি এর ভিতরে দেখতে পাচ্ছি নাস্তিকতামূলক জড়বাদের (atheistic materialism) জীবাণু, যাকে আমি আধুনিক মানবতার পক্ষে বৃহত্তর বিপদসম্ভাবনা বলে মনে করি। দেশাত্মবোধ একটি পূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তি (a perfectly natural virtue) এবং তার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে মানুষের নৈতিক জীবনে। তথাপি যার জন্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের উদ্বেগ, তা' হচ্ছে মানুষের ধর্ম (faith), তার তমদ্দুন (culture) তার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য (historical traditions) । আমার দৃষ্টিতে এই ক'টি জিনিসের জন্যই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এবং এরই জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে,-সেই ভূমিখন্ডের জন্য নয়, যার সাথে অস্থায়ীভাবে মানুষের আত্মার সংযোগ ঘটেছে। ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃশ্যমান ও সংযোগের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় আমি এক 'সুসংবদ্ধ সমগ্র' (harmonious whole) গড়ে তোলার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। কোনো গুরুতর বৈষম্যই তার ঐক্যকে বিপর্যস্ত করতে পারে না; বরং, সকল বৈষম্যকেই সে তার বুকের মধ্যে টেনে নেবে। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার সমস্যা ছিলো, কি করে এক তার একত্ব না হারিয়ে বহুতে রূপ লাভ করবে। আজকের দিনে এই সমস্যা তার নৈতিক উচ্চতর স্তর থেকে নেমে এসেছে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের স্থূলতর পর্যায়ে এবং আমাদেরকে এখন তার সমাধান করতে হবে তার বিপরীত ধারায়, অর্থাৎ কি করে বহু তার বহুত্বের প্রকৃতি না হারিয়ে একে পরিণত হবে। আমাদের নীতির বুনিয়াদ সম্পর্কে ধরতে গেলে আমার নতুন কিছু পেশ করার নেই। ইতিপূর্বেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণে

আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করেছি। গোল টেবিল বৈঠকের চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের প্রতিনিধি দলের দ্বিধা, সংশয়পূর্ণ আচরণের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো, বর্তমান অভিভাষণে প্রথমতঃ আমি আপনাদেরকে তার নির্ভুল ধারণায় পৌছবার সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। দ্বিতীয়তঃ বিগত লন্ডন বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার দরুন পুনরায় সম্পূর্ণ পরিস্থিতির সযত্ন পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়েছে বলে এখন একটি নতুন নীতিনির্ধারণ ক'রে তোলা কতোটা বাঞ্ছনীয়, আমার নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী আমি তা আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করবো। আমাদের প্রতিনিধি দলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকেই আমি আলোচনা শুরু করবো।

সংখ্যালঘু কমিটির (Minorities Committee) প্রথম দু'টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো যথাক্রমে ১৯৩১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর। উভয় ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার ঘরোয়া মীমাংসার জন্য বৈঠক মুলতবী থাকে। প্রথমে গান্ধী মুসলিম প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন যে, যতোক্ষণ না মুসলিম প্রতিনিধি দল ডাঃ আনসারীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন, ততোক্ষণ আলোচ্য বিষয়গুলো নিয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে না। এতে অকৃতকার্য হ'য়ে তিনি মুসলিম প্রতিনিধি দলকে জানিয়ে দিলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি মুসলিম দাবী মেনে নেবেন এবং কংগ্রেস, হিন্দু ও শিখ দলকে তা'তে রাজী করবার চেষ্টা করবেন। শর্ত থাকবে যে, মুসলিম প্রতিনিধি দল তিনটি বিষয় মেনে নিতে রাজী থাকবেনঃ (১) বয়স্কদের ভোটাধিকার (adult suffrage) ; (২) অচ্ছুৎদের জন্য কোনো বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে না; এবং (৩) কংগ্রেসের উথাপিত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী। মহাত্মা ব্যাপারটি কংগ্রেসের সামনে পেশ করতে অস্বীকার করলেন এবং এই ব্যবস্থায় হিন্দু ও শিখদের সম্মতি আদায়ের চেষ্টায় ব্যর্থ হোলেন। ৭ই অক্টোবর দু'জন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা প্রস্তাব করলেন যে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটি সাতজন সালিশ-সমন্বিত একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। এ প্রস্তাবও হিন্দু ও শিখ দল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হোল। ৮ই তারিখে সংখ্যালঘু কমিটি তৃতীয়বারের মতো এক বৈঠকে মিলিত হোল। এই সভায় মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক মীমাংসা আনয়নে তাঁর ব্যর্থতা বৃটিশ সরকারকে জানালেন। কারণ, তাঁর মতে তাঁরা (বৃটিশ সরকার) বৃটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে এমন সব লোককে মনোনীত করেছেন, তাঁর (মহাত্মা গান্ধীর) উক্তি অনুযায়ী যাঁরা প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকৃতির লোক নন। মুসলিম প্রতিনিধি দলের তরফ থেকে মরহুম স্যার মুহাম্মদ শফী বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন তু'লে মহাত্মা গান্ধীর প্রকাশিত অবাঞ্ছিত মন্তব্য খন্ডন ক'রে তার উথাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বৈঠকের পরিসমাপ্তি হ'য়ে গেলো এবং বৃটিশ সাধারণ নির্বাচনের দরুন ১২ই নভেম্বরের পূর্বে আর কোনো বৈঠক সম্ভব হোল না। ইতিমধ্যে ১৫ই অক্টোবর পুনরায় ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা শুরু হোল। এসব আলাপ-আলোচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-স্যার জি ওফ্রে করবেটের পাঞ্জাব সম্পর্কিত পরিকল্পনা।

নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনে আমার বক্তৃতায় আমি যে প্রস্তাব করেছিলাম, এই প্রস্তাবে অনেকটা তার অনুরূপভাবে পাঞ্জাব থেকে আম্বালা বিভাগকে বাদ দিয়ে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছিলো। এ প্রস্তাবও হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক অগ্রাহ্য হোল। এমনকি, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমেও তারা পাঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ্য করতে পারলেন না। এই আলাপ-আলোচনাও যখন নিষ্ফল হোল, তখন ভারতের প্রায় অর্ধেক বাসিন্দা সমন্বিত ভারতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ একটি ভারতীয় সংখ্যালঘু চুক্তির (Indian Minorities Pact) সম্ভাবনা সম্পর্কে পরস্পর পরামর্শ চালাতে শুরু করলেন। ১২ই নভেম্বর শিখ দল ব্যতীত অপর সকল সংখ্যালঘু দল এক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন এবং ১৩ই নভেম্বর সংখ্যালঘু কমিটির সর্বশেষ বৈঠকে তা' আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করা হোল।

আমাদের ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতেই তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের প্রতিনিধিবর্গ সাম্প্রদায়িক মীমাংসার জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করেছেন। একটি মাত্র ব্যাপার আমার কাছে রহস্যময় হ'য়ে আছে এবং সম্ভবতঃ চিরকালই রহস্যময় হ'য়ে থাক্বে। তা'হচ্ছে ২৬শে নভেম্বর Federal Structure Committee- তে আমাদের মুখপাত্রের ঘোষণা। তাতে বলা হয়েছে যে, তাঁরা একই সময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (provincial autonomy) ও কেন্দ্রীয় (aentral responsiblity) প্রস্তাবে রাজী আছেন। এর কারণ আপোষ ও দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির আগ্রহ (cnxiety), না তাঁদের মনের উপর কোনো সংঘাতজনক প্রভাব (conflicting influence) কাজ করেছিলো, তা' আমি বলতে পারি না। ১৫ই নভেম্বর- যেদিন আমি আমাদের প্রতিনিধি দলের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলাম-মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ সিদ্ধান্ত করলেন যে, তাঁরা Federal Structure Committee- আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না। ত'হোলে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের খেলাফ এসব আলোচনায় কেন অংশগ্রহণ করলেন? Federal; Structure Committee-তে আমাদের মুখপাত্রদেরকে কি ২৬শে নভেম্বরের ঘোষণা প্রচারের অধিকার দেয়া হয়েছিলো? এসব প্রশ্নের জওয়াব দিতে আমি পারি না। আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, মুসলিম সম্প্রদায় ঘোষণাটিকে একটি অতি গুরুতর ভ্রান্তি ব'লে বিবেচনা করে এবং এ সম্পর্কে আমি নিঃসংশয় যে, সম্মেলন এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি সম্পর্কে জোরের সাথে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করবেন। নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনের বক্তৃতায় আমি সর্ব-ভারতীয় ফেডারেশনের ধারণার বিরুদ্ধে আওয়াজ তু'লেছিলাম। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে দেখা গেছে যে, এই ধারণা ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে মাত্র প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় দায়িত্ব প্রবর্তন যদি সর্ব-ভারতীয়

ফেডারেশনের সমাপ্তির উপর নির্ভর করে–যাতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে ব'লে আমার ভয় হয়, তা'হোলে সরকারের উচিত, বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহে অবিলম্বে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা (responsible government) প্রবর্তন করা, যাতে তার রচিত বুনিয়াদ কেন্দ্রীয় দায়িত্ব চালু হওয়া পর্যন্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেকে ফেডারেল কাঠামোয় দাঁড় করাবার মতো পূরোপুরি তৈরী ক'রে নিতে পারে। প্রকৃত আধুনিক ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুতির কাজ করবার প্রয়োজন হবে। আমার এরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে এবং আমি আমাদের প্রতিনিধি দলের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কয়েক দিন আগেই সন্দেহ করেছিলাম যে, বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহে অবিলম্বে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে আমাদের মুখপাত্ররা কোনো কোনো বৃটিশ রাজনীতিকের কাছ থেকে অসৎ মন্ত্রণা গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট–কমান্ডার কেন্‌ওয়ার্দী একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেনঃ

I understand that the moderate leaders in London were badly advised on this matter by certain English politicians, that they listened too readily to their advice and rejected the great instalment of provincial autonomy. And the curious thing is that the Mahatma was apparently ready to consider this instalment sympathetically."

'আমি জানতে পেরেছি যে, লন্ডনে উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারে কোনো কোনো বৃটিশ রাজনীতিকের কাছ থেকে অসৎ মন্ত্রণা গ্রহণ করেছেন। তারা বিনা দ্বিধায় তাঁদের মন্ত্রণা শুনেছেন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের মহৎ পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করেছেন। কৌতুকজনক ব্যাপার এই যে, স্পষ্টতঃ মহাত্মা এই পরিকল্পনা সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করার জন্য তৈরী ছিলেন।' লেফট্‌ন্যান্ট–কম্যান্ডার যে উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা কারা? অবিলম্বে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে লন্ডনে ও বর্তমানে মন্ত্রণা কমিটিতে (Consultative Committee) স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর মনোভাব বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই উদ্ধৃতির লেখক হিন্দু উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বোঝাতে চাননি। আমার মনে হয়, তিনি সেই মুসলিম উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দকেই সম্ভবতঃ বোঝাতে চেয়েছেন, ফেডারেল স্ট্রাক্‌চার কমিটিতে যাঁদের ২৬শে নবেম্বরের ঘোষণাই একই সংগে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দায়িত্ব প্রবর্তন সম্পর্কে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় প্রকৃত কারণ ব'লে আমার কাছে অনুভূত হয়। যেহেতু প্রদেশসমূহে অবিলম্বে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে পাঞ্জাব ও বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার অর্জনের জন্য আমাদের

সম্প্রদায়ের দাবী সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ঘোষণার প্রয়োজন, সেই জন্যই বর্তমান পরিস্থিতির বিচার করতে গিয়ে আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের নিজস্ব নেতৃবৃন্দের আচরণই এ ব্যাপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী, যার ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে সর্বপ্রকার সন্দেহের উদ্ভব হয়েছে।

পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, বিগত লন্ডন বৈঠকের উপসংহারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর হতাশাজনক ঘোষণার পর প্রয়োজন হোলে নতুন নীতিনির্ধারণের সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার প্রতি সরকারের মনোভাব সম্পর্কে মুসলিম জনগণ স্বাভাবিকভাবেই আশংকাপরায়ণ হ'য়ে উঠেছে। তারা সন্দেহ পোষণ করে যে, সরকার যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করবেন এবং মুসলিম দাবী মেনে নেয়ায় তার বিলম্ব উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার কোনোরূপ বুনিয়াদ খুঁজে বের করার সম্ভাবনা ঢেকে রাখার আবরণ মাত্র। রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সরকারের উপর আস্থা স্থাপনের নীতি আমাদের সম্প্রদায়ের মন থেকে দ্রুতগতিতে প্রভাব হারিয়ে ফেলছে ব'লে মনে হচ্ছে। ভোটাধিকার কমিটি (Franchise Committee) নির্বাচকমন্ডলী গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারের বিবেচনা স্থগিত রেখেছেন। প্রতিশ্রুত অস্থায়ী মীমাংসার ব্যাপারে এটা সুস্পষ্ট যে, এমন কোনো অস্থায়ী অথবা স্থায়ী সাম্প্রদায়িক মীমাংসাই মুসলিম সম্প্রদায়কে খুশী করতে পারবে না, যাতে প্রকৃত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার মীমাংসার বুনিয়াদী নীতি হিসাবে স্বীকৃত না হবে।

পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতি চালু রাখার ও সীমান্ত প্রদেশকে মর্যাদাদানের প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহে দেয়া হয়েছে, কিন্তু পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, পার্লামেন্ট থেকে ভারতীয় প্রদেশসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, ফেডারেল ইউনিটসমূহের সমমর্যাদা বিধান, শাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে ফেডারেল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক তালিকায় বিভক্ত না ক'রে কেবলমাত্র ফেডারেল ও প্রাদেশিক তালিকায় বিভক্তকরণ, পাঞ্জাব ও বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার দান, সিন্ধুর বিনা শর্তে পৃথক্‌করণ এবং কেন্দ্রে এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্বের অধিকার আমাদের দাবীর কম অপরিহার্য উপাদান নয়। এইসব বিষয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার ফল হয়েছে কেবলমাত্র কংগ্রেসের সাথে যুদ্ধ ও দেশের অবশিষ্টাংশের সাথে শান্তির অভাবের বিকৃত নীতি। তা'হলে কি আমরা কংগ্রেসের সাথে বর্তমান আন্দোলনে যোগদান করবো? আমার দ্বিধাহীন জওয়াব হচ্ছেঃ 'না'। এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহের সযত্ন পর্যালোচনায় ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

আমার মনে হয়, এই আন্দোলনের মূল রয়েছে ভীতি ও অসন্তোষের মধ্যে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দাবী করেন যে, তাঁরাই ভারতীয় জাতিসমূহের একমাত্র প্রতিনিধি। বিগত গোল টেবিল বৈঠকে

এটা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা তা নন। এতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা জানেন যে, বৃটিশ জাতি ও বাকী দুনিয়া এখন ভারতের সাম্প্রদায়িক মীমাংসার গুরুত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে। তাঁরা আরো জানেন যে, ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ এক চুক্তি সম্পাদন ক'রে ফেলেছে এবং ভারতীয়রা নিজেরা কোনো মীমাংসায় পৌছতে না পারলে বৃটিশ তাঁদের নিজস্ব অস্থায়ী মীমাংসা ব্যবস্থা চালু করবেন ব'লে নোটিশ দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভয় করেন যে, বৃটিশ সরকার তাঁদের অস্থায়ী ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের দাবী মেনে নিতে পারেন। সুতরাং উপরোক্ত চুক্তি আগামী শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হোতে পারে, এই আশংকা ক'রে তাঁরা চুক্তিটিকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে প্রকৃতপক্ষে ভিত্তিহীন একটি দাবী তু'লে ধরার জন্যও কেবলমাত্র কংগ্রেসের সাথে সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মীমাংসায় পৌছতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য বর্তমান আন্দোলন শুরু করেছেন। কংগ্রেসের যে প্রস্তাব অনুসরণ ক'রে আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Campaign) শুরু করা হয়েছে,তা'তে এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে যে, যেহেতু সরকার মহাত্মা গান্ধীকে দেশের একমাত্র প্রতিনিধি (sole representative) ব'লে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তাই কংগ্রেস আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত করেছেন। যে আন্দোলন যেমন সরকারের বিরুদ্ধে, তেমনি সংখ্যালঘুদেরও বিরুদ্ধে চালিত হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি ক'রে তা'তে যোগদান করে? .

সুতরাং সহজ কথায় এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সাথে বর্তমান আন্দোলনে যোগদানের প্রশ্ন মোটেই উঠতে পারে না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এই মুহূর্তে আপনাদের একটি জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমাদের সম্প্রদায়ের বর্তামান মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আপনারা পূর্ণ অবহিত আছেন। মুসলিম দাবীর স্বীকৃতি দানে সরকারের বিলম্ব এবং সীমান্ত প্রদেশে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রাক্কালে আমাদের সাহসী সীমান্তবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি তাদের আচরণ বৃটিশ পদ্ধতি সম্পর্কে ভারতীয় মুসলিমকে সন্দিগ্ধ ক'রে তুলেছে এবং ইতিমধ্যেই অধিকাংশ লোক প্রশ্ন তুলেছেনঃ ভারতের একটি তৃতীয় পক্ষের (third party) ক্ষমতা ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে শত্রুভাবাপন্ন ও অর্থনীতিক্ষেত্রে শোষণ-প্রবণতাসম্পন্ন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে মুসলিম সংখ্যালঘুদের পক্ষে প্রকৃত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে পারবে কি-না। আর একটি গভীরতর কারণও রয়েছে ব'লে মনে হয়। ঘটনাপ্রবাহের দ্রুতগতি এবং কখনো কখনো রাজনৈতিক দুনিয়ার পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন কোনো সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রকে (Imperial Democracy). বিশেষ ক'রে দলীয় সরকারকে কানো সুনির্দিষ্ট নীতি মেনে চল্‌তে দেয় না। যে কোনো আধুনিক রাজনীতিকের মধ্যে কল্পনাশক্তির অভাব দোষ না হ'য়ে গুণ ব'লে গণ্য হচ্ছে। এই কল্পনাশক্তির অভাব স্থায়িত্ব বিধান ও কোনো উচ্চতর রাজনৈতিক ধারণার দিকে পরিবর্তন সাধন করতে অসমর্থ ব'লেই আধুনিক রাজনীতি কোনো রকমে বেঁচে থাক্‌তে বাধ্য

হচ্ছে। সুতরাং ভারতের মতো একটি পরাধীন দেশের ক্ষেত্রে সহযোগী সম্প্রদায়সমূহ স্বাভাবিকভাবে ভাবতে বাধ্য হয় যে, ইংল্যান্ডে যে সব রাজনৈতিক দল যে কোনো সময়ে ক্ষমতায় আসীন হোতে পারে, তাদের দৃষ্টিতে জটিল পরিস্থিতির সময়ে সরকারের পক্ষে তাদের রাজনৈতিক মনোভাবের দৃঢ়তা স্বল্পমূল্য বা মূল্যহীন বিবেচিত হোতে পারে। ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক দলসমুহের প্রকৃতি ও আদর্শ যা–ই হোক, আপনাদের নীতির বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে জ্ঞানদীপ্ত আত্মহিতের (enlightened self-interest) উপর এবং এমন একটা মনোভাব নিয়ে তা পরিকল্পনা করতে হবে, যা সমগ্র বৃটিশ জাতির মনে দাগ কাটতে পারে। যে সংগ্রামে বিজয়ের ফল আমাদের ন্যায়সংগত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি শত্রুতাপোষণকারী অথবা সহানুভূতিহীন লোকদের হাতে চ'লে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমন কোনো সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ। বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছে যে, আমাদের সামনে উপস্থিত অব্যবহিত জটিলতা অতিক্রম ক'রে যেতে হোলে আপনাদেরকে দেখতে হবে, আমি যে সম্ভাবনার আশংকা করছি, কি ক'রে তা' বিদূরিত করা যায় এবং আপনারা যে কার্যক্রম অবলম্বনের মন্ত্রণা দান করবেন, তার ফল কি ক'রে আপনাদের সম্প্রদায়ের কল্যাণে আসে।

আমি এখন যথাসম্ভব সহজভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছি। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসে একটা পারস্পরিক মীমাংসায় পৌঁছতে না পারলে সে ক্ষেত্রে এদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ একটি অস্থায়ী সিদ্ধান্ত দান করবে, এইমর্মে প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারতের বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী তৃতীয় দল হিসাবে বৃটিশের দাবী ও নীতির সাথে এ প্রস্তাবটি পূরোপূরি সামঞ্জস্যযুক্ত। অবশ্য বৃটিশ সরকারের বর্তমান মনোভাব থেকে দেখা যাবে যে, ভারতে তারা নিরপেক্ষ ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করতে চাচ্ছে না এবং তারা পরোক্ষভাবে ভারতীয় সম্প্রদায়সমূহকে–প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে–এক ধরনের গৃহযুদ্ধের (civil war) দিকে চালিত করছে। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাথে বোঝাপড়া ক'রে দেখেছি যে, তারা সেই সব রক্ষাকবচ স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, যার দাবী আমরা পরিত্যাগ করতে পারি কেবলমাত্র নিজস্ব ধারায় জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য দৃঢ় সংকল্প জাতি হিসাবে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবার বিনিময়ে। এর বিকল্প পন্থা হচ্ছে বৃটিশ জাতির কাছ থেকে বিচারের প্রত্যাশা করা। আমি আগেই বলেছি, মুসলিমদের কাছ থেকে দেশটির আধিপত্য হস্তগত করার পর থেকে বরাবরই বৃটিশ জাতি ভারতে নিরপেক্ষ ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করবার দাবী করে এসেছে। তাদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে, বৃটিশ জাতির প্রাচীন সাহস ও স্পষ্টবাদিতার স্থান দখল করেছে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল নীতি, যা' মানুষের মনে আস্থা জাগাতে পারে না এবং মনে হয় যে, তাদের এই নীতি কেবলমাত্র ভারতে তাদের নিজস্ব মর্যাদা সহজ

করারই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। মুসলিম সম্প্রদায় আজ এই প্রশ্নের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাদের যে বর্তমান নীতি এ যাবত বৃটিশ তরফের অসুবিধাকে স্পষ্ট করে তুলেছে এবং সম্প্রদায় হিসাবে তাদেরকে লাভবান করেনি, তা' আরো কিছুকালের জন্য চালিয়ে যাওয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূল হবে কি-না। প্রকাশ্য সম্মেলনেই এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত হবে। বর্তমান পর্যায়ে আমি কেবল এইটুকুই বল্‌তে পারি যে, যদি আপনারা এই নীতি অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত করেন, তা' হোলে আপনাদের অব্যবহিত কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র জাতিকে সেই ধরনের আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করা, যা ব্যতীত কোনো আত্মসম্ভ্রমশীল জাতি সম্মানিত জীবন যাপন করতে পারে না। ভারতীয় মুসলিমদের ইতিহাসে সর্বাধিক সংকটময় মুর্হূত আজ সমাগত হয়েছে। আপনারা হয় আপনাদের কর্তব্য পালন কর্‌বেন, নইলে আপনাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তহবে।

ভদ্রমন্ডলী, এখন আমি আপনাদেরকে মুহূর্তের জন্য ভারতীয় মুসলিমদের পক্ষে দ'ুটি অত্যধিক উদ্বেগজনক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করবো। আমি সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরের কথা বলছি। এই দু'টি বিষয় নিঃসন্দেহে সবচাইতে বেশী ক'রে আপনাদের মনে জাগছে।

এটা বাস্তবিকই আনন্দদায়ক যে, সরকার অন্ততঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের দাবী মেনে নিয়েছেন, যদিও উক্ত প্রদেশের শাসন পরিচালনার বাস্তব ক্ষেত্রে এই মর্যাদা কতোটা কার্যকরী হবে, তা' আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয় হয়ে রয়েছে। সংবাদপত্রের খবরে দেখা যায় যে, ভোটাধিকারের (franchise) ব্যাপারে সরকারী বিধিসমূহ (Government rules) অন্যান্য প্রদেশের চাইতে অধিকতর উদার হয়েছে। জানা গেছে যে, আগামী মাস থেকে সংস্কার ব্যবস্থা পূরোপুরি কার্যকরকরণ শুরু হবে। অবশ্য, সম্পূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই যে, একই সময়ে এমন দমনমূলক অভিযান শুরু করা হয়েছে, যাকে অপরিহার্যরূপে সামরিক আইন (martial law) থেকে আলাদা কিছু বলা যায় না। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেটুকু বিবেচনার পরিচয় দেয়া হয়েছে, শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোরতা ও অদূরদর্শিতা দ্বারা তা' বিনষ্ট করার চাইতেও বেশী কিছু করা হয়েছে (more than neutralised)। দেশের উপরিউক্ত অংশের কতক লোকের চরমপন্থী কার্যকলাপ (extremist activities) প্রতিরোধের যুক্তি সরকারের থাকতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে তারা পাইকারী দমননীতির (wholesale repression) পক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারেননি। ভারতের অপরাপর অংশে এই সংগ্রামের আমলে পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটেনের অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সংযমবর্জিত হয়নি। একমাত্র সীমান্ত প্রদেশেই এই দমননীতি সুসভ্য সরকারের পক্ষে অশোভনরূপ পরিগ্রহণ করেছে। মৌখিক খবরগুলো যদি সত্যি হ'য়ে

থাকে, তা'হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য বহু গুণে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হচ্ছে সীমান্ত প্রদেশে প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন অপেক্ষা উক্ত প্রদেশের বৃটিশ কর্মচারীদের অন্তরের সংস্কার সাধন। গ্রেফতারী ও মামলা দায়ের সংখ্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত খবর পাওয়া যায়নি; কিন্তু সংবাদপত্রে মোটামুটি খবর পাওয়া গেছে যে, হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দন্ডাদেশ বা অন্তরীণাদেশ দেওয়া হয়েছে। সুবিধাদান (concession) ও নির্যাতনের (repression) অসামঞ্জস্যমূলক নীতির ফলে আফগানদের মতো গর্বিত জাতিকে শান্ত ক'রে রাখা যাবে কি–না, তা' সরকারেরই বিবেচ্য। আবদুল গফ্ফার খানের তরুণ সীমান্ত আফগানদের উপর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু এই বর্তমান অবিবেচনাপ্রসূত নির্যাতন নীতিই উক্ত এলাকার সুদূর সীমান্তে ও সীমান্ত পল্লীসমূহের অজ্ঞ সাধারণ মানুষদের উপর তাঁর প্রভাব সম্প্রসারিত করছে। সরকার এই ব্যাপারটি সম্পর্কে অনবহিত থাক্তে পারেন না যে, বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে ভারতীয় মুসলিমদের সর্বভারতীয় নীতিই উক্ত প্রদেশের মুসলিমদের মধ্যে কংগ্রেসের সাথে বিনা শর্তে মৈত্রী স্থাপনের সমর্থকদের সাথে হাত মিলাবার প্রবণতা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করছেঃ সম্ভবতঃ সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কিছু অসুবিধার অস্তিত্ব রয়েছে; তা' সত্ত্বেও আমি মনে করি, শাসন সংক্রান্ত কার্যকলাপ খানিকটা স্বতন্ত্রভাবে চালনা করলে সম্পূর্ণ পরিস্থিতির সমাধান হোতে পারতো। মনে হয়, শৈথিল্য নীতি (policy of relaxation) চালু থাকার আমলে সীমান্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটার সুযোগ দেয়া হয়েছিলো, এবং যখন রোগের প্রকৃত প্রতিষেধক নির্ধারিত হ'য়ে গেছে, ঠিক সেই সময়েই নির্যাতনমূলক পন্থায় তার প্রতিকার– চেষ্টা করা হয়েছে। সরকার যতো শিগ্‌গির এই প্রদেশ থেকে সর্বপ্রকার নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন, প্রদেশের ও সরকারের নিজের পক্ষে ততোই মঙ্গল। পরিস্থিতি ভারতের সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে এবং সরকারের তরফ থেকে এ সম্পর্কে মুসলিমদের এ অনুভূতি দূর করার চেষ্টা না করা সুবুদ্ধির কাজ হবে না।

কাশ্মীরের কথা বলতে গেলে সেখানকার সাম্প্রতিক ঘটনা–প্রবাহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করার প্রয়োজন আমার নেই। যে জাতির মধ্যে আত্মচেতনার অগ্নিশিখা (ego-flame) প্রায় নির্বাপিত হ'য়ে গিয়েছিলো, তাদের স্পষ্টতঃ আকস্মিক পুনর্জাগরণ তার সংশ্লিষ্ট অপরিহার্য দুর্ভোগ সত্ত্বেও আধুনিক এশিয়ার জাতিসমূহের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সকল ব্যক্তির কাছেই বিশেষ উল্লাসের কারণ হবে। কাশ্মীরের জনগণের দাবী সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়সংগত এবং এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ যে, এম্নি একটি বুদ্ধিমান ও কর্মনিপুণ জাতির মধ্যে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে অনুভূতির পুনর্জন্ম পরিণামে কেবল এই রাজ্যের অধিবাসীদেরই নয়; বরং, সমগ্রভাবে ভারতীয় জনগণের জন্য একটি শক্তির উৎস ব'লে প্রমাণিত হবে। অবশ্য সবচাইতে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক

বিদ্বেষের মনোভাব এবং কাশ্মীরী ভাইদের জন্য ভারতীয় মুসলিমদের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সহানুভূতি হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের পাল্টা আন্দোলনের (counter agitation) সৃষ্টি করেছে। তারা হাতাশার বশবর্তী হ'য়ে এর ফলস্বরূপ প্যান-ইসলামী চক্রান্ত ও কাশ্মীরে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের ন্যায় অবাস্তব কল্পনা আরোপ করতে চায়। এই ধরনের আন্দোলন ও তা' দিয়ে কাশ্মীর প্রশ্নকে সাম্প্রদায়িক রূপদানের ফলে একটিমাত্র পরিণতি সৃষ্টি হোতে পারে-তা'হচ্ছে হিংসাত্মক দমননীতি অবলম্বন ও তার ফলে রাজ্যে দীর্ঘবিলম্বিত (prolonged) অরাজকতা সৃষ্টি। সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় যে, জম্মু প্রদেশের কোনো কোনো অংশে শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে এবং কেবলমাত্র বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতিই তাদের অবস্থান স্থলসমূহে পরিস্থিতি আয়ত্তে রেখেছে। রাজ্য কর্তৃপক্ষের সর্বাধিক হিংসাত্মক ও লজ্জাজনক নির্যাতনের মৌখিক খবর এখনো এসে পৌঁছছে। এরূপ পরিস্থিতিতে কোনো তদন্ত কমিশনও কিছুমাত্র কাজে আসতে পারে না। মিড্‌ল্‌টন রিপোর্টে যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ স্বীকার করা হয়েছে, অথচ তা' থেকে কোনো ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত করা হয়নি, তার ফলে তা' মুসলিম জনগণকে খুশী করতে পারেনি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, যে পর্যায়ে তদন্ত দ্বারা কার্যকর ফল লাভ করা যায়, ব্যাপারটি সে পর্যায় অতিক্রম ক'রে গেছে। যে শাসন ব্যবস্থা দ্বারা মানুষ চালিত হয়, সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আত্মসচেতনতা বোধ তা'তে তাদের ক্রমাগত অধিকতর অংশগ্রহণের আকাঙক্ষার মাধ্যমে স্বীকৃতি দাবী করছে। রাজনৈতিক রক্ষণ-ব্যবস্থা (political tutalage) আদিম মানুষের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু যখন কোনো পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি গতিশীল সংস্কার-ব্যবস্থা (radical reform) দাবী করে তখন তা' এড়িয়ে যাওয়া শাসনকর্তৃপক্ষেরই স্বার্থের অনুকূল হয়। সম্ভবতঃ কাশ্মীরের বিচিত্র অবস্থায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার ফলেই সেখানকার অধিবাসীরা কোনো প্রকার জনপ্রিয় পরিষদ (popular assembly) কায়েম করার দাবী করছে। আমরা আশা করবো যে, রাজ্যের শাসক ও ভারত সরকার যথাসম্ভব অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গিতে জনগণের দাবী বিবেচনা করবেন। আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, নয়া প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ জাতির স্বভাবসুলভ শাসন সংক্রান্ত সূক্ষ্মদর্শিতা সহকারে বিষয়টির অভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করবেন এবং একটি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন অথচ অবহেলিত জাতিকে কর্মতৎপরতার সুযোগ দান করবেন-যে জাতি একদা প্রাচীন ভারতের কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছে এবং পরবর্তী আমলে মোগল সংস্কৃতির প্রকৃত জৌলুস বাড়িয়েছে। আমাদের নিজ দেশের মতো কাশ্মীরে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে অসুবিধা থাকতে পারে; কিন্তু স্থায়ী শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য এসব অসুবিধা দ্রুত অতিক্রম করতে হবেই। বর্তমান বিশৃংখলার তাৎপর্য যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করা না হয় এবং তার কারণ যদি এমন সব দিকে খুঁজে বেড়ানো হয়, যেখানে তার সন্ধান মিলবে না, তা'হোলে কাশ্মীর সরকার রাজ্যের পরিস্থিতি আরো জটিল ক'রে তুলবে ব'লে আমার ভয় হয়।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, আমাদের দাবী সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মনোভাব এবং সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরের পরিস্থিতির গুরুত্ব আমাদের অব্যবহিত মনোযোগ আকর্ষণ করছে। কিন্তু কোন ব্যাপারটি আমাদের অব্যবহিত মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেটাই আমাদের একমাত্র উদ্বেগের বিষয় নয়। যে সব শক্তি নীরবে ভবিষ্যতকে রূপায়ণ করছে, তার সুস্পষ্ট অনুভূতি আমাদের লাভ করতে হবে এবং দেশের ঘটনা প্রবাহের সম্ভাব্য দিক বিবেচনায় জাতির সামনে তৎসংক্রান্ত স্থায়ী কর্মসূচী তু'লে ধরতে হবে। ভারতের বর্তমান সংগ্রামকে কখনো কখনো বলা হয় পশ্চিমের বিরুদ্ধে ভারতের বিদ্রোহ। এটাকে পশ্চিমের বিদ্রোহ ব'লে আমি মনে করি না; কারণ, পাশ্চাত্য দেশসমূহ যে সব বিধানের সমর্থক, ভারতীয় জনগণ সেই বিধানই দাবী করছে। যে চাষীর দেশের পক্ষে আধুনিক গণতন্ত্রের আর্থিক মিতব্যয় (money-economy) সম্পূর্ণ অবোধ্য, নির্বাচনী জুয়াখেলা (gamble of election) দলীয় নেতৃবৃন্দের অনুচরবর্গ (retinues of party leaders) ও পার্লামেন্টের শূন্যগর্ভ সমারোহ (hollow pageants of parliaments) তার উপযোগী হবে কি–না, তা' সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন। ভারতের শিক্ষিত শহুরে এলাকা গণতন্ত্রের দাবী করে। সংখ্যালঘু দলসমূহ নিজদেরকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ইউনিট মনে ক'রে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার ভয়ে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের দাবী করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সুস্পষ্ট কারণে তা' মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি সংগত কাল্পনিক মতানুযায়ী নির্ভুল অথচ ভারতীয় অবস্থা বিবেচনায় মিথ্যা প্রমাণিত জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস পোষণের ভান করছে। সুতরাং ভারতের বর্তমান সংগ্রামে প্রকৃত পক্ষ (real parties) ইংল্যান্ড ও ভারত নয়; বরং, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ– যে সংখ্যালঘুরা পশ্চিমী গণতন্ত্রের নীতি ততোক্ষণ পর্যন্ত মেনে নিতে পারে না, যতোক্ষণ না ভারতের বাস্তব জীবনের অবস্থার উপযোগী ক'রে তাকে সঠিকভাবে সংশোধন করা হয়।

মনস্তাত্ত্বিক ধারণা অনুযায়ী, মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক পদ্ধতিও বিদ্রোহের সমর্থক নয়। দুই বিরোধী ধারার বিশ্বচেতনার (world consiouness) সংযোগে এই পদ্ধতির উদ্ভব। পাশ্চাত্য মানুষের মানসিক গঠন (mantal texture) প্রকৃতির দিক দিয়ে সময়ানুক্রমিক (chronological)। সে বেঁচে থাকে ও আবর্তিত হয় এবং তার সত্তা সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রাচ্য মানুষের বিশ্ব– চেতনা হচ্ছে অনৈতিহাসিক (non-historical)। পাশ্চাত্য মানুষের দৃষ্টিতে বস্তু ক্রমাগত রূপলাভ করে, তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত রয়েছে। প্রাচ্য মানুষের দৃষ্টিতে তারা অব্যবহিতভাবে নিছক বর্তমানের সীমায় আবদ্ধ। সেই কারণে ইসলাম কালের গতিধারাকে (time movement) বাস্তবতার প্রতীক (symbol of reality) হিসাবে দেখে ব'লেই এশিয়ার স্থবির বিশ্ব–চিত্রের মধ্যে সে প্রবেশ করেছে

অনধিকার প্রবেশকারীর (intruder) মতো। অন্যতম পাশ্চাত্য জাতি হিসাবে বৃটিশ জাতি ভারতের রাজনৈতিক সংস্কার–ব্যবস্থাকে ক্রমবিবর্তনের একটি সুব্যবস্থিত ধারা হিসাবে কল্পনা না ক'রে পারে না। প্রাচ্য মানুষ হিসাবে মহাত্মা গান্ধী এই মনোভাবের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিকূল ধারণাজাত (illconceived) অনিচ্ছার বেশী কিছু দেখতে পান না এবং তিনি অব্যবহিত প্রাপ্তির জন্য সর্বপ্রকার ধ্বংসাত্মক অস্বীকৃতির (destructive negations) পন্থা যাচাই করছেন। উভয়ই মৌলিক দিক দিয়ে পরস্পরকে উপলব্ধি করতে অক্ষম। এর ফলেই হচ্ছেবিদ্রোহেররূপায়ণ।

এইসব ব্যাপার অবশ্য একটি আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস মাত্র এবং সমগ্র ভারত ও এশিয়ার অবশিষ্টাংশের উপর দিয়ে তেমনি একটা ঝড় ব'য়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ হচ্ছে একটি সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, যে সভ্যতা মানুষকে দেখেছে শোষণ করার মতো বস্তু (thing) হিসাবে, নিছক সাংস্কৃতিক শক্তি (purely cultural forces) দ্বারা বিকাশ সাধন ও বৃহত্তর রূপ দানের মতো ব্যক্তিত্ব (personality); হিসাবে নয়। পাশ্চাত্য যে উপার্জনেচ্ছু অর্থনীতি (acquisitive economy) গড়ে তুলে প্রাচ্য জাতিসমূহের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে এশিয়ার জাতিসমূহ বিদ্রোহ করতে বাধ্য। এশিয়া আনুসংগিক অব্যবস্থিত ব্যক্তিগত স্বার্থবাদ (undisciplined individualism) –সহ আধুনিক পাশ্চাত্য পুঁজিবাদকে উপলব্ধি করে উঠতে পারে না। আপনারা যে ধর্মের অনুসারী তাতে ব্যক্তির মুল্য স্বীকৃত হয় এবং তাকে শৃংখলায় আনা হয় তার সর্বস্ব আল্লাহ্ ও মানুষের সেবা বিলিয়ে দেবার জন্য। তার সম্ভাবনা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। সে ধর্ম (ইস্‌লাম) এখনো এমন এক নতুন দুনিয়া গড়ে তুলতে পারে, যেখানে মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হবে না তার জাতি, বর্ণ অথবা অর্জিত সম্পদ দ্বারা; বরং তা' নির্ধারিত হবে তার জীবনের ধরন দ্বারা; যেখানে মানব–সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে উদরের, সাম্যের উপর নয়; বরং, আত্মার সাম্যের উপর; যেখানে একজন অচ্ছুৎ (untouchable) বিবাহ করতে পারবে বাদশার কন্যাকে; যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা হবে একটি আমানত এবং যেখানে প্রকৃত সম্পদ উৎপাদনকারীদের উপর আধিপত্য করার জন্য পুঁজি (capital) জমা করার অধিকার দেওয়া হবে না। আপনাদের ধর্মের এই অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শবাদকে (superb idealism) অবশ্য মুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে ধর্মবাদী (theologians) ও বিধানকর্তাদের (legisws) মধ্যযুগীয় খেয়ালের কবল থেকে। আত্মিক দিক দিয়ে আমরা বাস করছি চিন্তা ও আবেগের কয়েদখানায়, যে কয়েদখানা আমরা কয়েক শতাব্দী ধ'রে গ'ড়ে তুলেছি আমাদেরই চারপাশে। আমরা– যারা বার্ধক্যের পর্যায়ে এসেছি, তাদের পক্ষে আরো লজ্জার কথা, আমাদের বর্তমান যুগে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও এমনকি, ধর্মীয় সংকট আসবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, তার জন্য আমরা আমাদের তরুণ সমাজকে তৈরী ক'রে তুলতে পারিনি। সমগ্র জাতির বর্তমান মানসিকতা

গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে জাতি পুনরায় নতুন আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রেরণা অনুভব করার সামর্থ্য লাভ করতে পারে। ভারতীয় মুসলিম দীর্ঘকাল ধরে তার নিজের আত্মিক জীবনের গভীরে দৃষ্টিক্ষেপ করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছে। তার ফলে জীবনের পূর্ণ দীপ্তি ও জৌলুস নিয়ে সে বাঁচতে পারছে না; বরং, পরিণামে সে এমন সব শক্তির সাথে অমানুযোচিত আপোষ করার বিপদ–সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে, যে শক্তিকে প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরাজিত করা তার সাধ্যাতীত বলে তাকে ভাবতে বাধ্য করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি কোনো অবাঞ্ছিত পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে অবশ্যই তার অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণ নবরূপায়ণ করতে হবে। সুনির্দিষ্ট আদর্শের আলোকে যতোক্ষণ না কোনো জাতি তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রকে ক্রমাগত প্রদীপ্ত করে তুলে তাদের নিজস্ব অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করার জন্য উদ্যমশীল হয়, ততোক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা সে জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না। ব্যক্তির নিজস্ব আত্মিক জীবনের আযাদীর উপর সুদৃঢ় ঈমান ব্যতীত কোনো কিছুই অর্জন করা যায় না। একমাত্র ঈমানই জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তার লক্ষ্যের প্রতি এবং তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে চিরন্তন দ্বিধা–দ্বন্দ্ব থেকে। অতীত অভিজ্ঞতার আনীত শিক্ষা আপনাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে। কোনো দিক থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশা করবেন না। যদি আপনাদের আশা–আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ দেখবার ইচ্ছা থাকে, তা'হোলে আপনাদের সমগ্র সত্তাকে (ego) কেবল নিজের দিকে কেন্দ্রীভূত করুন এবং আপনাদের দেহের কর্দমকে পরিপক্ক ক'রে প্রকৃত মানবতায় রূপদান করুন। মুসোলিনীর মূলমন্ত্র ছিলো ঃ যার ইস্পাত আছে, তার খোরাক আছে' (He who has steel has bread)। আমি তাকে আর একটু সংশোধন ক'রে বলতে চাই ঃ ' যে ব্যক্তি ইস্পাতের মতো শক্ত, তার সব কিছুই আছে' (He who is steel has everything)। শক্ত হউন ও কঠোর পরিশ্রম করুন। এ–ই হচ্ছে ব্যক্তিগত (individual) ও সমষ্টিগত (collective) জীবনের সম্পূর্ণ রহস্য। আমাদের আদর্শ সুনির্দিষ্ট তা' হচ্ছে শাসনতন্ত্রে ইসলামের জন্য এমন মর্যাদা অধিকার করা, যাতে এদেশে ইসলাম তার ভবিষ্যতকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবে রূপায়ণের সুযোগ পেতে পারে। এই আদর্শের আলোকে আজ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে জাতির গতিশীল শক্তিকে জাগ্রত করার ও তাদের মধ্যে এতকাল ধ'রে ঘুমন্ত উদ্যমকে সুসংহত করার। জীবনের অগ্নিশিখা অপরের কাছ থেকে ধার করা যায় না, তাকে জ্বালিয়ে তুলতে হয় ব্যক্তির আপন আত্মার মন্দিরে। এর জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতি ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থায়ী কার্যসূচী। তা'হোলে আমাদের ভবিষ্যত কার্যসূচী কি হবে? আমাদের মনে হয়, তা' হবে আংশিকভাবে রাজনৈতিক ও আংশিকভাবে সাংস্কৃতিক। আমি আপনাদের বিবেচনার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব এখানে পেশ করবো।

প্রথমতঃ আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানে যাঁরা রাজনৈতিক সংগ্রামে ভারতীয় মুসলিমদের কার্যকলাপের পথনির্দেশ করছেন ব'লে মনে করা হয়, তাঁদের রাজনৈতিক

চিন্তাধারার মধ্যে এখনো এক ধরনের বিশৃংখলা রয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য অবশ্য জাতির উপর দোষারোপ করা চলে না। দেশের যে সব ব্যাপারের সাথে পরিণামে মুসলিম জনগণের ভাগ্য জড়িত রয়েছে, তার জন্য আত্মত্যাগের মনোভাব তাদের মধ্যে মোটেই নেই। আমি যা' বলছি, সাম্প্রতিক ইতিহাস তার যথেষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে। দোষ যা' কিছু, তা' আমাদের, তাদের নয়। জাতিকে যে পথনির্দেশ দেওয়া হয়, তা' সব সময়েই স্বাধীনভাবে পরিকল্পিত নয় এবং তার ফল হচ্ছে কখনো সংকট মুহূর্তে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাঙন। এই কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংহতির জীবন ও শক্তির পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় ধরনের শৃংখলা সঠিকভাবে গ'ড়ে তুলতে পারে না। এই দোষের প্রতিকারের জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে, সমগ্র দেশব্যাপী প্রাদেশিক ও জেলা শাখাসহ ভারতীয় মুসলিমদের একটিমাত্র রাজনৈতিক সংস্থা (political organisation) থাকা প্রয়োজন। আপনারা তাকে যে কোনো নাম দিতে পারেন। অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে এই যে, তার গঠনতন্ত্র এমন হওয়া প্রয়োজন হবে, যাতে যে কোন রাজনৈতিক চিন্তাধারাসম্পন্ন দলের ক্ষমতা লাভের ও তার নিজস্ব আদর্শ ও পদ্ধতি অনুযায়ী জাতির পথনির্দেশ করার সম্ভাবনা থাকে। আমার মতে, ভারতে ইসলামের সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য ভাঙনের সম্ভাবনা রোধ করার এবং আমাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে পুনরায় সংহত ও শৃংখলানুসারী করার এ-ই হচ্ছে একমাত্র পন্থা।

দ্বিতীয়তঃ, আমি প্রস্তাব করি যে, অবিলম্বে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার অন্ততঃপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকার একটি জাতীয় তহবিল (national fund) সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে আমরা এক কঠিন সময় অতিবাহন ক'রে চলেছি, কিন্তু আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখবেন যে, ভারতের মুসলিম জনগণকে যদি বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়, তা'হোলে তারা আপনাদের ডাকে সাড়া দিতে পশ্চাৎপদ হবে না।

তৃতীয়তঃ আমি এই কেন্দ্রীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের অধীনে দেশব্যাপী তরুণ সংগঠন (Youth Leagues) ও সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (volunteer corps) গঠনের প্রস্তাব করছি। তারা বিশেষ ক'রে আত্মনিয়োগ করবে সমাজসেবা, রীতি-নীতির সংস্কার, জাতির ব্যবসায় সংক্রান্ত সংগঠন এবং শহরে ও পল্লীতে অর্থনৈতিক প্রচারের কার্যে। এই অর্থনৈতিক প্রচার বিশেষ করে করতে হবে পাঞ্জাবে, যেখানে মুসলিম কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের প্রচুর ঋণের বোঝাভূমিবিপ্লবের (agrarian upheavals) কঠোর প্রতিষেধকের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারে না। ১৯২৫ সালে চীনে যখন চাষী সংগঠন (peasant leagues) গ'ড়ে উঠেছিলো,এখানকার পরিস্থিতিও তেমনি ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে ব'লে মনে হয়। সাইমন রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, চাষী তার সম্পত্তির 'একটা বিশেষ অংশ' (a substantial portion) রাষ্ট্রকে দিয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্র তার পরিবর্তে নিঃসন্দেহে তাকে দেয় শান্তি ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও

যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু এসব আশীর্বাদ প্রাপ্তির মোট ফল দাঁড়িয়েছে কেবলমাত্র এক ধরনের বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর আদায়, যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত পণ্যদ্বারা গ্রাম্য অর্থনীতির ধ্বংসসাধন এবং উৎপন্ন ফসলকে বাণিজ্যের আওতাভুক্ত করা, যার ফলে চাষীকে প্রায় সব সময়েই মহাজন ও ব্যবসায়ী দালালদের শিকারে পরিণত হোতে হচ্ছে। বিশেষ ক'রে পাঞ্জাবে এটা একটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি আশা করি, প্রস্তাবিত তরুণ সংগঠন এ সম্পর্কে প্রচার কার্যের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং পাঞ্জাবের চাষীদেরকে বর্তমান দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে সাহায্য করবে। আমার মতে, ভারতে ইসলামের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করবে পাঞ্জাবের মুসলিম চাষীদের স্বাধীনতার উপর। জীবনের দীপ্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আমাদের ভাবী বংশধরদের কর্মের নতুন জগৎ তৈরী করার উদ্দেশ্যে ঈমানের অগ্নির সাথে মিলিত হোক্ তারুণ্যের অগ্নিশিখা। একটি সম্প্রদায় বল্‌তে কেবল নিছক বর্তমান ও গণনা করার মতো নর-নারীর একটি সমষ্টি বুঝায় না। বাস্তবিক পক্ষে জীবন্ত বাস্তব (living reality) হিসাবে তার জীবন ও কার্যকলাপকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না তার অন্তর্নিহিত সত্তার গভীরে ঘুমন্ত অজাতঅসীমতার (unborn infinity) প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না ক'রে।

চতুর্থতঃ আমি ভারতের সবগুলো বড়ো বড়ো শহরে পুরুষ ও মহিলাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্র (cultural institutes) স্থাপনের প্রস্তাব করি। এইসব শিক্ষা কেন্দ্রের রাজনীতির সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। মানব জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইসলাম ইতিমধ্যে কি কি কৃতিত্ব অর্জন করেছে এবং এখনো তার কি কি কৃতিত্ব অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনুভূতি সঞ্চার ক'রে আমাদের তরুণ সমাজের অন্তরের ঘুমন্ত উদ্যমকে সুসংহত করাই হবে তাদের প্রধান কাজ। একটি জাতিকে (community) বিচ্ছিন্ন খন্ড জীবনের সমষ্টি (heap of isolated fragments of life) হিসাবে নয়; বরং, অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতিসম্পন্ন সুনির্দিষ্ট সমগ্র হিসাবে উপলব্ধি করার ও তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করার মতো ব্যক্তিমনের বিশালতা আনয়ন করবার উপযোগী নতুন কর্তব্য পেশ করেই কেবলমাত্র একটি জাতির প্রগতিশীল দলসমূহকে (progressive forces) জাগ্রত করে তোলা যায়। একবার এই শক্তিকে জাগ্রত করা গেলে তারা আনয়ন করে নতুন সংঘাতের নব নব উদ্যম এবং সেই অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার অনুভূতি যা-ভোগ করে প্রতিরোধক্ষমতা ও ব'য়ে আনে নতুন সত্তার (new self) প্রতিশ্রুতি। এইসব শিক্ষা কেন্দ্র একক উদ্দেশ্যের অনুসারী আমাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টাসমূহের সংযোগ বিধানের উদ্দেশ্যে পুরানো ও নতুন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা ক'রে চলবে। এখনই আমি একটি প্রস্তাব আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি। অন্যবিধ রাজনৈতিক সমস্যার চাপে হার্টগ কমিটির (Hartog Committee) অন্তর্বর্তী রিপোর্ট এখন স্পষ্টতঃ সবাই ভু'লে গেছে। তা'তে

নিম্নলিখিত যে সুপারিশ করা হয়েছিলো তাকে আমি ভারতীয় মুসলিমদের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচনা করিঃ

'এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যে সব প্রদেশে ধর্মীয় অসুবিধার দরুন মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে উক্ত সম্প্রদায় যাতে শিশুদেরকে সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠায়, তার অনুরূপ ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে সরকারী ব্যবস্থা (Public System) মিতব্যয় ও যোগ্যতা–উভয় দিক দিয়ে লাভবান হবে এবং উক্ত সম্প্রদায়কে শিক্ষায় পশ্চাৎপদ অবস্থার ফলোদ্ভূত বাধা ও কলংক থেকে মুক্তি লাভে যথেষ্ট সহায়তা করা হবে।'

'আমরা পূর্ণরূপে অবহিত যে, এই ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর করা সহজসাধ্য নয় এবং অন্যান্য দেশে তা'তে যথেষ্ট বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে। ...... কিন্তু আমাদের মতে বাস্তব পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টার উপযুক্ত সময় এসে গেছে।' [২০৪–২০৫ পৃষ্ঠা]

পুনরায় বিশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কে preservation আলোচনা প্রসঙ্গে রিপোর্টের ২০৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ

'সুতরাং সরকারী পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে ও সম্ভবতঃ আগামী কিছুকালের জন্য যদি এমন বিশেষ ব্যবস্থা করা যায়, যাতে মুসলিম সম্প্রদায় জাতীয় জীবনে ও জাতীয় অগ্রগতিতে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে, তা'হোলে তা' আমাদের মতে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক অথবা সুষ্ঠু শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির সাথে অসামঞ্জস্যমূলক (inconsistent) হবে না। এরূপ কোনো বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই বলতে পারলেই আমরা খুশী হোতাম এবং আমরা আশা করি, এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা যথাসম্ভব করা হবে। শিক্ষা–ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টির কারণ হিসাবে এরূপ ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত, কিন্তু যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের বর্তমান পশ্চাৎপদ অবস্থা ও পৃথক শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানের (segregate institutions) প্রদত্ত স্বল্প সম্ভাবনায় তাদেরকে সীমাবদ্ধ রাখার বিকল্প পন্থা হিসাবে এই ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেই কারণে জাতীয় নীতির ব্যাপক যুক্তিতে উক্ত বিকল্প পন্থাকে যুক্তিসংগত ব'লে গ্রহণ করতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করছি না।'

প্রস্তাবিত শিক্ষা কেন্দ্রসমূহকে অথবা তাদের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনকে অবশ্যই দেখতে হবে, যাতে এইসব সুপারিশ কার্যে পরিণত করা হয়। কারণ, এই সুপারিশ আমাদের সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রতিবন্ধক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার ভিত্তিযুক্ত।

পঞ্চমতঃ আমি একটি ওলামা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করি। তার ভিতরে এমন সব মুসলিম আইনজীবীও থাকবেন, যাঁরা আধুনিক (modern jurisprudence) আইন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছেন। আমার ধারণা হচ্ছে ইসলামী কানুন সংরক্ষণ ও প্রয়জন হোলে আধুনিক অবস্থার আলোকে তার পুনর্ব্যাখ্যা দান এবং তার সাথে তার মৌলিক নীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখা। এই প্রতিষ্ঠানকে অবশ্য শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করতে হবে, যাতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সংক্রান্ত কোনো বিল এই পরিষদের পরীক্ষার পর্যায় অতিক্রম করার পূর্বে বিধান–সভার সম্মুখে উথাপিত হোতে না পারে। ভারতীয় মুসলিমদের জন্য নিছক বাস্তব মূল্য উপলব্ধি ছাড়াও আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আধুনিক দুনিয়ার মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের– ইসলামী আইন–সাহিত্যের অনন্ত মূল্য ও পুঁজিবাদী (capitalistic) দুনিয়ার পক্ষে তার তাৎপর্য এখনও উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে, যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার নৈতিক মান (ethical standard) দীর্ঘকাল পূর্বে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের নিয়ন্ত্রণ–সীমা অতিক্রম ক'রে গেছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার প্রস্তাবিত পরিষদ অন্ততঃ এদেশে ইসলামের স্বাভাবিক নীতির গভীরতর উপলব্ধি এনে দেবে।

।২৫।

ভোগ–বিলাসেতে তন্ময় তুমি, অসাড় এখন তোমার প্রাণ,
তুমি মুসলিম? মুসলমানের এই আদর্শ? এই বিধান?
নাইক' আলীর ত্যাগের সাধনা, নাই সম্পদ ওসমানের,
কেমন করিয়া আশা কর তবে তাদের রূহানি সংযোগের!
মুসলমানের তরেই তখন সে যুগ করত গর্ববোধ,
কুরআন ছাড়িয়া এখন হয়েছ যুগ–কলঙ্ক, হায় অবোধ!

।২৬।

তোমরা এখন হিংসা–কাতর, তাহাদের ছিল উদার মন,
ঢাকিত তাহারা এ–ওর আয়েব, তোমরা করিছি অন্বেষণ!
'সুরাইয়া' সম উর্ধ্বে উঠার দেখিছ স্বপন সুর হীন,
তার আগে কর দিল প্রস্তুত, হও মুসলিম–হও মু'মিন্।
তারা লভেছিল ইরানের তাজ– 'কাইকাউসে'র সিংহাসন,
বাক্য শুধুই সার তোমাদের–মর্যাদাহীন সব এখন!

আল্লামা ইকবাল সংসদের তরফ থেকে ইকবালের সাহিত্য সম্বন্ধে দু'জন প্রথিতযশা বাংলাদেশী কবি, সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত লিখিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে তা প্রকাশ করা হলোঃ

আবুল হোসেনের দৃষ্টিতে ইকবাল

আবুল হোসেনের জন্ম খুলনা জেলার বেলফুলিয়া দেয়াড়া গ্রামে। ১৫ই আগস্ট, ১৯২২ সালে। পিতা–এস, এম, ইসমাইল হোসেন পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। ছেলেবেলা কেটেছে কৃষ্ণনগরে, প্রথম যৌবন কলকাতায়। পড়াশোনা অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট ও কুষ্টিয়া হাই স্কুলে, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনার্স ছিলো অর্থনীতিতে, পোস্ট–গ্রাজুয়েট ক্লাসে অর্থনীতির সঙ্গে পড়েছেন সমাজবিজ্ঞান।

সারাজীবন সাহিত্য কর্ম ও চর্চায় নিমগ্ন। ছাত্র বয়সে সম্পাদক ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রবীন্দ্র পরিষদের' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও বেঙ্গলী ইনস্টিটিউট অব সোসিওলজীর গবেষণা ফেলো। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, আদমজী পুরস্কার ও বাংলা একাডেমী পুরস্কার সংক্রান্ত বিচারকমন্ডলীর সদস্য, কবিদের প্রতিষ্ঠান 'পদাবলী'র সভাপতি, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সংলাপ'–এর সম্পাদক (ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সংগে), বাংলা একাডেমীর ফেলো–এদেশের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

লেখক হিসাবে ১৯৬০ সালে বেলজিয়ামে 'বাইঅ্যানিয়েল ইন্টারন্যাশনাল অব পোয়েট্রিতে' পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬১–তে পাক–ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পাকিস্তান দলের সদস্য ও ১৯৭৩–এ আফ্রো–এশীয় লেখক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৮০–তে যুগোশ্লাভিয়ার স্ট্রুগা কবিতা উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬০ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে অতিথি–লেখক হিসাবে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। ষাটের দশকে ইকবাল একাডেমীর আমন্ত্রণে একাধিকবার করাচীতে অনুষ্ঠিত কবি ইকবালের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন।

সরকারী কর্মকর্তারূপে ১৯৭৪ সালে সিঙ্গাপুরে কলম্বো প্লান কনসালটেটিভ কনফারেন্সে বাংলাদেশ দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে কলম্বোতে আইপিপিএফের আঞ্চলিক সম্মেলনে

বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৯ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশ উলেমা দলের প্রধান কো-অর্ডিনেটর এবং ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা দলের নেতৃত্ব দেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ফিলিপিন্স, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হঙকঙ, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে একাধিকবার সভা-সম্মেলনে যোগ দেন।

অল্প বয়সেই লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং কবিতা, চতুরঙ্গ, নিরুক্ত, পূর্বাশা, দেশ, আনন্দবাজার (শারদীয় সংখ্যা), যুগান্তর (শারদীয় সংখ্যা), বুলবুল, অরণী, সওগাত, মোহাম্মদী, নবযুগ, মাস পয়লা, পাঠশালা ও রবিবার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রচুর লিখেছেন।

আমাদের সমাজে আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকৃৎ। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর কবিতার বই, নব 'বসন্ত'ই এদেশের কোন কবি বিরচিত আধুনিক কবিতার প্রথম বই। আমাদের সাহিত্যে নগরচেতনার, সফিসটিকেশনের ও বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে প্রথম অভিব্যক্তি।

লেখক জীবনের শুরুতেই আবু সয়ীদ আইয়ুব, হুমায়ুন কবির, সৈয়দ মুজতবা আলী, বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ মনীষীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। পরিচয় হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সংগে। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন; প্রবাদ প্রতীম পি. সি. ঘোষ, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারক নাথ সেন, ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও ডঃ বিনয় কুমার সরকার প্রমুখ শিক্ষাব্রতীদের। তাঁর সাহিত্য রুচি ও মানস গঠনে এঁদের অবদান অপরিসীম।

আজীবন সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত থাকলেও সরকারী চাকরি ছিলো প্রধান পেশা। দীর্ঘ ৩৬ বছরের কর্মজীবনে দেশে ও বিদেশে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় তথ্য, রেডিও, টেলিভিশন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন উচ্চ পদে যেমন জনসংযোগ, গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব পদে কাজ করে ১৯৮২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

লেখক হিসেবে এবং সরকারী কাজে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, হঙকঙ, সিঙ্গাপুর, ভারত, পাকিস্তান, যুগোশ্লাভিয়া, ফিলিপিন্স, শ্রীলংকা, হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, লাওস ও গ্রীস ভ্রমণ করেন।

লেখার জন্য দেশ এবং সমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতিও পেয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। পুরস্কৃত হয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কারে, সুন্দরবন স্বর্ণ পদকে, নাসির উদ্দীন স্বর্ণ পদকে, একুশে পদকে ও পদাবলী পুরস্কারে।

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৯টি

১. *নব বসন্ত (কাব্যগ্রন্থ) ১৯৪০,*
২. *পার্বত্য পথে (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) ১৯৪৬,*
৩. *ইকবালের কবিতা (কাব্যানুবাদ) ১৯৫২,*
৪. *জ্যাক লণ্ডনের অরণ্যের ডাক (অনুবাদ) ১৯৫৪,*
৫. *বিরস সংলাপ (কাব্যগ্রন্থ) ১৯৬৯,*
৬. *রসুল হামজাতভের 'মাই দাপেস্তানে'র (কাব্যানুবাদ) ১৯৭৮,*
৭. *হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস (কাব্যগ্রন্থ) ১৯৮২,*
৮. *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে (কাব্যগ্রন্থ) ১৯৮৫,*
9. *Selected Poems of Abul Hussain 1986*

ইকবাল প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন তা নিম্নে সন্নিবেশিত হলোঃ

প্রশ্নঃ কবি ইকবালের রচনার সঙ্গে আপনার পরিচয় কখন, কিভাবে ঘটে?

উত্তরঃ তিরিশের দশকের শেষ দিকে, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ১৯৩৮–৩৯ সালে, ইকবালের রচনার সংগে আমি প্রথম পরিচিত হই। 'বুলবুল' সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বাহার তাঁর লেখা পড়তে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন, নিজে পড়ে শোনান শেকোয়া ও জবাব–ই–শেকোয়া। বাহার সাহেব তখন ইকবালের একটি জীবনী লিখছিলেন। তাঁর অনুরোধে আমি শেকোয়া ও জবাব–ই–শেকোয়া অবলম্বন করে দুটো কবিতা লিখি। বাহার সাহেব কবিতা দুটো তাঁর 'কবি ইকবাল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন। তার কিছুদিন পরে আমি ইকবালের 'রাভী কিনারে' কবিতাটি অনুবাদ করি। সেই আমার প্রথম ইকবালের কবিতার অনুবাদ। 'বাঙ্গে দারার' এই উর্দু কবিতাটা বাহার সাহেব ও মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমানের সংগে বসে পড়েছিলাম।

প্রশ্নঃ আপনি কি উর্দু ও ফারসী জানেন? না–কি শুধু অনুবাদের মাধ্যমে ইকবালের সাথে পরিচিত হয়েছেন?

উত্তরঃ কাজ চালাবার মতো উর্দু বুঝি, ফারসী জানি না। লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমি ইকবালের উর্দু কবিতাই কেবল তরজমা করেছি। ইকবালের ফারসী কবিতা ইংরেজী অনুবাদেই পড়েছি। ইকবালের উর্দু এবং ফারসী কবিতার বাংলা অনুবাদও পড়েছি।

প্রশ্নঃ ইকবালের কোন্ কোন্ রচনার অনুবাদ আপনি পড়েছেন, অনূদিত রচনাবলীর গুণাগুণ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানাবেন কি?

উত্তরঃ ইংরেজীতে নিকলসনের 'আসরারে খুদী', আরবেরীর 'রমুযে বেখুদী', কিয়েরনানকৃত উর্দু ও ফারসী খন্ড কবিতা, আলতাফ হোসেনের 'শেকোয়া' এবং বাংলায় আশরাফ আলী খান, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আব্দুল মান্নান, ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, মনিরুদ্দীন ইউসুফ এবং আরও অনেকের অনুবাদ দেখেছি। ইংরেজীতে কিয়েরনানের অনুবাদ সবচেয়ে ভালো লেগেছে। ফররুখের অনুবাদও কবিতা হিসাবে ভালো, কিন্তু তিনি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন, তাই মূল কবিতার সৌন্দর্য তার অনুবাদে কতখানি ধরা পড়েছে বলতে পারবো না। আমি আশরাফ আলী খানের শেকোয়ার অনুবাদকে খুব ভালো মনে করি।

প্রশ্নঃ বাংলা অনুবাদক কারো সাথে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো কি? থেকে থাকলে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলুন ?

উত্তরঃ আশরাফ আলী খান ছাড়া ইকবালের প্রায় সব বাংলা অনুবাদকের সংগেই আমার কম-বেশী পরিচয় ছিলো। ফররুখ, আলী আহসান তো বন্ধুই।

প্রশ্নঃ আলতাফ হোসেন সাহেব শেকোয়ার একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, সেটি পড়া থাকলে সে সম্পর্কে আপনার মতামত জানাবেন কি ?

উত্তরঃ আলতাফ হোসেনের শেকোয়ার ইংরেজী তরজমা পড়েছি। কবিতা হিসেবে ভালো লাগেনি। ইংরেজীতে সৃজনশীল লেখায় তাঁর কোন অভিজ্ঞতা বা দখল ছিলো না। তিনি কবিতাও লিখতেন না। কবিরা ছাড়া অন্য কেউ কবিতার অনুবাদ করতে পারেন না বলছি না। তবে, ভালো কবিদের হাতেই ভালো অনুবাদ উৎরোবার সম্ভাবনা বেশী।

আমি উর্দু কবিতায় রস গ্রহণ করতে পারি। ইংরেজী অনুবাদে যেসব কবিতা পড়েছি তা আমাকে পুরোপুরি তৃপ্তি দেয় না। অবশ্যই অনুবাদের জন্য। কিন্তু, মূল ভাষা না জানলে অনুবাদ পড়া ছাড়া উপায় কি?

প্রশ্নঃ দার্শনিক হিসেবে ইকবাল ইসলাম সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা করেছিলেন, সেগুলো নিশ্চয়ই আপনার পড়া আছে? ইকবালের এ চিন্তাধারা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

উত্তরঃ ইকবালের দার্শনিকতা তো তাঁর কবিতাতেই সুস্পষ্ট। ইংরেজীতে লেখা তাঁর '*দ্য রিকনৃষ্টাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*' খুবই উল্লেখযোগ্য। ধর্মবোধ ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা যা ইকবাল দর্শনের প্রধান প্রেরণা। তাকে কাব্যের ভাষায় রূপ দেওয়ার জন্যেই ইকবাল তাঁর দার্শনিক কবিতাগুলো ফারসীতেই লিখেছেন।

প্রশ্নঃ ইকবাল প্রথম জীবনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি বেশী করে ইসলামের কথাই বলেছেন, এর ফলে কি ইকবালের কাব্য বা চিন্তাধারায় কোন দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়?

উত্তরঃ সব বড় লেখকের মধ্যেই নানা ধরনের চিন্তা–ভাবনা কাজ করে। সময়, পরিবেশ, পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। যারা চিন্তা–ভাবনা করেন তারা কেউ এক জায়গায় বসে থাকেন না। স্রোতস্বিনী নদীর মতোই জীবনও বহমান। সে কখনও সরল রেখায় চলে না। কোথায়ও তার ধারা ক্ষীণ, কোথাও স্ফীত, কোথাও সরল, কোথাও বাঁকা। এই বিভিন্নমুখিতাই জীবনকে বৈচিত্র্যও দেয়। জীবনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এর মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব দেখি না, বরং; সেগুলো পরস্পরের পরিপূরক।

প্রশ্নঃ ইকবালের শেষ জীবনের চিন্তাধারায় কোন সংকীর্ণতা স্পষ্ট হয়েছিল কি ? না–কি তিনি ইসলামের মাধ্যমেই মানবতাবাদকে তুলে ধরেছেন?

উত্তরঃ ইকবালের চিন্তাধারায় আমি কোন সংকীর্ণতা দেখিনি। তাঁর কবিতার একটা বড় অংশের (বিশেষ করে ফারসী কবিতার) প্রধান বিষয় আত্মার স্বরূপ ও বিকাশ এবং ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও স্বীকৃতি।

প্রশ্নঃ আপনি যখন কোলকাতা ছিলেন তখন বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ইকবাল চর্চা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করবেন কি ?

উত্তরঃ সেকালে কোলকাতার কবি অমিয় চক্রবর্তী, কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রাবন্ধিক বসুধা চক্রবর্তীকে ইকবালের রচনা সম্পর্কে খুবই আগ্রহী দেখেছিলাম। কিন্তু তখন ইকবাল সম্পর্কে বাংলায় কেউ তেমন উৎসাহ নিয়ে কাজ করেননি।

প্রশ্নঃ পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে ইকবাল একাডেমীর ভূমিকা কি ছিল? এতদঞ্চলে ইকবাল চর্চার পূর্বাপর সম্বন্ধে কিছু বলুন ?

উত্তরঃ ঐ একাডেমী কোন কিছু কাজ করেছিলো বলে আমি জানি না। ওটি সম্ভবত একটি ব্যক্তিসর্বস্ব নামেই–সীমাবদ্ধ সংস্থা ছিলো, যার নামও লোকে জানতো না।

প্রশ্নঃ ইকবালের কাব্য থেকে বর্তমানে বাংলাদেশের কবি–সাহিত্যিক কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন ?

উত্তরঃ লিরিকের তাৎক্ষণিকতা ও ভঙ্গুরতা ছেড়ে ইকবাল দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতায় ধ্রুপদী দাঢ্যের অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর শেষ জীবনের কবিতায় এক বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, ধ্যানী মিস্টিকের

দেখা পাওয়া যায়। আমরা তো বাংলায় দীর্ঘ কবিতা, বর্ণনামূলক কবিতা লেখা ভুলেই গেছি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে মিস্টিসিজম ছিলো সে পথে আর কেউ পা বাড়াননি। আমার মনে হয়, বাঙ্গালী কবিরা এসব দিকে অগ্রসর হলে আমাদের কবিতা আরও সমৃদ্ধ হবে।

প্রশ্নঃ ইকবাল সম্বন্ধীয় আপনার রচনাবলী ও অনুবাদের ফিরিস্তি জানাবেন কি ?

উত্তরঃ ইকবাল সম্বন্ধে বাংলায় আমার কোন প্রবন্ধ নেই। ইংরেজীতে ষাটের দশকে করাচীতে ইকবালের মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনটি বক্তৃতা করেছিলাম– 1. Impact of Iqbal on Bangali Muslim Thought. 2. Iqbal as an Artist 3. Translations of Iqbal in Bangali.

ইকবালের অনেকগুলি খন্ড কবিতা তর্জমা করেছি বিভিন্ন সময়ে। সেগুলি সব ছাপা হয়েছিলো '৫০–৬০ ও '৭০–এর দশকে। আমার কাছে কপি নেই। লেখার কপি রাখার অভ্যাস আমার কোন দিনই ছিলো না। কিছু কবিতার নাম মনে পড়ছে, যেমনঃ

১. *তোশামোদী*, ২. *বিদ্রোহী মুরীদ*, ৩. *আবিসিনিয়া*, ৪. *পুত্র জাভেদকে*, ৫. *উপদেশ*, ৬. *সভ্যতার খপ্পরে*, ৭. *প্যারিস মসজিদ*, ৮. *শেষ কথা*, ৯. *একটি প্রশ্ন*, *কোন যুবকের প্রতি*, ১১. *বাজ*, ১২. *পাঞ্জাবের কৃষকদের প্রতি*, ১৩. *খোদার দুনিয়া*, ১৪. *মোল্লা ও বেহেশ্‌ত*, ১৫. *সৌন্দর্য্য তত্ত্ব*, ১৬. *ইউরোপ ও সিরিয়া*, ১৭. *নেতা কাহিনী*, ১৮. *রাভী তীরে*, ১৯. *তোমরা ও আমরা।*

শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম

সুলতান–এর '*শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার*' কাব্যানুবাদ পড়লাম আসল শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের অপূর্ব সৃষ্টি এই '*শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া।*' উর্দুভাষী ভারতবাসীর মুখে মুখে আজ '*শেকওয়ার*' বাণী। সেই বাণীকে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত দুরূহ মনে করেই আমিও এতে হাত দিতে সাহস করিনি। কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বিস্মিত হলাম, অরিজিন্যাল ভাবকে এতটুকু ব্যতিক্রম না করে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ গতি–ভঙ্গী দেখে, পশ্চিমের বোরকা পরা মেয়েকে বাঙলার শাড়ির অবগুন্ঠনে যেন আরো বেশী মানিয়েছে।

ইতি

নজরুল্ ইস্‌লাম।

১৫ই ভাদ্র, ১৩৪৩।

ইকবাল প্রসঙ্গ ঃ তালিম হোসেন-এর মুখোমুখি

তালিম হোসেন। জন্ম ১৯১৮ (বাংলা ১৩২৫)। সাবেক রাজশাহী জেলা, বর্তমান নওগাঁ জেলার চাকরাইল গ্রামে। বাবা–মরহুম তৈয়ব উদ্দীন চৌধুরী। মা–মরহুমা গুলজার উন্নিসা চৌধুরানী। শিক্ষা–বাংলা অনার্সসহ বি.এ।

১৯৪৮ সালে ভারত বিভক্তির আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মওলানা মোহাম্মাদ আকরাম খাঁর 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। বিভাগোত্তরকালে ঢাকায় মোহাম্মাদ মোদাব্বের–এর সম্পাদনায় দৈনিক মিল্লাত প্রকাশিত হলে তার সাহিত্য সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন। পাকিস্তান সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'মাহে–নও'–এর সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক পদে দীর্ঘদিন কাজ করেন এবং একই অফিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন বাংলাদেশ আমলে ১৯৭৭ সালে। কিশোর বয়সে ছাত্রজীবনেই উপমহাদেশের মুসলিম রেনেসাঁস এবং পরবর্তী পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শগত রাজনৈতিক ভাবচিন্তার সঙ্গে জড়িত হন। এজন্য তাঁর সাহিত্য–কর্ম তাঁকে প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান রেনেসাঁস আন্দোলনের কবি

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. *দিশারী(কাব্যগ্রন্থ)*
২. *শাহীন(কাব্যগ্রন্থ)*
৩. *ইসলামী কবিতা (সংকলন)*
৪. *নূহের জাহাজ (কাব্যগ্রন্থ)*
৫. *স্বর্গচারণ (অনুবাদ) জন স্টাইবেকের উপন্যাস।*
৬. *এন্ড্রু কার্নেগী (") জীবনী*
৭. *ধাইকিড়ি ধাই কি (শিশুদের ছড়া ও কবিতা)*

তাঁর অপ্রকাশিত বহু কবিতা, গান, ব্যঙ্গ কবিতা, অনুবাদ, প্রবন্ধ, ছোট গল্প, এবং শিশু ও কিশোর পাঠ্য বইয়ের পান্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

সাংস্কৃতিককর্মজীবন

পাঠ্যজীবনে জন্মস্থান চাকরাইল গ্রামে '*রিজওয়ান লাইব্রেরী*' নামে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কালে এ গ্রন্থাগার অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আকর হয়ে উঠেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে নজরুল চর্চার পথিকৃৎ; ঢাকা '*নজরুল একাডেমী'র* প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। পূর্বাপর নজরুল একাডেমী পত্রিকার সাধারণ সম্পাদক। 'পাকিস্তান মজলিস'–এর প্রতিষ্ঠাতা–সম্পাদক, 'বাংলা একাডেমী'র প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, 'রওনক' সাহিত্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড'–এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং কলকাতার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটিসহ অন্যান্য অনেক সাংস্কৃতিক সংস্থা ও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সম্মান ও স্বীকৃতি

১. *বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার*
২. *সিতারা–ই–ইমতিয়াজ (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার)*
৩. *একুশে পদক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার)*
৪. *ঢাকা রিকশা মজদুর ইউনিয়ন ১৯৫২ সালে শহীদ স্মৃতি পদক এবং অন্যান্য।*

আল্লামা ইকবাল প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন করা হলে তিনি লিখিত যে উত্তর দেন, তা হুবুহু পত্রস্থ করা হলোঃ

প্রশ্নঃ ইকবালের রচনার সঙ্গে আপনার পরিচয় কখন থেকে, আপনি কি উর্দু–ফার্সী জানেন–না অনুবাদের মাধ্যমে ইকবালের সাথে পরিচিত হয়েছেন?

উত্তর ঃ আরবী, উর্দু সামান্য জানা থাকলেও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ফারসী ভাষার জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়। তবে, ইরানের মহান কবিকুলের কালজয়ী কাব্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় ঘটে ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে। উপমহাদেশ বিভক্ত হবার আগে শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনেরও কিছুকাল কাটে কলকাতায়। সেকালেও রুমী, জামী, সাদী, হাফিজ, ওমর খইয়াম প্রমুখ ইরানী কবিকুল আমার সামনে আসেন বই, পত্রিকা, সভা–সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে। হালী, গালিব, দাগ, ইকবাল প্রমুখ উপমহাদেশের উর্দু–ফারসী কবিদের কবিকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাতও সেই সঙ্গে।

প্রশ্ন ঃ ইকবালের কোন ধরনের রচনা আপনাকে সবচাইতে বেশী মুগ্ধ করেছে, কেন?

উত্তর ঃ ইকবাল মূলতঃ মরমী দার্শনিক কবি। প্রেম, প্রকৃতি, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, আধ্যাত্ম ভাবনা প্রভৃতি নানা আঙ্গিকে ছড়িয়ে আছে তাঁর সাহিত্য, কাব্য ও গীতি–কবিতা সম্ভারে। তাঁর মধ্যে কোন্ রচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে, জবাব দিতে হলে আমাকে বাংলা প্রবাদ "বাঁশ বনে ডোম কানার" সংকটে পড়তে হয়। তবে, কবিতার সম্বন্ধে বলতে পারি যে, রোমান্টিক আর্তির সঙ্গে আধ্যাত্মবোধের গভীর সংবেদন প্রকাশিত যে সব রচনায় সেগুলোই আমার মনে বেশী আবেদন জাগায়। ইকবালের প্রায় সমগ্র রচনায় জীবন, জগৎ ও সমাজ–চেতনার সঙ্গে ধর্ম–ভাবনা মিশে আছে। তাই, ইকবাল সাহিত্য আমার কাছে ধর্মাদর্শ–নিষিক্ত মানবিক ও পারমাত্মিক চিন্তাধারার আকর।

প্রশ্ন ঃ ইকবালের কবিতার বাংলা অনুবাদক কারো সাথে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো কি? তাদের বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু বলুন?

উত্তর ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান, ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন, প্রজেশ কুমার রায়, আহসান হাবীব, হাবীবুর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, আবদুর রশীদ খান, আশরাফ সিদ্দিকী, মনির উদ্দীন ইউসুফ, কাজী আবুল হোসেন, মহীউদ্দীন খান, মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, আজহারুল ইসলাম, আশরাফ আলী খান, মুহম্মদ সুলতান, ফজলুর রহমান, আবদুল হক ফরিদী, গোলাম মোস্তফা, মীজানুর রহমান প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট কবি–সাহিত্যিক ইকবালের রচনা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এঁদের প্রায় সবাই কমবেশী আমার জানাশোনার মধ্যে। পরিচয়ের কারণ এঁদের সকলেরই অনুবাদ ছাপা হয়েছে দেশ বিভাগের আগে, কলকাতায় 'মাসিক মোহাম্মদী' এবং বিভাগোত্তরকালে ঢাকায় 'মাহে-নও' পত্রিকায়। এ দুটো পত্রিকারই সম্পাদনার সঙ্গে আমি জড়িত

ছিলাম। এঁদের অনুবাদের মূল্যায়ন বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ এবং স্বল্প পরিসরে দূরূহও বটে। অনেক অনুবাদ সম্পাদনার জন্য আমার কাছেই এসেছে, আমার হাতে পাসও হয়েছে। যাঁরা প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক তাঁদের অনুবাদ সম্বন্ধে ঢালাও মন্তব্য--'ভালো' এবং ' বেশ ভালো' ছাড়া আর কি করা যায়? যাঁরা অপেক্ষাকৃত নতুন, তাঁদের অনুবাদ সম্পাদনার পরেই ছাপা হয়েছে; মোটামুটি ভালো না হলে তো ছাপাহয়নি।

প্রশ্ন ঃ মরহুম সৈয়দ আবদুল মান্নানের 'আসরারে খূদী'র অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান 'আসরারে খূদী'র অনুবাদ করেছেন স্বচ্ছন্দ অথচ ভাব-গভীর গদ্যে। তাতে এ কাব্যের মরমী দার্শনিকতার প্রকাশ সুললিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ফররুখ আহমদের অনুবাদ সবচাইতে ভালো হয়েছে বলে কেউ কেউ মূল্যায়ন করেছেন, এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তর ঃ ফররুখ আহমদ মৌলিক কবি হিসেবে শক্তিমান ও সপ্রতিভ। তাই, স্বভাবতঃই তাঁর কাব্যানুবাদও অনেক ক্ষেত্রে বেশী সফল।

প্রশ্ন ঃ দার্শনিক হিসেবে এবং কবি হিসেবে ইকবালের স্থান নির্ধারণ করবেন কি?

উত্তর ঃ ইকবাল অনেকের মতে কবির চেয়ে দার্শনিক বড়। আমার নিজস্ব রুচি ও কাব্যবোধ কিন্তু কবি ইকবালের স্থান পরে দিতে চায় না। সত্য কথা এই যে, ইকবালের মধ্যে কবি ও দার্শনিক পরস্পরের পরিপূরকরূপে হাত ধরাধরি করে চলেছে। এ বিষয়ে বিশ্বের কবিদের মধ্যে ইকবাল সম্ভবতঃ তুলনাহীন। তবে পাঠকের রুচি ও স্তর ভেদে তাঁর দর্শন-প্রধান ও কাব্য-প্রধান কবিতার প্রতি পক্ষপাত যে হতে পারে না তা নয়। "ভিন্ন রুচিহি লোকা"।

প্রশ্ন ঃ ত্রিশের দশক, চল্লিশের দশক, পঞ্চাশের দশক এবং ষাটের দশক ও সত্তরের দশকে এদেশে ইকবাল চর্চা সম্বন্ধীয় আপনার ব্যাখ্যা কি?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ ইকবাল সাহিত্যের চর্চা ও অধ্যয়ন প্রকৃত গতি লাভ করে তিরিশের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৩৮ সালে কবির ইন্তেকালের পরে গ্রামগঞ্জে যার শৈশব- কৈশোর কেটেছে সেই সদ্য প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ আমিও ইকবাল সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠি। সেবারের রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিনের বাংলা অংশের মুখপাত্রে ছাপা হয় আমার কবিতা 'মহাকবি ইকবাল'। আসলে অনেক আগেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম নব-জাগরণের ঢেউ লেগেছে সারা ভারতে, এই বাংলাদেশেও। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান মিলিত অভ্যুত্থানের উদগ্র কবিকণ্ঠ হয়েও একই সঙ্গে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে একান্ত আহবানও জানাচ্ছেন নতুন জীবনে নতুন প্রত্যয়ে জেগে ওঠার। পাশাপাশি পশ্চিম ভারতে ইকবাল 'হিমালায়' 'নয়া শিবালা' 'হিন্দুস্তাঁ হামারা' ইত্যাদির সঙ্গে বালে জিব্রীল, বাঙ্গ-ই-দারা, তারানা-ই-মিল্লী শোনাচ্ছেন উচ্চকিত দেশবাসীকে। এই প্রেক্ষ পটে আমাদের অর্ধপরিচিত ভিন্ন ভাষার এই মহাকবি উপমহাদেশে ইসলামী মানস জাগরণের অগ্রণী মুখপাত্র ইকবাল আমাদের চেতনা ও ভালবাসার বায়ুস্তরে তাঁর কাব্য ও দর্শনের সুরভি ছড়িয়ে দিলেন। সেই থেকে সত্তরের আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ইকবাল চর্চা অবাধ গতিতে এগিয়ে গেছে। তারপরে তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেই ভিন্ন ভাষার অর্ধপরিচিত মানুষদের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভাঙনের মওসুমে যার আগুনের উত্তাপ এখনো

লাগছে ইকবাল চর্চারও গায়ে। ইতিহাসে জাতিগত মূঢ়তার সংক্রান্তি মাঝে মাঝে দেখা দেয়। চেতনা ও চিন্তার ক্লৈব্য রাহুর মত গ্রাস করে মানুষের মনন ও শুভাশুভ বুদ্ধিকে। এদেশে অনেক কিছুর মধ্যে ইকবালও হয়তো সেই সংক্রান্তিরই কবলিত হয়েছিলেন। সেটা কেটে যাচ্ছে। কেটে তো যাবেই। দেরী হচ্ছে, এ-ই যা! ইকবাল নিজেই বলেছিলেন মক্তবের মুয়াল্লিম সাহেবকে, ক্লাসে উপস্থিত হতে তাঁর বিলম্বের জবাবদিহিতে। "জনাব ইকবাল দেরহি সে আতা হায়" সেটাই হোক ইকবাল প্রেমিকদের সান্ত্বনা।

প্রশ্ন ঃ ইকবাল চর্চায় "ইকবাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটি" এবং "ইকবাল একাডেমী"র ভূমিকা কি ছিল? প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা হিসেবে এগুলোর সফলতা কতটুকু হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ ঢাকায় মরহুম মীজানুর রহমানের উদ্যোগে তাঁর বাসভবনে প্রথমে *'ইকবাল-নজরুলইসলাম সোসাইটি'* এবং পরে *'ইকবাল একাডেমীঃ ঢাকা-করাচী'* গঠিত হয়েছিল এবং ঘরোয়া পর্যায়েই কিছু দিন টিকে ছিলো। ঘরোয়া পরিসরে ইকবালের জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন এবং মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট খাটো প্রকাশনাই ছিল এর স্বল্প জীবনকালের কীর্তি।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। লাহোরের "ইকবাল একাডেমী"র কর্মকান্ড বৃহত্তর পরিধি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। ইংল্যান্ড ও জার্মানী ছাড়াও অন্যান্য দেশে এর শাখা আছে। তবে, উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকায় এর কার্যক্রম খুব একটা লক্ষ্যযোগ্য নয়। অথচ লাহোর কবির জন্মভূমি এবং তাঁর দেশ। পাকিস্তানের তিনি 'স্বপ্নদ্রষ্টা' আদর্শিক মুখপাত্র এবং 'জাতীয় কবি'। নিজ গুণেই ইকবাল বিশ্ব কবিদের মধ্যে গণনীয়। লাহোর এবং পাকিস্তানের জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্তব্য তার এই অমূল্য সম্পদকে দেশে-বিদেশে যথাসম্ভব তুলে ধরা।

প্রশ্ন ঃ আপনার সম্পাদিত কোন্ পত্রিকায় ইকবালের উপর প্রবন্ধ, অনুবাদ কবিতা বেশী প্রকাশিত হয়েছে, বিস্তারিতবলুন?

উত্তর ঃ আগেই বলেছি, কলকাতায় মাসিক মোহাম্মদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং ঢাকায় মাসিক 'মাহে-নও'-এর সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছি। এ দু'টি পত্রিকায় ইকবাল চর্চা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। 'মাহে-নও'তে প্রায় প্রতি সংখ্যায় ইকবাল বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা ও ইকবাল কাব্যের অনুবাদ ছাপা হয়েছে। কাব্যানুবাদে যেসব লেখক-কবির নাম আগে উল্লেখিত হয়েছে তাঁরা ছাড়া এ দু'টি পত্রিকায় লিখেছেন ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, বেনজীর আহমাদ, অধ্যাপক অজিত গুহ, মাওলানা আবদুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, ডঃ এনামুল হক, অধ্যাপক আবুল ফজল, মুহম্মদ আবদুল হাই, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, সুফিয়া কামাল, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ, আকবর উদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজীবুর রহমান খাঁ, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, ডঃ হাসান জামান, মুফাখখারুল ইসলাম, এ এস এম আবদুল জলিল, মোহাম্মদ মামুন, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বর্মন, রওশন ইজদানী, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আবদুর রশীদ খান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবদুস সাত্তার, আখতার-উল-আলম, ডঃ এম আবদুল কাদের, মাওলানা আমীনুল ইসলাম, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, আবদুল হক, আবদুল হাই মাশরেকী এবং আরো অনেকে।

ইকবাল প্রসঙ্গঃ তালিম হোসেনের মুখোমুখী

প্রশ্ন ঃ নজরুল একাডেমী পত্রিকায় ইকবাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বা অনুবাদ ছাপা হয়েছে কি, এ ব্যাপারে আমরা আশা পোষণ করতে পারি ?

উত্তর ঃ নজরুল একাডেমী পত্রিকা নীতিগতভাবে নজরুল চর্চাতেই পূর্ণভাবে নিবেদিত। প্রসঙ্গক্রমে অন্য ভাষার তো নয়ই, বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের ও অন্য কোন ক্ষেত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লেখা ছাপা হয় কদাচিৎ। তবে আলোচনাক্রমে বা তুলনামূলক অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক লেখাতেই ইকবাল উল্লেখিত ও কীর্তিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে নীতি আঁকড়ে পড়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা যখন থাকবে না বা কমে যাবে, সে দিনের আশায় থাকতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ শোনা যায়, ইকবালের রচনাবলীর দ্বারা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্যভাষার কবি-সাহিত্যিকের উপর নজরুল ইসলামের আলোচনা, পর্যালোচনা ও অনুবাদ থাকলেও ইকবালের উপর তাঁর মুহম্মদ সুলতান অনূদিত 'শেকোয়া' 'জওয়াবে শেকোয়া' এবং আশরাফ আলী খানের 'শেকোয়া'র ভূমিকা ছাড়া অন্য কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন কি?

উত্তর ঃ লেখক-কবিরা পূর্ববর্তী, এমনকি সমসাময়িক লেখক দ্বারাও অবশ্যই প্রভাবিত হতে পারেন। তবে, দূরত্বে স্থিত দুই ভিন্ন ভাষাভাষী কবির মধ্যে বাক-শৈলী ও প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য নয় শুধু স্বাতন্ত্র্যও থাকে। কাজেই সেখানে সোজাসুজি প্রভাবের কথা উঠে না। তবে, সাদৃশ্য অবশ্যই থাকতে পারে। শেকোয়ার অনুবাদের উপরে যতদূর মনে পড়ে, নজরুল কথা বলেছিলেন শুধু মুহম্মদ সুলতানের বেলায় নয়, আরো একজন, আশরাফ আলী খানের অনুবাদের উপরেও এবং শুধু 'শেকোয়া' নয় অন্যান্য কাব্য, যেমন বাঙ-ই-দারা, নালায়ে ইয়াতিম জাবিদনামা। বাল-ই-জিব্রীল প্রভৃতি কাব্যেও ইকবালের চিন্তায় কিছু মুখর প্রতিবাদের ভাষা ও বিদ্রোহের স্পিরিট রয়েছে। এ জিনিস নজরুলেও স্পষ্ট। সে জন্য দু'জনকেই বলা যায় 'বিদ্রোহী কবি'। তাঁদের সে বিদ্রোহ কখনো দুনিয়ার মানুষের এবং কখনো মানুষের স্রষ্টার বিরুদ্ধে। মনোভঙ্গির এই মিলের জন্য বক্তব্যের যে সাদৃশ্যের ছাপ দেখা যায় তা দিয়ে কেউ কাউকে প্রভাবিত করেছিল কি-না বলা যায় না। খালি চোখে দেখা যায়, 'আমিত্ব' 'বিদ্রোহ' ও 'ইসলামী' মনোভাবনা এই দুই কবি-মানসের মধ্যে একটা সাযুজ্য এনে দিয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে বলা না গেলে এ ক্ষেত্রে আর কিছু বলা যায় না। তবে, এ বিষয়ে আমার নিজেরও একটা বিস্ময়বোধ আছে। ১৯৩৮ সালে ইকবাল লোকান্তরিত হয়েছেন। ততদিনে, বয়োকনিষ্ঠ হলেও বিখ্যাত 'বিদ্রোহী'-সহ বিদ্রোহী ভাবাপন্ন বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। আর ইকবাল তো সমগ্র উপমহাদেশে এবং বিদেশেও খ্যাতমান হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জানাজানি হবার মতো কিছুই কি ঘটেনি? কারো লেখায় বা চিঠিপত্রে তার তো প্রমাণ নেই!

প্রশ্ন ঃ ইকবালের কাব্য থেকে বর্তমানে বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের কোন শিক্ষা গ্রহণ করার মতো আছে কি?

উত্তর ঃ আছে বৈ কি? বাংলাদেশের উপর থেকে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক 'পাকিস্তান'-এর ছায়া এখন অপগত। তাই 'পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা' বলে পরিচিত ইকবাল যদি আমাদের পরিত্যাজ্য হয়, জ্ঞানী, ধ্যানী এবং বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় স্রষ্টা হিসেবে তাঁর পরিচয় ও প্রভাব তো মুছে যাবার জিনিস নয়। ব্রিটেন তো চলে গেছে, শেক্সপিয়ার কি গেছেন? তিনি আছেন। ঘরে-ঘরে, প্রাণে-প্রাণে। ইকবালের

কালাম, তাঁর স্মৃতি ও শিক্ষার যে আলো, তার মৃত্যু নেই। ইকবালের 'পাকিস্তান' নিয়ে মুহুর্মুহূ জিন্দাবাদের দিন গেছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজ পড়ে আছে। 'আশরাফুল মাখলুকাত'-এর উচ্চ মানবিক ও বৈশ্বিক দর্শন 'খূদী'র দর্শনে উপযুক্ত ভাষা ও রূপ পরিগ্রহ করেছে। সাধারণ মানুষের কথা থাক, যাঁরা বুদ্ধিজীবী 'অসাধারণ' বলে চিহ্নিত সেই আমরাই বা ক'জন সেই মহামনীষীর বিশিষ্ট মনন জড়িত এবং ধ্যান-শীলিত উপলব্ধির অধিকারী হয়েছি? জীবনাচরণের অনেক শিক্ষা, জ্ঞান ও ধ্যানের অনেক ঐশ্বর্যই তাঁর কাছে আমাদের নেবার আছে।

প্রশ্ন ঃ অনুবাদ কবিতা, প্রবন্ধ, গীতিকাব্য ও ইকবালের উপর লিখিত আপনার রচনাবলীর ফিরিস্ত জানাবেন?

উত্তর ঃ ইকবাল অধ্যয়ন আমার সামান্যই। ভাষা ছিল প্রতিবন্ধক। ইংরেজী অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমার কাজ। বাংলা অনুবাদের কাজ যেটুকু করেছি, এই মুহূর্তে তার সব হাতের কাছে নাই। আগেই বলেছি, ঢাকায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আঞ্চলিক প্রকাশনা দফতরে কাজ করার সময় মাসিক 'মাহে-নও' পত্রিকা এবং বিভিন্ন বইপুস্তক সম্পাদনা ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। 'মাহে-নও'তে ইকবালের কবিতা ছাড়াও প্রবন্ধ, ভাষণ ইত্যাদির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমি যা কিছু অনুবাদ করেছি তা ইংরেজী অনুবাদ থেকে। ছোটখাটো দু'-একটা অবশ্য মুল উর্দু বা ফারসী থেকেও করেছি অন্যের সাহায্যে। এই অফিস থেকেই ইকবালের সুবিখ্যাত The Reconos Truction of Religious thought in Islam-এর অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়। কামাল উদ্দীন খান অনুবাদ করেন এবং অফিসে আমার সহকর্মী আবদুল হক ও আমি তার সম্পাদনার কাজ করি। অনুবাদের কাজে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ ও আরো কেউ সাহায্য করেছিলেন বলে মনে পড়ছে। আবদুল হক ফরিদীকৃত "রমূয-ই বেখূদী"-এর কাব্যানুবাদ আবদুল কাদিরের অনুরোধে আমি সম্পাদনা করি।

১৯৫৪ সালে ইকবাল স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের জন্য আমি ফররুখ আহমদ ও আমার নিজের কবিতা ও গান দিয়ে 'ইনকিলাব' নামে একটি গীতি বিচিত্রা রচনা করি।

আমার অনুদিত কবিতা ঃ

১. *রাত্রি ও কবি (বাঙ্-ই-দারা থেকে)*
২. *খিজর-ই-রাহথেকে*
৩. *প্রার্থনা (বাঙ্-ই-দারা থেকে)*
৪. *ফেরেশতাদের গীত (বাল-ই-জিব্রীল থেকে)*
৫. *'জাভেদনামা' থেকে*
৬. *নয়টি সুধী বচন (জাভিদনামা থেকে)*
৭. *ঘুমন্ত কলি আনরে চোখে দীপ্ত জাগরণ*
৮. *প্রেমের তীর্থে ঘর বাঁধো আপনার*

TWO-NATION THEORY

Advocate Mujibur Rahman

Till recently, the terms nation and nationality were used interchangeably, though some writers use them, now, as two distinct terms, they do not agree as to the difference. Be that as it may, the old and secular concept of nationalism mainly based on territory, race, language, customs etc. as elements of nationalism has long been changed.

Ernest Renan, one of the great French writers, in his famous essay Q'uest ce qu'une nation? says. "............... A Nation is a living soul, a spiritual principle based on two main elements: The one is the common possession of a rich heritage of memories, and the other is actual agreement, the desire to live together.[1] *Harold* J. Laski referring to Renan's view says that broadly speaking nationality is essentially spiritual in character. It implies the sense of a special unity which marks off those who share in it from the rest of mankind.

That unity is the outcome of a common history, of victories won and traditions created by a corporate effort. There grows up a sense of kinship which binds men into oneness. They recognise their likeness, and emphasise their difference from other men. Their social heritage becomes distinctively their own. They come to have an art, a literature, recognisably distinct from that of other nations[2]. Hans Kohn is more specific when he says that nationalism is first and foremost a state of mind and an act of consciousness[3]. W. Friedmann is of the view that a nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which are really only one, go to make up this soul or spiritual principle. The one is the possession in common of a rich heritage of memories. And the other is actual agreement, the desire to live together, and the will to

continue to make the most of the joint inheritance. The existence of a nation is a daily plebiscite, just as that of the individual is a continual affirmation of life[4]. John stuart Mill states that a portion of mankind may be said to constitute a nationality if they are united among themselves by common sympathies which do not exist between them and others which make them co-operate with each other more willingly, than with other people, desire to be under the same Government and desire that it should be governed by themselves or a portion of themselves exclusively[5].

Nationalism And Indian Sub-continent:

India as a sub-continent, throughout its history, has been inhabited by heterogeneous human species, differing racially, anthropologically, socially, linguistically and culturally. India was never one homogeneous country, nor did it ever contain one nation. Neither during the time of the aboriginals, nor the Dravidians, who had possessed a superior civilization to that of the Aryans nor the caste-ridden Aryans themselves, nor during Asoka the Buddhist Emperor, nor even during the great Mughals, was India inhabited by one nation. The advent of the Muslims of the sub-continent divided Indian society into two water-tight compartments.

According to Panilkkar the main social result of the introduction of Islam as a religion into India was the division of society on a vertical basis. Before the 13th Century Hindu society was divided horizontally and neither Buddhism nor Jainism affected this division. Islam on the other hand splitup Indian society into two sections from top to bottom and what has now come to be known in the phraseology of today, as two separate naions came into being from the beginning[6].

Since the advent of the Muslims in the Indian sub-continent Hindu India instead of any adjustment with the Muslims for co-existence has been opposing their very presence in the sub-continent. According to the religio-mythological concept

of the Hindus this sub-continent is identified with a very important goddess 'Bharat Mata' out of innumerable gods and goddesses. Any outsiders: Muslims or otherwise are looked down contemptuously and are called Mlechcha. Al-Beruni visited this sub-continent during the 9th century and in his kitab-al-Hind, translated by C. Sachau, captioned as Al-Beruni's India says:-"The reader must bear in mind that the Hindus entirely differ from us in every respect. Hindus totally differ from us in religion as we believe in nothing in which they believe and vice versa, ... all their fanaticism is directed against those who do not belong to them- against all foreigners. They called them Mlechcha i.e. impure and forbid having any connection with them[7]." Jawaharlal Nehru as a father instructed his daughter Indira by his letter dated April 25, 1932 that India itself was a world to the Hindus; the others outside it were `Barbarians' or Mlechchas[8]. But the Muslims with their superior culture and civilization have been continuing here, despite the persistent opposition of the Hindus. The Muslims ruled India for about a thousand years. This blow had to be endured, defiance was also being offered in the name of Dharma-Hinduism led by Brahmanism.

Bankim Chandra Chatterjee, an outstanding leader of Hindu revivalism, laid the foundation of acute communalism and an anti-Muslim campaign anew, through his novel 'Ananda Math'. According to Dr. Khetra Gupta, Professor of Rabindra Bharati University, Bankim Chandra used this novel as an instrument of propaganda for Hinduism and he encouraged others through an article in 1885 to use literature as the ladder for going up to the stage of Hindu religionism. Dr. Gupta further observed that the philosophy of Bankim behind the theme of Ananda Math was to establish Hindu Raj instead of Muslim rule in India. Dr. Gupta also said that Bankim reached the extreme point of communalism and Ananda Math was written for propagation of a specific ideology. `Bande Mataram' in Ananda Math conceived India as a goddess and he

inspired the Hindu community for all sacrifies for Bharat Mata- Mother India[9].

Karan Singh, M. A. Ph. D, in his book. `The Prophet of Indian Nationalism, with a forword by Jawaharlal Nehru, says that the concept of spiritual nationalism and divinity of the mother land is based on the Vedas. He observes that the Vedas contain numerous hymns in adoration of the earth, and the worship of Prithbi is one of the essential rituals of Hindu religious ceremonies. Bankim Chandra Chatterjee in his Ananda Math created a famous mantra: Bande Mataram glorifying the divinity of the mother land. Aurobindo Ghosh's contribution was to take up this mystic and religious concept of Bankim, adapt it to the political requirements of India at the turn of the century, and turn it into a veritable dynamo of strength and inspiration. His exposition of the religion of nationalism and the consequent necessity for utter self-sacrifice and immolation at the feet of Mother India was unsurpassed for its deeply-felt eloquence[10]. The same author remarked that Kali, known also by the terms Bhawani, Bhavatarini, Durga etc. has been the favourite deity of most of the Hindu leaders who have sought to free India from the bonds of enslavement, if necessary by force. Aurobindo's plan for a secret society to train revolutionaries was dedicated to Bhawani and the concept of the goddess as the source of Power (Shakti) is elaborated in his celebrated pamphlet on Bhawani Mandir [11]. Aurbindo was considered by Hindu India to be the prophet of Indian Nationalism. He writes: "For what is a nation? What is our mother country? It is not a piece of earth, nor a figure of speech, nor a fiction of the mind. It is a mighty Shakti, composed of all the Shakties of all the millions of units that make up the nation, just as Bhawani Mahisha Mardini sprang into being from the Shakti of all the millions of gods assembled in one mass of force and welded into unity". Ananda Math was published in 1883. According to Aurobindo it was this book that gave them the reviving mantra which was creating a new India and the mantra was

mantra was `Bande Mataram[12]. According to Aurobindo the concept of India as a nation went far deeper than normal patriotism. He looked upon India as a living and pulsating spiritual unity[13]. Nationalism in Aurobindo's thought is not merely a patriotic and intellectual pastime, but a deep and fervent religious Sadhana . In one of his speeches this is very clearly expressed. "What is Nationalism? Nationalism is not a mere political programme; nationalism is a religion that has come from god"[14]. 'Swaraj' according to Aurobindo, is considered as the fulfilment of the ancient life of India under modern conditions... and for the fulfilment of the Vedantic ideal in politics. This is the true Swaraj for India[15]. ...... The work that India has to do now is to organize life in terms of Vedanta, and that work she cannot do while overshadowed by a foreign power and foreign civilization[16]. Swami Dayananda Saraswati had Founded Arya Samaj in 1875 and he advocated a return to the pristine purity of vedic Hinduism. His organization was the First real concrete nucleus of Hundu political nationalism[16(1)]. In the context of Hindu polytheistic philosophy, the Hindu leaders were not mentally prepared to accommodate the Muslims the followers of Oneness of God (Towhid) as neighbours and equal citizens. The Hindu concept of nationalism was necessarily based on the goddess: Bharat Mata and the mantra of Bande Mataram. So according to Hindu philosophy- nationalism on Indian soil is exclusively Hindu nationalism constituted by the Hindus alone. So Hindu leaders themselves advocated exclusive Hindu nationalism excluding the Muslims.

V.D Savarkar in his presidential address at the All India Hindu Mahasabha session in 1939 said: "Let us bravely face the unpleasant fact that there are two nations in India, the Hindus and the Muslims"[17]. Even Jawaharlal Nehru on May 14, 1933 in Glimpses of World History admitted in an unambigous way that the Hindu idea of nationalism was definitely one of Hindu nationalism[18].

Since the days of Shivaji, the Marhatta warrior and the subsequent 19th century Hindu revivalist leaders: Ram Krishna, Bankim, Vivekananda and the 20th century heroes of Hindu revivalism: Tilak, Surendra Banerjee, Aurobindo, Rabindra Nath Tagore, M.K. Gandhi, Jawaharlal Nehru and others consistently sought to derive strength and courage from the mighty goddess-Bharat Mata.[19]

According to Mohit Lal Majumdar there was an unbroken continuity between the writings of Bankin and Rabindra Nath and whatever seed was sown by Bankim in his literature and whatever flowers and fruits came out, Rabindra Nath developed them and he was inspired by the ideas of Bankim.[20]

Hindu India was adamant to fight out the Muslims physically, politically and culturally in the name of one and exclusive Hindu Nationalism for India. Hindu India was not ready even to know about the Muslims, far less consider the Muslim view point.Maulana Abul Kalam Azad, with a heavy heart, wrote to a Hindu friend:~The mistake that you have committed in interpreting is common and is the result of ignorance which even after living for a thousand years in the same territoru, prevails among the Hindus regarding the Musalmans........ I have often wished that if by some means we could only remove this barrier of ignorance, what a tremendous amount of mutual hatred would melt away.[21]

However, subsequently Hindu leadership having realised that the Muslims could not be eliminated outright, cognizance, as a matter of a cunning policy, was taken of them, but instead of one exclusive Hindu nationalism a plea of a United Hindu Muslim nationalism was taken up so that under the Western democratic process the Muslims might be made a permanent minority in the Central Legislature of united India and the Muslims might be either enslaved under majority Hindu rule or exterminated altogether in due course. So to get the

support for their new stand, United nationality, they managed to enlist the support of some Muslims who posed themselves as nationalists. Surendra Nath Banerjee led this new manoeuvre and captioned his Autobiography as 'A Nation in Making'.

Though it was very much known to the world and even admitted by Hindu India that Hindus and Muslims form two different nations out of insincerity they made a blatant twist and left no stone unturned to establish a false case of a united nationalism for the sub-continent inclusive of both the Hindus and the Muslims. What a somersault!

John Bright (1811-1889), a member of the British Parliament in a speech in June, 1858, ninety years before the actual partition of India in 1947, had made a forecast in one of his speeches while debating on India before the Parliament. He argued ~How long does England propose to govern India? Nobody answers that question, and nobody can answer it. Be it 50, or 100 years, does any man with the smallest glimmering of common sense believe that so great a country with its twenty different nations and its twenty languages can ever be bound up and consolidated into one compact and enduring empire? I believe such a thing to be utterly impossible. We must fail in the attempt if ever we make it and we are bound to look into the future with reference to that point."[22]

Sir Syed was the first Muslim to advocate the already existing Two- Nation Theory and it was he who forecast partition of India. In 1867, he said: ~It was now imposible for Hindus and Muslims to progress as a single nation." In 1882 he said to a students' gathering at Ludhiana that Muslims were a nation. He declared: ~ALL individuals joining the fold of Islam together constitute a Nation of the Muslims. Remember it is by keeping up Islam that our Nation is a

nation". These are the first known unequivocal declarations that Muslims of India constitute a nation.[23]

It was the Hindus who by their religious conviction, social behaviour and political actions established beyond any doubt the concept of the Two-Nation Theory. Hindu India having felt that Urdu and Persian Languages, prevalent during Muslim rule, carried the flavour of Islamic culture, organized a Committee in the United Provinces with Sharoda prosad Shandal as its Secretary and started an agitation to replace the *said languages* by Hindi. Sir Syed Ahmed Khan wrote a letter on the 29th April, 1870, when he was in England, to Nawab Mohsin-ul-Mulk expressing the anxiety that if the Hindus continued to proceed that way it could be said with certainty that the Muslims could not pull on with them, rather separation was indispensable. [24]

In the context of the Hindu attitude and their anxiety to dominate the Muslims, Sir Syed in a speech in 1883 said; "Now, suppose that all the English were to leave India..... then who could be the ruler of India? Is It *possible* that under the circumstances two nations the Muslim and the Hindus could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable. [25]

Sir Syed having criticised Western democracy, in the context of a United India, opined that it was not applicable in this Sub-continent. He, in his speech on December 28, 1887 at Lucknow before the Annual Session of the Mohammadan Education Conference, made the following observation: "They want to copy the British House of Lords and the House of Commons. Now let us suppose that all the Muslim electors vote for a Muslim member and all the Hindu voters for a Hindu Membar and now count how many votes the Muslim member will have, and how many the Hindu. It is certain that the Hindu member will have four times as many because their

population is four times as numerous. Therefore, we can prove by mathematics that there will be four votes for Hindus to every one for the Muslims. And now how can the Muslims guard their interest? It will be like a game of dice in which one man had four dice and the other only one".[26]

Abdul Halim Sharar (1886-1924), an outstanding historian, a journalist and editor of the Urdu Weekly 'Muhazzib' was deeply moved by Hindu-Muslim riots as early as 1890 and made an observation, in the editorial of Muhazzib on August 23, 1890, to the effect that due to the basic difference between the two nations, the Hindus and the Muslims, partition of India into Hindu and Muslim provinces with exchange of population was the only way out. The Hindus seem to be of the view that they should not allow Muslims to be their neighbours".......[27].

A. o. Hume, a British official, founded the All India Naticnal Congress in 1885. He along with Tayibjee tried, during 1888, to get the support of Sir Syed who disagreed with them with a bitter, but a correct reply: "I do not understand what the words National congress mean. Is it supposed that the different castes and creeds living in India belong to one Nation or can become one Nation and their aims and apirations be one and the same? I think it is quite impossible and when it is impossible there can be no such thing as National Congress.......I object to every Congress in any shape or form whatever, which regards India as one Nation" [28]

Allama Iqbal in his presidential speech at the Allahabad Session of the All India Muslim League in 1930 demanded the bifurcation of the sub-continent on the basis of the Two-Nation Theory. The Quaid-E-Azam gave a clear idea of the Two Nation Theory: "We are a nation with our own distinctive culture and civilisation, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion, legal laws and moral codes, customs

and calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions, in short we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law we are a nation."

Hindu India through its friend Maulana Hossain Ahmed Madani got a book written 'Muttahida Qaumiat Aur Islam' in support of the socalled one nation theory. Allama Iqbal through a poem expressed surprise that Hossain Amhed could not realise that Islam could not approve of nationalism based on territory (watan) [29]

Maulana Abul-Ala Maududi most successfully controverted Madani's contention by writing a book Masala - e - Qaumiyat through which he, in the light of Al -Quran and Hadith established the Two Nation Theory. [30]

Maulana Maududi in *a* series of articles in the Tarjamanul Quran during the period 1938-39. unmasked the Congress manoeuvre and inspired the Muslims to fight for partition of the Sub-continent with a suggestion of exchange of populations within 25 years. Maulana Maududi in `Siyasi Kashmakash' expressed the view that it was only the worshipper of Bharatmata who might be pained at heart for bifurcating India, but the Maulana would be the happiest to get even one square mile from out of the whole of India if the Sovereignty of Alllah might be established there [31]. On march 23, 1940 the All India Muslim League in its Lahore session adopted the historic resolution demanding partition of the Sub-Continent, which is popularly known as the Pakistan Resolution.

The Simla Conference which assembled on June 25, 1945 could not bring about any political rapprochement. Viceroy Lord Wavell on August 21, 1945 made a declaration that elections to the central and the provincial legislatures would be held and in December the election for the Central Legislative Assembly was held in which the Muslim League won every single Muslim seat. In the election for Provincial

Legislative Assemblies held in early 1946, the Muslim League captured 428 out of 492 Muslim seats. After the grand success of the Muslim League on the challenged issue of Two Nations a Convention of the Muslim League Legislators from all over India was called in Delhi on April 9, 1946 in which the following resolution was adopted amid scenes of tremendous enthusiasm; under the presidentship of Quaid-i-Azam M. A. Jinnah; "Whereas in this vast subcontiaant of India a hundred million Muslims are the abherents of a faith which regulates every department of their life (educational, social, economic and political)., whose code is not confined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies and which stands in sharp contrast to the exclusive nature of Hindu Dharma and philosophy which have fostered and maintained for thousands of years a rigid caste system resulting in the degradation of 60 million human beings to the position of untouchables, creation of unnatural barriers betweean man and man and superimposition of social and economic inequalities on a large body of the people of this country, and which threatens to reduce Muslims, Christians and other minorities to the status of irredeemable helots socially and economically; whereas the Hindu caste system is a direct negation of nationalism, equality, democracy and all the noble ideals that Islam stands for; Whereas different historical backgrounds, traditions, cultures, social and economic orders of the Hindus and the Muslims have made impossible the evolution of a single Indian nation inspired by common aspirations and ideals and whereas after centuries they still remain two distinct major nations;" and - "That the zones comprising Bengal and Assam in the north-east and the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan in the north-west of India, namely Pakistan zones where the Muslims are in a dominant majority be constituted into a Sovereign independent State and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay". Mr. H. S. Suhrawardy moved the resolution for establishemrnt of one Pakistan instead of two

autonomous regions as was mentioned in the Lahore resolution of March 23, 1940[32]. The movment for partition of the country on the Two Nation Theory ultimately compelled Hindu India to concede to partition of the sub-continent into two states ' India and Pakistan.

After the battle for Pakistan fought by the All India Muslin League was won the Hindu Congress became exasperated against the socalled nationalist Muslims. Maulana Abul Kalam Azad, life-long follower of the Congress confronted Sardar Patel, said to be the Iron Man in the Congress High Command as to why Congress accepted the Two-Nation Theory, Patel replied on the face of Maulana Azad, since the latter could not deliver goods in the election: ; "Whether we liked it or not there were two nations in India. Muslims and Hindus could not be united into one nation. There was no alternative except to recognise this fact[33]. It is another somersault!

Hindu India as usual with them accepted the partition of the sub-continent in an in sincere manner. The All India Congress Committee met on June 14, resolved to accept the plan, but proceeded to assert the following on the partition of India: "Geography and the mountains and the seas fashioned India as she is, and no human agency can change that shape or come in the way of her final destiny....The A. I. C. C. earnestly trusts: when the present passions have subsided, India's problems will be viewed in their proper perspective and the false doctrine of two nations will be discredited and discarded by all". [34] The Hindu Mahasabha paraphrased the same idea in stronger and clearer terms: "India is one and indivisible and there will never be peace unless and until the separated areas are brought back into the Indian Union and made integral parts thereof "[35] The Congress and Hindu Mahasabha, according to the Quaid, were two sides of the same coin. Mr. Ashrafuddin Ahmed Chowdhury, a nationalist Muslim, once Secretary General of the All India Forward

Block, under the Presidentship of Subhas Chandra Bose wrote a letter on Aprill 30, 1947 to Jawaharalal Nehru asking him why the Congress accepted the Two-Nation Theory, the latter replied on May 23, 1947 to the effect that the Congress stood for the Union of India and still stands for it. But...... If unfortunately situation leads to a division, then inevitably such a division must mean a division also of Bengal and Punjab. That is the only way to have a united India soon after....... "[36] Aurobindo Ghosh in his Independence Day Message, on August 15, 1947 said that the old communal division into Hindus and Muslims seems now to have hardened into a permanent political division of the country. It is to be hoped that this settled fact will not be accepted as settled for ever or as anything more than a temporary expedient This must not be; the partition must go........by whatever means, in whatever way, the division must go; unity must and will be achieved, for it is necessary for the greatness of India's future. [37] It is still another somer sault!

Hindu India's concept of nationalism, is characterised by many twists and turns, changed cunningly to suit its purpose to dominate over the Muslims with an ultimate goal of a total extermination of Muslims in the sub-continent and to extablish Ram Raj. Hindu India's attitude of hatred towards Muslims even to day, as described by Nirad Chandra Chowdhury, is that the orthodox Hindus would taka a bath after the day's business if it has brought them into contact with non-Hindus. 38

Post Partition policies by India are formulated and executed towards reunification of the Sub-continent to establish an exclusive Ram Raj. Chronic riots perpetrated against the Muslims in India and conversion of Mosques into Hindu Temples bear testimony to Indias nefarious design to that effect. Indian Prime Minister Razib Ganhi's public statement

on November4, 1989 at Faizabad, before a mammoth gathering, that if he is voted to power he shall re-establish Ram Raj and according to Reuter, he made a promise to the public. [39].

According to Keith Callard, Associate Professor of Political Science, Mc Gill University, the consciousness of separate identity between the Hindus and the Muslims is not new, and it would be quite wrong to imagine that Iqbal and Jinnah created the feeling of national identity. More than eighty yars ago Sir William Hunter wrote that the Muslims were not merely a community but also as a race ....exhibited at intervals, their old intense feeling of nationality. [40] This feelingwas stemulated by Hindu Parochialism and sensationalism. Hindu Indias goal was supremacy whereas Muslim India's goal was survival. Hindu India's policy was to achieve its nefarious goal through a United India, necessarily with predominantly a Hiandu majority central legislature.

Mr. Gandhi the so called champion of non-violence was discovered out by the Quaid-e-Azam as a cunning fox and a Hindu revivalist.[41] According to Lord Mountb tten the last viceroy, Mr. Gandhi urged Indian Unity, to be maintained even by force.[42] But it was not possible for Lord Mountbatten to keep India United because of the success of the Muslim League in establishing Two-Nation Theory through the election results, and because of the statesmanship of the Quaid-e-Azam. Lord Mountbatten says: "The man whom I had real difficulty in getting through was Mr. Jinnah, the Quaid-e-Azam (The great Leader) as his followers called him. If it would be said that any single man held the future of India in the palm of his hand in 1947 that man was Mohammad Ali Jinnah. To all intents and purposes Jinnah was the Muslim Leage and of the dream of Pakistan-the separate Muslim state ever did come true it would be jinnah who brought it to life and fashioned it". [43].

Sir Syed foresaw the idea of a Muslim State on Two Nation Theory Allama Iqbal philosophised it and Quaid-e-Azam M.A. Jinnah, as an architect, founded the separate state; Pakistan, on partition of the sub-continent.

Tow-Nation Theory, as the basis for partition of the Indian Sub-continent, resulted the creation of Pakistan and as a matter of that, the present Bangladesh is also the consequence of Two-Nation Theory. Islam is the sheet anchor of Muslim nationalism and Two-Nation Theory. No Muslim can be oblivious of these hard facts. Perpetual vigilances is the price of freedom.

References

1. Edward MC Nall Buras, Ideas in Conflict. the Political Theories of Contemporary World. Methuen, London P. 467. Ebenstein. Oxford & I. B. H. publishing Co. New delhi, Calcutta, Bombay. P. 742.
2. Harold J. Laski-A Grammar of Politics. S. Chand & Company Ltd. Indian Reprint 1979 PP 219-220.
3. Hans Kohn. The Idea of Nationalism. Macmillan. New York P. 16.
4. W. Friedmann. An Introduction to World Politics. 5th Edition. Macmillan. London-Melbourne, Toronto. St. Martin's Press N.Y. 1965. P.27.
5. John Stuart Mill. Representative government. Chapter 16.
6. K. M. Panikkar, A Survey of Indian History. The national Information Publication, Bombay-1947. p. 162.
7. Al-Beruni's India (Translation of Kitab al-Hind) by Dr. Edward c. Shachau. PP. 17 & 19.
8. Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History. Jawaharlal Memorial Fund. Oxforrd University Press. 1982. p. 95.
9. Dr. Khetra Gupta, Professor Rabindra Bharati University and Professor Burdwan University. Bankim Chandra's Novel. Shilpariti. Granthanitai. 59/1/B. Patuatola Lane, Calcutta 9. PP. 259.265. 278 and 285.
10. Karan Singh M. A. Ph. D. Prophet of Indian Nationalism. A Study of Political Thcught of Sri Aurobindo Ghosh. London George Allen & Unuin Ltd. Ruskin House. Museum Street. P. 149.

11. (a). do. p. 32. (b) Aurobindo Journal: Bande Mataram, April 16, 1907.

12. Do Karan Siongh Prophet of Indian Nationalism PP. 70-71.

13. Do P. 72.

14. Do P. 74.

15. Do PP. 80-81.

16. Do P. 81.

16 (1) Do P. 30.

17. G. Allana. Quaid-E-Azam Jinnah. The Story of a Nation.Feroz Son Ltd. P. 313.

18. Jawaharlal Nehru. Glimpses of World Histoty. Jawaharlal Nehru Memorial Fund. Oxford Universoty press. P. 720.

19. Karan Singh Prophet of Indian Nationalism. pp. 32 & 37.

20. Mohitlal Majumdar. "Bankim Baran" Biddodai Library Private Ltd. Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700009 PP. 195-196.

21. India and Contemporary Islam. Edited by S. T. Lokhand Walla Indian Institue of Advanced Study Simla 1971. Article Post Independence Indian Islam' by Abid Reza Badar.

22. Selected Speeches of Rt. Hon, John Bright on Public Questions, J. M. Dent and Sons Lrd. London Page 13.

23. G. Allana. Quaid-e-Azam Jinnah, The Story of A Nation. Page 295.

24. Maktubat-E-Sir Syed, Published by Bangla Academy 1374 B. S. Letter No 17, Page No. 63.

25. Hector Bolitho. Jinnah, Greator of Pakistan. P. 42 and Richard Symonds. The Making of Pakistan P. 31.

26. S. S. Pirzada. Evolution of Pakistan. P. 51.

27. do F. 57-58

28. do pp. 51-52.

29. Iqbal. Armagan-i-Hajaz Page 278.

30. (a) S. S. Pirzada Evolution of Pakistan. 1963. The All Pakistan Legal Decisions, Nabha Road, Lahore, PP. 191-92.

(b) Abbas Ali Khan Maulana Maududi PP60-67.

31. Abul Ala Maududi Syasi Kashmakash 3rd Volume

32. Cabinet Mission and After compiled by Mohammad Ashraf. Ashraf Publications, Kashmiri Bazar Lahore. Pp. 27. 28. 29 and 30.

33. Abul Kalam Azad: India Wins Freedom. Released after 30 Years complete version Page 201.

34. V. P. Menon: The Transfer of Power in India. Calcutta 1957 as quoted by Ishtiaq Husain Qureshi in The Struggle for Pakistan, University of Karachi. 1965. p. 299.

35. Do P. 299.

36. Jamal Uddin Ahmed Chowdhury. Raj Birodhi Ashraf Uddin Ahmed Chowdihury. Last Cover Page.

37. Karan Singh, M. A. Ph. D. Prophet of Indian Nationalism. London, George Allen & Unwin Ltd. Ruskin House Museum Street. PP155-56.

38. Nirad Chandra Chowdhury. The Autobiography of an Unknown Indian (New York 1951). PP. 381-382.

39. The Daily Inqilab dated Dhaka, November 4, 1989 on a report by Reuter. PP. 1 & 8.

40. Keith Callard. Pakistan-A Political Study. Ruskin House. George Allen & Unwin Ltd. Museum Street, London. P. 198. Quoted: W. W. Hunter. The Indian Musalman's. Calcutta 1945, reprinted from 3rd edition 1876, 1st edition 1871 PP. 143-4.

41. Larry Collins and Dominique Lapierre-Freedom at Midnight. P.102.

42. The Life and Time of Lord Mountbatten illustrated bio-graphy based on the Television history by John Terraine. With a forward by Lord Mountbatten. P. 153.

43. - Do - P. 151.

ENGLISH ABSTRACT OF ARTICLES IN BENGALI

Dr. Syed Sajjad Husain

Dewan Muhammad Azraf president of the Iqbal Society, argues that Iqbal offered the world, and the Muslim world in particular, an alternative to the shallow rationalism which had been current in Europe in the 19th century. He shows how Iqbal's thought steers clear of the sterility, moral and spiritual, which is an inevitable outcome of the rejection of knowledge based on intuition.

Dr. Nuruddin lays emphasis on Iqbal's debt to the Quran whose teachings he interpreted in poetic terms. The poet never allowed himself to forget that the fountain-head of all that Islam means lies in the Quran.

Principal K. A. Rahman contributies a Bengali translation of Maulana Abul Hasan Ali Nadvi's essay on Iqbal's views on modern education. Secularist education, Iqbal stongly felt, blinds modern youth to the true aim of education which should be the fullest development of man's personality.

Dr. Muhammad Baqer's Urdu essay on the poetry in the light of the Quran is presented in a Bengali version by Mr Muhammad Nurul Islam of the Islami Bank, Bangladesh.

Prof. A. G. M. Husain Ahmad of Madrasah Alia discusses the nature of Iqbal's conception of freedom, and maintains that in Iqbal's view a person could claim to be a true Muslim only when he had shaken off all political shackles.

Syed Tasharraf Ali asserts that Iqbal is an inseparable part of the cultural heritage of Muslim Bengal. We must try to understand the true import of this precious heritage. To forget Iqbal is to deny ourselves something which is ours by right.

Mr. Abdul Mannan Talib examines the implications of Iqbal's philosophy of self-hood or Khudi.

Mr. Nuruzzaman assesses Iqbal as a poet with a message of universal brotherhood, whose poetry appeals to all men irrespective of their racial backgrounds.

Prof. A. A. M. Azizullah draws attention to the fact that while Iqbal was deeply influenced by his study of European philosophy his faith in the superiority of Islam was never shaken by any Western doctrine.

Advocate Abdul Jalil gives an analytical review of Iqbal's Pas Che Bayad Ai Aqwam-i-Sharq and states that his message, to the nations of the East has lost none of its relevance.

Mr. Muhammad Sakhi Mian stresses the importance of the crusade that Iqbal waged against paganism on Indian soil and thus saved the Muslim community from the false lure of pagan culture.

Miss Kanis Batul of Dacca University discusses the evolution of Muslim political thought from Sir Syed Ahmad to Iqbal.

Mr. A. B. M. Salehuddin writes on Iqbal and the Islamic concept of Ijtihad whose potential as a key to the emancipation of the Muslim world from the dead-weight of medaeval thought the poet emphasised in all he wrote. This has now begun to bear fruit in recent economic developments in Muslim countries, especially in the Middle East.

Syed Nasrul Ahasn in his brief essay pleads for a balanced view of Iqbal as a writer and thinker who combined great originality with faith in tradition. Iqbal did not reject science or modern philosophy, but he held that to lead a harmonious life man must also have faith in those eternal verities which religion upholds.

Mr. Abul Hussain and Mr. Talim Hussain, two of the most important living poets in Bangladesh today have answered questions on Iqbal and explained how and in what circumstances, in spite of their inadequate lcnowledge of Urdu, they came under the spell of Iqbal. They both discuss the wider issue of Iqbal's influence on modern Bengali poetry and how Iqbal, who is read in Muslim Bengal mainly in translation, supplied something which was not found in traditional Bengali poetry. Abul Hussain, recognised by many as the leading modern Bengali poet, pays a particular tribute to Iqbal for reviving and strengthening the tradition of the long poem, philosophical or descriptive, which has practically died in Bengali.

আল্লামা ইকবাল সংসদ

১৯৮৬–১৯৮৯

আবদুল ওয়াহিদ

যে-কোন সংগঠনের ন্যূনতম হলেও ইতিহাস থাকে। আল্লামা ইকবাল সংসদের মাত্র চারটি বছরের পরিসমাপ্তি হতে চললেও এ ক'বছর ধীর, অবিরাম চলার মধ্যেও এর পাতায় স্থান পেয়েছে ইতিহাস। এ পর্যায়ে চার বছরের সমুদয় তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সময়-সুযোগে সঠিক সত্য তথ্য পাঠক সমক্ষে তুলে ধরার ইচ্ছা রইলো।

১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে নির্ভীক সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় জনাব সৈয়দ তোসারফ আলী ইকবাল চর্চার নব-উদ্যোগের নিমিত্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া চালু করার ব্যাপারে এ লেখককে বলার পর শূন্য হাতে '৮৬ সালের ১৯ মার্চ রাতে লেখক এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল হোসেন তোসারফ সাহেবের বাসায় বসে সংসদ ও লাইব্রেরীর সাংগঠনিক কাঠামোর প্রাথমিক ভিত্তি লিপিবদ্ধ করি। এই হিসেবে এটা বলাই সঙ্গতঃ যে, তোসারফ সাহেব সংসদের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক ও উপদেষ্টা, এর পর তাঁর এবং মিসেস তোসারফের বিভিন্ন অবদান সংসদ এবং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে দুই সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ছিলেন ইসমাইল হোসেন এবং সেক্রেটারী লেখক স্বয়ং। এ সময়ের মধ্যে অনেকেই এসেছেন, আবার চলেও গেছেন। এর ফিরিস্তি মোটামুটি দীর্ঘই বলা চলে। তবে, প্রথম থেকেই সাথে রয়েছে বর্তমান অফিস সম্পাদক সহপাঠী মোজাম্মেলুল হক। বর্তমানে সংসদ যে পর্যায়ে রয়েছে এটা আশার কথা। এর জন্য বর্তমানে সংসদের হাল ধারণকারী দেশের প্রথম সারির শিক্ষাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সবার এই পর্যায়ে কারো নাম উল্লেখ না করে এটাই বলতে চাই যে, সংগঠনের গতি সঞ্চারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণে তাঁরা কায়িক পরিশ্রম, গঠনমূলক উপদেশ, আর্থিক সাহায্য এবং বিভিন্ন সময় তাঁদের বাসায় সংসদের অফিস এবং "ইকবাল স্মৃতি পাঠাগার" পরে "আল্লামা ইকবাল লাইব্রেরী" রাখার ব্যবস্থা করেছেন—তার জন্য অবশ্যই সংসদের ইতিহাসে তাঁদের অবদান লিপিবদ্ধ থাকবে। এ বিবরণ দীর্ঘ না করে চার বছরে সংসদ জাতীয় পর্যায়ে ইকবালের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে যে ক'টি সভা-সেমিনার এবং ৯টি প্রকাশনাসহ (প্রায় আটশ' পৃষ্ঠা), লাইব্রেরীতে ইকবাল ও ইসলামের উপর প্রায় দু'হাজার বই-পুস্তক, স্মরণিকা, সংকলন ও ম্যাগাজিন একত্রিত করেছে—দেশের লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিদ্যানুরাগীসহ সকল স্তরের অনেককেই ইকবাল চর্চার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ পর্যায়ে অনুষ্ঠানগুলোর উপর দেশের জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাসমূহে যে-সব রিপোর্ট বের হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের নিরিখে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবোঃ

ইকবাল দিবস, মে ১৯৮৬

মহাকবি আল্লামা ইকবালের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আল্লামা ইকবাল সংসদ ও ইসলামীসাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকার যৌথ উদ্যোগে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে (রোববার, ৪ মে, ১৯৮৬) এক আলোচনা সভা

সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রিন্সিপাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান।

আল্লামা ইকবালের কাব্যভাবনা, দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তার বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, সংসদ উপদেষ্টা, বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ তোসারফ আলী, বিশিষ্ট লেখক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মাওলানা মুহীউদ্দীন খান প্রমুখ।

ডঃ আবু সাঈদ নুরুদ্দীন ইকবালের দার্শনিক চিন্তার মূল কথা 'খূদী' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আত্ম-চেতনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে তিনি ইকবালের অবদান ব্যাখ্যা করেন। খূদী সম্পর্কে অন্যান্যের অপব্যাখ্যার জবাব দেন। গ্রীক দর্শন ও ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদী বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে ইকবালের খূদী দর্শনের স্বাতন্ত্র্যও তুলেধরেন।

সৈয়দ তোসারফ আলী বলেন, ইকবালের নাম যে-দেশে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে মুছে ফেলা হয়েছে, সে-দেশে ইকবাল চর্চা যে কতো কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘদিনের বিস্মৃতির পর ইকবালের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠান একটি মহৎ ও সাহসী প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, ইকবালের মতো মহৎ কবি ও দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনা কোনো দেশ বা কালে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। ইকবাল মূলতঃ মিল্লাতের (মুসলিম ভ্রাতৃত্বের) কবি। তাঁর কাব্যে কবিতা ও ইসলাম একাকার হয়ে মিশে আছে; যেমন রবীন্দ্র কাব্যে রামায়ণ-মহাভারত, রুশ কবি মায়াকোভস্কির কাব্যে একাকার হয়ে গ্যাছে কবিতা ও কমিউনিজম।

তিনি আরও বলেন, ইকবাল নবী শ্রেষ্ঠ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন বলেই ইসলামের মর্মকথা তাঁর পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিলো। ইকবাল নিজে আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন বলেই আত্মপরিচয় বিস্মৃত মুসলিম সমাজকে, অনাথ-দুঃখী এবং ভুখা মানুষকে জাগ্রত করার ব্যাপারে এক বিপ্লবী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেন, ইকবাল চর্চা আমাদের চেতনাকে শাণিত করবে, সঠিক পথের দিশা দেবে।

মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহীউদ্দীন খান বলেন, ইকবাল চর্চা দেশে-বিদেশে হচ্ছে। তাঁর নাম ভুলিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। চিন্তার জগতে ইকবাল যে অবদান রেখেছেন তার কোনো তুলনা হয় না। তিনি ইকবালের একাত্মবাদী ধ্যান-ধারণার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। হেজাযের ওহাবী আন্দোলন, ইরানের বাহাই আন্দোলন এবং তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক সূচিত সংস্কার আন্দোলনের প্রতি ইকবালের সমর্থন দানের ব্যাপারে আলোচনা সভায় উথাপিত প্রশ্নেরও তিনিজবাবদেন।

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেন, ইকবাল ইতিহাসের বাস্তব প্রয়োজনে উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বলকান যুদ্ধের পর মধ্য-এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল যথা উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তাসখন্দ প্রভৃতি এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠী বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিজরত করতে শুরু করলো। তাদের পুনর্বাসন সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। এই পটভূমিতে ইকবাল একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম স্বপ্ন দেখেন। চৌধুরী রহমত আলী পরবর্তীকালে যার নামকরণ করেন। তিনি ইকবালকে ইসলামের কবি, মুসলমানের কবি, মেহনতি মানুষের কবি বলে উল্লেখ করেন।

প্রফেসর আবদুল মান্নান বলেন, আমি এই অনুষ্ঠানে এসেছি তরুণদের উৎসাহিত করতে। ইকবালের মতো কবি এবং দার্শনিকের মহৎ চিন্তা-ভাবনা আজকের দিনের হতাশাগ্রস্ত যুবক-তরুণদের মনে আশার আলো সঞ্চার করতে পারে। তিনি বলেন, মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সঞ্চার করেছে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ইকবালের মতো কবি ও দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনা অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি গঠনে ইকবালের দার্শনিক চিন্তার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানান। সাধ্যনুযায়ী ইকবালের ব্যাপারে যে কোন সাহায্যে তাঁর সহযোগিতার তিনি দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেন।

সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, বাংলা ভাষায় ইকবালের দর্শন কিংবা ইসলামের দর্শন ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পরিভাষার সমস্যা রয়েছে। নবুয়াত, রেসালাত, ইলহাম ইত্যাদি শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনি ব্যাখ্যা করার মতো বাংলা শব্দ খুঁজে পাওয়া ভার।

তিনি ইকবাল চর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন, ইকবালের খুদী দর্শন সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে মুসলমানদের পক্ষে হারানো গৌরব ফিরে পাওয়া কঠিন কিছু নয়। ইকবাল ইসলামী চিন্তার আলোকে মানব জাতির সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ করে গেছেন।

অনুষ্ঠানে সমাগত সুধীমন্ডলীকে স্বাগত জানিয়ে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালক জনাব লুৎফুল হক ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আল্লামা ইকবাল সংসদের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অর্গানাইজার জনাব হোসেন মাহমুদ। আপ্যায়নের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তিঘটে।

এ উপলক্ষে *"ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও"* শিরোনামে সংসদ ১৬ পৃষ্ঠার একটি স্মরণিকা বের করে।

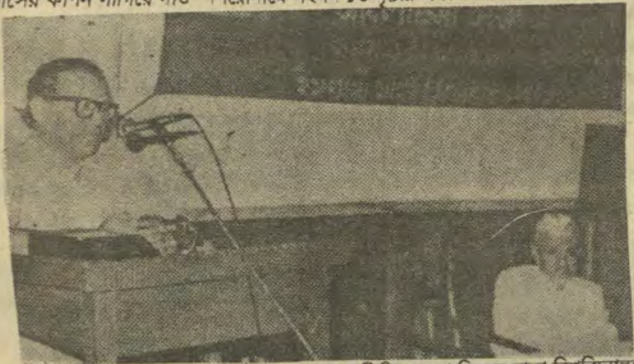

৪৮–তম মৃত্যুবার্ষিকী, '৮৬–তে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

মাওলানা মুহীউদ্দীন খান

ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস

সংসদ প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক সৈয়দ তোসারফ আলী

ইকবাল দিবস, ৯ নবেম্বর, ১৯৮৬

গত ৯ নবেম্বর, রোববার (১৯৮৬) বিকেল ৪টায় টিএসসিতে আল্লামা ইকবাল সংসদ মহাকবি আল্লামা ইকবালের ১০৯-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে নির্ধারিত সভাপতি জনাব সানাউল্লাহ নূরীর বৃষ্টিজনিত কারণে আসতে বিলম্ব হওয়ায় স্বল্প সময় সভাপতিত্ব করেন সংসদ উপদেষ্টা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব আ, ন, ম, রইছউদ্দিন। (প্রধান অতিথি জনাব সৈয়দ আলী আহসান সভায় আসেননি)।

আল্লামা ইকবাল সংসদ সভাপতি জনাব মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল ওয়াহিদ তাঁর স্বাগত ভাষণে আল্লামা ইকবালের ব্যাপারে নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এদেশের কবি, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি দল-মত-নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক আবু তালিব, সংসদ-এর প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক ও উপদেষ্টা নির্ভীক সাংবাদিক সৈয়দ তোসারফ আলী, আল মুজাহিদী, শামসুজ্জামান ও পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলর জনাব সরফরাজ আহমদ খান।

বক্তারা মহাকবির জীবনালেখ্য তুলে ধরে বলেন, আমরা ইকবালকে ভুলে গেছি। এতে তাঁর কিছু যায় আসে না। ক্ষতির ভাগটা আমাদের। কারণ, ইকবাল কোন দেশের কবি নন, তিনি মানুষের কবি, জীবনের কবি। যদিও আমরা বলে থাকি, ইকবাল পাকিস্তানের কবি। কিন্তু মহাকবি ইকবাল তাঁর আশপাশের মানুষের প্রতি মানুষের উৎপীড়ন আর অনাচারকে রোধ করে মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। ইকবালকে আমরা কিছুতেই ভুলে থাকতে পারি না। বক্তারা বলেন, ইকবাল এমন এক কবি ছিলেন, যিনি জীবনকে ও জগতকে বদলাবার জন্যে নিজেকে তৈরী করেছিলেন। দুনিয়ার দর্শনকে অধ্যয়ন করে তিনি দেখেছেন পাশ্চাত্যের দর্শন একটি ঝরে যাওয়া বৃক্ষ শাখা। তাই, তিনি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মজলুমের মুক্তির দিশা খুঁজে পেয়েছেন।

আল্লামা ইকবাল স্মরণে উক্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলরগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ক্বারী মোহাম্মদ আবদুল কাদের। অ্যাগত অতিথিদের আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এ উপলক্ষে *"জবাব"* নামে ৮০ পৃষ্ঠার একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

ইকবাল দিবস, ২১ এপ্রিল, ১৯৮৭

আল্লামা ইকবাল সংসদ (মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল, ১৯৮৭) জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। অধ্যক্ষ দেওয়ান মোঃ আজরফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কবি আল মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সারগর্ভ আলোচনা করেন ডঃ আ, ন, ম, রইছ উদ্দিন, পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলর জনাব সরফরাজ আহমদ খান, এডভোকেট সৈয়দ সিরাজুল হুদা, সৈয়দ তোসারফ আলী, হাফেজ এ, টি, এম, হেমায়েত উদ্দীন ও মোঃ নূরুল ইসলাম।

প্রবীণ দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সভাপতির ভাষণে আবেগজড়িত কণ্ঠে ইকবাল একাডেমী পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, মর্দে মুমিনদের রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হবে তা ইকবাল তাঁর সাহিত্য-কর্মে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন পুঁজিবাদ, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, সমাজবাদ প্রভৃতি মতাদর্শে মানুষের মুক্তি নেই। পশ্চিমা জগতে মানবিক মূল্যবোধের অভাব তাঁকে আলোড়িত ও কাব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমাদের দেশে ইকবাল চর্চার জন্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ভারতীয় কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম কবিতায় 'ইনকিলাব' যা বিপ্লব শব্দ প্রয়োগ করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মক্কায় ইসলামের জন্ম, মদীনায় বিকাশ, দামেশকে বিকৃতি ও বাগদাদে বিনাশ ঘটে।

কবি আল মাহমুদ বলেন, যারা বাংলাদেশে ইকবালকে স্মরণ করে না, তারা সংকীর্ণমনা। যারা অজ্ঞতাবশতঃ ষড়যন্ত্র করে ইকবালের মত বড় কবিকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, তারা ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃত কবিরা এভাবেই বিজয়ী হন।

ডঃ রইসউদ্দিন বলেন, রেনেসাঁর কবি ইকবাল মুসলমানকে ইসলামের বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দর্শনের আলোচনা করা সব দেশেই শান্তির স্বার্থে প্রয়োজন। অন্তরের পরিশুদ্ধি ছাড়া শুধু আইনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা।

জনাব সরফরাজ আহমদ বলেন, ইকবালের বাণী বিশ্ব মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী। তিনি জীবনের সব দিক নিয়ে লিখেছেন।

সৈয়দ তোসারফ আলী বলেন, ইকবাল ইসলামের গতানুগতিক ব্যাখ্যা করেননি। তাঁকে উপেক্ষা করে এ যুগে ইসলামকে উপলব্ধি করা যাবে না। তিনি একমাত্র দার্শনিক যিনি তাঁর যুগের সব দর্শনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। সৈয়দ সিরাজুল হুদা বলেন, ইকবাল আমাদের ঐতিহ্য, ভবিষ্যৎ ও রক্তের সাথে জড়িত। তাঁর চেয়ে অনেক কম মানবদরদী কবিকেও আমরা অনেক বেশী জাঁকজমকের সাথে স্মরণ করি।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংসদ সদস্য জনাব ছালেহ আহমাদ।

অভ্যাগত অতিথিদের আপ্যায়নের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। এ উপলক্ষে "অনুভব" নামে ৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত স্মরণিকা বের করা হয়।

মহাকবি ইকবালের ৪৯-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র মিলনায়তনে সংসদ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন সংসদ উপদেষ্টা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ উপবিষ্ট (ডান থেকে) সংসদ উপদেষ্টা ডঃ আ. ন. ম. রইস উদ্দিন প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ ও সংসদ প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক সৈয়দ তোসারফআলী

ইকবাল দিবস, ৯ নবেম্বর, ১৯৮৭

গতকাল (বৃহস্পতিবার, ৯ নবেম্বর, ১৯৮৭) আল্লামা ইকবালের ১১০-তম জন্মবার্ষিকীতে আয়োজিত আলোচনা সভার সুধীবৃন্দ ইসলামের যুগোপযোগী বিশ্লেষণ, উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রাম এবং জাতীয় জাগরণের

লক্ষ্যে নতুন ধারায় অবিস্মরণীয় কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে এই মনীষীর অনন্য অবদানকে স্মরণ করে তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও দর্শন-চিন্তার ওপর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গবেষণা করার আহবান জানিয়েছেন।

ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে আল্লামা ইকবাল সংসদ আয়োজিত এ সমাবেশে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সভাপতিত্ব করেন। কবির জীবনের ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন কবি আল মাহমুদ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, ডঃ আ, ন, ম, রইসউদ্দিন, পাকিস্তান দূতাবাসের মিনিস্টার জনাব মাহবুব আলী খান ও প্রেস কাউন্সিলর জনাব আফতাব আহমদ সিদ্দিকী, ইরান দূতাবাসের সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আলী গারজিদাদ, মাওলানা রূহুল আমীন খান, এডভোকেট সৈয়দ সিরাজুল হুদা, সৈয়দ তোসারফ আলী ও অধ্যাপক এ, এফ, এম হোসাইন আহমদ। ধন্যবাদ জানান জাফর আহমদ ভূঁইয়া।

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ বলেন, ইকবাল চেয়েছিলেন শুধু পৈতৃক সূত্রে মুসলিম না হয়ে আমরা যেন মননের মাধ্যমেও মুসলিম হতে পারি। ইসলামের আলোকে ব্যক্তিসত্তায় বলিষ্ঠ চেতনা সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

কবি আল মাহমুদ বলেন, ইকবাল কবি হিসেবে ছিলেন অসম্ভব ক্ষমতাশালী। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্যে তাঁর কাছে আমরা ঋণী। ইকবালের ন্যায় মহান মানবিক কবি আধুনিক জগতে অপরিহার্য।

অধ্যাপক শাহেদ আলী বলেন, পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী আমাদের উপর উর্দূ ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় আমরা উর্দূকে বিসর্জন দিতে গিয়ে ইকবালের কাব্য সম্পদ হারিয়ে নিজেদের যে ক্ষতি করেছি, তা অপরিমেয়। রবীন্দ্রনাথ তার মৃত্যুকে জগতের জন্যে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। যে যুগে শিল্পের খাতিরে শিল্পচর্চা চলত, তখন ইকবাল শিল্পের সাধনা করেছেন মানুষের মুক্তির জন্যে।
ডঃ রইসউদ্দিন বলেন, ইকবাল শুধু মুসলমানের নয়, গোটা মানব জাতির কবি। কারণ, তাঁর জীবনাদর্শ ইসলাম কেবল মুসলমানের জন্যে আসেনি। তাঁর সাহিত্য দেশ, কাল ও জাতির উর্ধ্বে বিশ্বশান্তি কামনায় নিবেদিত।

পাকিস্তান দূতাবাসের মিনিস্টার জনাব মাহবুব আলী খান ইকবাল কাব্য ও দর্শন অনুধাবনের আবেদন জানান।

একই দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর জনাব আফতাব আহমদ সিদ্দিকী মুসলিম রেনেসাঁয় ইকবালের ভূমিকা স্মরণ করে বলেন, ইসলামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তিনি জাতির ভবিষ্যতের স্বার্থে দিকনির্দেশনা দিতে চেয়েছেন। সাহিত্যে তার ছাপ অনবদ্য।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরান দূতাবাসের সেক্রেটারী জনাব আলী গারজিদাদ বলেন, সারা বিশ্বে বিশেষতঃ উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনে এক চিরন্তন প্রেরণা শক্তির নাম ইকবাল। জাতীয়তাবাদ নয়, ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদ ছিল তাঁর আদর্শ। এ দূরদর্শী দার্শনিক উপলব্ধি করেছিলেন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সভ্যতা মজলুমের মুক্তির পথ নয়।

দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা রূহুল আমীন খান কবি স্মরণে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং বক্তৃতায় বলেন, ইকবাল বিশ্বাস করতেন তৌহিদী জোশ থাকলে মুসলমানকে কেউ পদানত করতে পারবে না।

যুগপৎ পশ্চিমা গণতন্ত্র ও কমিউনিজমের ত্রুটি সুস্পষ্ট নির্দেশ করার জন্য ইকবালের প্রশংসা করে বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ তোসারফ আলী বলেন, 'পাকিস্তান নেই বলে ইকবালের দরকার নেই'- একথা মনে করা ভুল। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে উপেক্ষা করে আমরা সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছি।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব নাজমুল কালাম ছিদ্দিকী। এ উপলক্ষে "*অধিকার*" নামে ১৪৪ পৃষ্ঠার সংকলন ও একটি ফ্রিফোল্ডার প্রকাশ করা হয়।

"মাওলানা আবদুর রহীম স্মরণে"

প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রবীণ রাজনীতিক, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অনুবাদ রাজ্যের রাজা "মাওলানা আবদুর রহীম স্মরণে" শিরোণামে আল্লামা ইকবাল সংসদ ১৯২ পৃষ্ঠাসম্বলিত একটি অনন্যসাধারণ

সংকলন প্রকাশ করে। সংকলনটির প্রকাশনা উপলক্ষে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। । ৭ মার্চ (১৯৮৮) বিকেল ৫টায় ৪৪, পুরানা পল্টনস্থ আইআরটিএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি এ, কে, এম, বাকের।

আলোচনায় অংশ নেন–সর্বজনাব অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক আখতার ফারূক, মাওলানা আবদুল মান্নান খান, নূর মোহাম্মদ আকন, ব্যারিষ্টার কোরবান আলী, অধ্যাপক এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ, মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, আলহাজ জমির আলী, কাজী আবু হোরায়রা, অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, মাওলানা সাইফউদ্দীন ইয়াহইয়া ও মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্র তারেক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন সংসদ–এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা ছালেহ আহমাদ।

বক্তাগণ মাওলানার কালজয়ী সৃজনশীল কর্মের উপর দীর্ঘ আলোচনায় বলেন, এ–দেশের তথা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক কল্যাণে মাওলানার যে অবদান তার জন্য জীবিত মাওলানার চাইতে মৃত মাওলানার মূল্যায়ন হবে অনেক বেশী। তাঁর উপর অব্যাহত গবেষণার জন্য একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রতি সভায় সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে জাষ্টিজ বাকের বলেন, মাওলানার লেখা ও অনূদিত প্রায় ১৫০ খানা বই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। এদশের তথাকথিত প্রগতিশীল তরুণদের ইসলামী জ্ঞানার্জন প্রায় তিরোহিত, তাদের জন্য আজ মাওলানার লেখা ও আদর্শ দিশারী হিসাবে কাজ করবে। তিনি মাওলানার কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের উপর গবেষণার নিমিত্ত ঢাঃ বিঃ–এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে একটি বৃত্তি চালুর মাধ্যমে মাওলানার উপর গবেষণা করার আহবান জানান।

সভাপতির ভাষণে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, এদেশে মাওলানার তুলনা মাওলানা নিজেই। আরবী শিক্ষিতের মধ্যে যে ক'জন বাংলাভাষায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তন্মধ্যে মাওলানা ছিলেন অন্যতম। তিনি একদিকে লেখনী, অন্যদিকে সাংগঠনিক কর্মকান্ড চালিয়ে গেছেন। আমৃত্যু তিনি তাঁর কাজে ব্রতী ছিলেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সংসদের দ্বিতয়ী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

"আল্লামা ইকবাল সংসদ"–এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে (১৯ মার্চ, ১৯৮৮) ৪৪, পুরানা পল্টনস্থ আইআরটিএ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংসদ–এর উপদেষ্টামন্ডলী, কার্যকরী পরিষদ, সদস্যবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংসদ–এর সভাপতি অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলর, সংসদ–এর উপদেষ্টা ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। আলোচনায় অংশ নেন উপদেষ্টা অধ্যক্ষ খোন্দকার আতাউর রহমান, অধ্যাপক শাহেদ আলী, ডঃ আবু সাইদ নূরুদ্দীন। শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে এডভোকেট এ. এম. এম. আবদুল জলীল, আফতাব আহমদ ছিদ্দিকী ও অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

সংসদ–এর সহ–সভাপতি ডঃ আ. ন. ম. রইসউদ্দিনের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি সংসদ–এর সাথে সংসদ সেক্রেটারি জনাব আবদুল ওয়াহিদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সংযোগ–এর কথা উপস্থাপন করে ইকবালকে বিশ্বজনীনতার কবি হিসেবে আখ্যা দিয়ে জাতিদনামার সংক্ষিপ্ত সার আলোকপাত করলে স্বাভাবিকভাবেই ইকবালের প্রতি উপস্থিত তরুণদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, টাকা পয়সার জন্য কোনদিন কাজ বন্ধ হয়ে থাকে না। প্রয়োজন ইখলাছ এবং অবিরাম কাজ–এর। তিনি বলেন, উৎসর্গীকৃত দু'একজন লোকই একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজ চালিয়েনিতেপারেন।

সংসদ–এর কার্যধারার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, সংসদ–এর আর্থিক সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত পত্রিকা ষান্মাসিক চলতে পারে। সামর্থ্য হলে ত্রৈমাসিক গবেষণায় নিয়ে আসা যেতে পারে। তিনি মাসিক পত্রিকার ব্যাপারে বলেন, আমাদের দেশে এ ধরনের লেখক অতিনগণ্য যিনি যথাসময়ে গঠনমূলক লেখা দিতে পারেন। তিনি উর্দু এবং ফারসী

শিখানোর জন্য সংসদ-এর পক্ষ থেকে একটি ইনষ্টিটিউট-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, তরুণরা যে কাজের সূচনা করেছে, তাকে এগিয়ে নেওয়াই হবে আজকের প্রেক্ষাপটে সচেতন মাত্রেরই দায়িত্ব।

সভাপতির ভাষণে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, ইকবালকে ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু, তা সম্ভব নয়। ইকবাল তাঁর সমহিমায় ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তিনি সংসদ-এর জন্য স্থায়ী জায়গাসহ দীনতা দূরীকরণের নিমিত্ত ফান্ডের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংসদ সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ। মিষ্টি আপ্যায়নের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ইকবাল দিবস ২১ এপ্রিল, ১৯৮৮

গত ২১ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, ১৯৮৮ বিকেল ৪টায় আল্লামা ইকবালের ৫০-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে আল্লামা ইকবাল সংসদ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও কবি প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, ইকবালের একটি রাজনৈতিক পরিচয় আছে। তবে, তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি সব সময় দুস্থ মানবতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

আবহাওয়াজনিত কারণে সংসদ সভাপতি আসতে বিলম্ব হওয়ায় সৈয়দ আবদুস সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, জনাব আবদুল মোহাইমেন ও তাহের সিদ্দিকীপ্রমুখ।

জন্মবার্ষিকী '৮৮-তে আয়োজিত সভার পর ইফতার পার্টির একাংশ

সৈয়দ আলী আহসান বলেন, রাজনৈতিক কারণে একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ও কবির কর্মকান্ডকে আলোচনার বাইরে রেখে জাতিকে তার শিক্ষা ও অবদান থেকে বঞ্চিত করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। তিনি বলেন, আল্লামা ইকবাল পাকিস্তান অথবা উর্দূ ও ফার্সী ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। যারা সত্যকে জানতে চান তাদের জন্য ইকবালের মধ্যে অনুকরণীয় শিক্ষা রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, ইকবালের মূল শিক্ষা ছিল কোন ব্যক্তির উচিৎ আগে নিজেকে জানা এবং নিজেকে সত্যবাদী মনে করা। তিনি ইকবালের সমুদয় লেখার অনুবাদ এবং এর উপর গবেষণায় এগিয়ে আসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আল্লামা ইকবালের দর্শন ব্যাখ্যা করে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ইকবাল চর্চায় এগিয়ে আসার আহবান জানান।

জনাব আবদুল মোহাইমেন বলেন, আমরা পাকিস্তান বর্জন করেছি, কিন্তু তাই বলে ইকবালকে বর্জন করিনি। ইকবালের নাম মুছে ফেলার প্রয়াস আমাদের হীনমন্যতার পরিচায়ক।

জনাব আবদুস সুলতান সভাতির বক্তৃতায় বলেন, দীর্ঘদিন এদেশে ইকবাল চর্চার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইকবাল চর্চার উদ্যোগ ও এতে তরুণদের উপস্থিতি আশার সঞ্চার করেছে।

ইফতার পার্টির মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব নাজমূল কালাম ছিদ্দিকী।

এ উপলক্ষে ৮০ পৃষ্ঠাসম্বলিত '*আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা* " প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

ইকবাল দিবস, ৯ নবেম্বর, ১৯৮৮

মহাকবি আল্লামা ইকবাল স্মরণে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, আল্লামা ইকবাল ছিলেন এক বিরাট ইনস্টিটিউট। তাঁর দর্শন ছিল সার্বজনীন। মানব জাতির মঙ্গলের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য ইকবালের দর্শন গ্রহণ করতে হবে। গত ৯ নবেম্বর, বুধবার, ১৯৮৮ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' "বিশ্বজনীনতার কবি ইকবাল" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। সংসদের সহ-সভাপতি ডঃ আ. ন. ম. রইসউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী, রাবেতা ও ইবনেসীনা এবং বাংলাদেশ সৌদী আরব ভ্রাতৃ মৈত্রী সমিতির সভাপতি জনাব এডভোকেট মুজিবুর রহমান। প্রবন্ধ পাঠ করেন সংসদ উদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ খোন্দকার আতাউর রহমান। তাঁর প্রবন্ধে তিনি অনবদ্য উপমা-উৎপ্রেক্ষার দ্বারা ইকবাল যে বিশ্বজনীন কবি-দার্শনিক তা-ই উপস্থাপন করেছেন। আলোচনা করেন পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলর জনাব আফতাব আহমদ সিদ্দিকী, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ জনাব মোবারক হোসেন খান, জনাব সৈয়দ তোসারফ আলী, ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, অধ্যাপক এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ ও এডভোকেট বজলুর রহমান। ইকবালের কবিতা আবৃত্তি করেন জিয়াউল হক।

জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, তৌহিদী দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন আল্লামা ইকবাল। তাই, আল্লামা ইকবালের দর্শন সার্বজনীন। ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দেখেছেন ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই, তিনি এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আহবান জানিয়েছেন ইসলামের আন্তর্জাতিক সাম্য গ্রহণের জন্য। ইসলাম হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্মদাতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা জন্ম দিয়েছে মুসোলিনী, হিটলারের মত একনায়ক। তিনি বলেন, আল্লামা ইকবালের দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর যদি ভারত বিভক্ত না হতো তাহলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তিনি আরো বলেন, মানব জাতির মঙ্গলের জন্য, দেশের মানুষের মংগলের জন্য আল্লামা ইকবালের দর্শন গ্রহণ করতে হবে।

জনাব আফতাব আহমদ সিদ্দিকী বলেন, আল্লামা ইকবাল ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রকৃত ভক্ত প্রেমিক। তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য চেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানরা এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অস্থির পৃথিবীর পরিবর্তনআনতেপারে।

জনাব মোবারক হোসেন খান বলেন, ইকবাল মুসলিম কবি হয়েও বিশ্বকবি। তিনি ইসলামকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং সেই বিশ্বাসকে তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছেন।

সৈয়দ তোসারফ আলী বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ইকবালকে দেশ-বিশেষের কবি হিসেবে আবদ্ধ করার অপচেষ্টা হয়েছিল। ইকবাল হলের নাম মুছে ফেলে আমরা আল্লামা ইকবালকে ছোট করতে পারিনি। বিশ্বের নিকট আমাদের ছোট মনের পরিচয় দিয়েছি। তিনি ইকবাল একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়বে।

সভাপতির বক্তৃতায় ডঃ আ. ন. ম. রইসউদ্দিন ইকবাল একাডেমী পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ইকবাল চর্চার জন্য স্থায়ী জায়গা বরাদ্দের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংসদের অফিস সেক্রেটারী জনাব মঞ্জুর-ই-ইলাহী।

এ উপলক্ষে ৪৮ পৃষ্ঠাসম্বলিত "*আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা*" ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

ইকবাল দিবস, এপ্রিল ১৯৮৯

আল্লামা ইকবালের ৫১-তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রমিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে পহেলা জুন, ১৯৮৯ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায়। সংসদ সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন।

ইকবালের কালজয়ী আবেদনের উপর সারগর্ভ আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, প্রফেসর শামসুল হক শাইদায়ী, এডভোকেট এ, এম, এম, আবদুল জলীল, মোহাম্মাদ নূরুল

৫১–তম মৃত্যুবার্ষিকীতে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন সংসদ উপদেষ্টা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ডানে সংসদ উপদেষ্টা এডভোকেট মুজীবুর রহমান, বামে সংসদ সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

ইসলাম, অধ্যাপক এ, এফ, এম, হোসাইন আহমদ, সৈয়দ তোসারফ আলী ও সাখি মিঞা।

প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব সাজ্জাদ হোসায়েন ইকবালের কবিতার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে বিশ্বের অন্যান্য কবি সাহিত্যিকের সাথে তাঁর সাযুজ্য ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ইকবালের বাণীর তাৎপর্য সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক বিশ্বসমাজের, যার মধ্যে মানবসভ্যতার সমস্ত মহত্তম আদর্শের প্রতিফলন থাকবে। আর এ আদর্শের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ইসলামের মধ্যে। তিনি মুসলিম দর্শন ও ইতিহাসের পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু, এ পর্যালোচনার মধ্যে কোন সংকীর্ণতা নেই। ইকবালের মধ্যে ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা নেই। তিনি ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে বিশ্ব সভ্যতার বিচারের ব্যাকরণ আবিষ্কার করেছেন।

বক্তাগণ বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন পড়ে ইকবালের মধ্যে এক অর্থপূর্ণ সমন্বয় সৃষ্টি হয়েছিল, যা তাঁকে এক বিশ্ব ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের উপর ভিত্তি করে যে–সব পাশ্চাত্য দেশ চলছিল ইকবাল সে–সব দেশের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলেছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেদের ড্যাগারে নিজেরা আত্মহত্যা করবে। বক্তাগণ আরো বলেন, একজন দার্শনিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইকবাল বেঁচে থাক বা না থাক, একজন কবি হিসেবে তিনি সব সময় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ডঃ আবদুল্যাহ পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে ইকবালকে বাংলাদেশের শত্রু হিসেবে তুলে ধরার অপপ্রয়াসের কথা উল্লেখ করে বলেন, ১৯৩৭ সালে ইকবাল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "উত্তর–পশ্চিম ভারতের যেমন স্বাধীনতা পাওয়ার অধিকার আছে তেমনি স্বাধীনতা লাভের অধিকার রয়েছে বাংলাদেশের মুসলমানদের"– মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণার জন্য আমরা সত্যিই ইকবালের কাছে ঋণী।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংসদ সদস্য সৈয়দ নসরুল আহসান।

এ উপলক্ষে ১৪৮ পৃষ্ঠার ইংরেজী সংখ্যা "***ইকবাল স্টাডিজ***" প্রকাশ করা হয়।

ইকবাল দিবস, ৯ নবেম্বর, ১৯৮৯

গত ৯ নবেম্বর, ১৯৮৯ বৃহস্পতিবার মহাকবি আল্লামা ইকবালের ১১২-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় হোটেল প্রীতমের কনফারেন্স কক্ষে আল্লামা ইকবাল সংসদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সুধীবৃন্দ বলেন, ইকবাল ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পাশাপাশি ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করার জন্য তার ক্ষুরধার কলমকে ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তি সত্তার জাগরণ ইকবাল দর্শনের অন্যতম দিক।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংসদের সভাপতি অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি রুহুল ইসলাম। আলোচনায় অংশগ্রহণ

১১২-তম জন্মবার্ষিকীতে বাম থেকে সংসদ সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রধান অতিথি বিচারপতি রুহুল ইসলাম ও আলোচকবৃন্দ

ইকবালের ১১২-তম জন্মবার্ষিকীতে সংসদ আয়োজিত হোটেল প্রীতমের কনফারেন্স কক্ষে আলোচনা সভার একাংশ

করেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী, রাবেতা ও ইবনে সীনার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ-সৌদী আরব ভ্রাতৃ মৈত্রী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মুজিবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ, কিউ, এম, ফজলুল ওয়াহিদ, সংসদের উপদেষ্টা শাহ্ আবদুল হান্নান, পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলর সরফরাজ আহমদ খান, দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক জনাব হাসান ইকবাল, সংসদের উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম, সংসদ সহ-সভাপতি অধ্যাপক এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ ও সৈয়দ তোসারফ আলী।

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, মহাকবি ইকবাল একজন খাঁটি মুমিনের মিশন নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন। তিনি শুধু পাকিস্তান কিংবা মুসলমানদের কবি নন বিশ্ব কবি। ইনসানে কামেল সৃষ্টি ছিল তাঁর লেখনীর উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন, ভারতে কখনোই একটি জাতি ছিল না, এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবতা। আজ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা কিংবা অন্য যা-ই বলা হোক না কেন, এ সত্যতা অস্বীকার করা যাবে না।

বিচারপতি রুহুল ইসলাম বলেন, সংখ্যগরিষ্ঠ হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের একটি রাষ্ট্রে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, যত শিক্ষিতই হোক না কেন হিন্দুরা গোঁড়ামী মুক্ত হতে পারবে না। এই উপলব্ধি থেকেই ইকবাল দ্বি-জাতিতত্ত্ব চিন্তা করেন। তবে, একাত্তরের পূর্বে যে পাকিস্তান ছিল ইকবাল সেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেননি। তিনি নতুন জেনারেশনের কাছে ইকবালের দর্শনকে তুলে ধরার আহবান জানান। এডভোকেট মুজিবুর রহমান বলেন, ইকবাল বুঝেছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল উদারভিত্তিক, এই দর্শনের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ইকবাল রবীন্দ্রনাথের মত স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হতে চাননি। তিনি ব্যক্তিত্বকে উন্নত করে স্রষ্টার কাছেপৌঁছাতেচেয়েছেন।

অধ্যাপক ওয়াহিদ ইকবালকে এক ক্ষণজন্মা প্রতিভা হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, তাঁর চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রাচ্য প্রতিচ্যের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদের পশ্চাদমুখী ও পলায়নপর মনোভাব দূর করতে তিনি সচেষ্ট হন। মুসলিম মানসকে জাগ্রত করাই ছিল ইকবালের কাব্য চর্চার উদ্দেশ্য।

শাহ আবদুল হান্নান বলেন, ইকবালের সবচেয়ে বড় অবদান ইসলামী চিন্তা ও দর্শনের পুনর্গঠন। বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যতার অসারত্ব প্রমাণ করে ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে তিনি সফল হন। তিনি বলেন, ইকবালের মত একজন বিরাট দার্শনিককে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ইকবালের নামে নামকরণের প্রস্তাব করেন। জনাব সরফরাজ আহমদ খান বলেন, ইকবালের দর্শন শুধু তার সময় কিংবা বর্তমানের জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্যও প্রযোজ্য। তিনি ইসলাম ও কোরআনের বুনিয়াদী বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

জনাব হাসান ইকবাল বলেন, ইকবালের 'খুদী' দর্শনের মূলকথা ব্যক্তি সত্তার জাগরণ।

সংসদ উপদেষ্টা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল ইসলাম বলেন, ইকবালের মত যারা জাতিকে জাগ্রত করেছেন, নতুন জেনারেশনের কাছ থেকে তাদের চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে সুপরিকল্পিতভাবে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংসদ প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক ও উপদেষ্টা জনাব সৈয়দ তোসারফ আলী।

উপস্থিত সকলকে আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। ইকবালের একটি উর্দু গজল পরিবেশন করেন এ কি উ এম, বাহালুল করীম।

[উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত সংসদের প্রকাশনার এবং সম্পাদনার দায়িত্ব এই লেখক পালন করেছে, ইংরেজী সংখ্যা ছাড়া। বর্তমানে সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি রয়েছে।]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সমালোচনাঃ মোজ্জাম্মেলুল হক

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

রচনাঃ আল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

প্রকাশকঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

পৃষ্ঠাঃ ৫১

মূল্যঃ ৯ টাকা

আল মাহমুদ। একজন বড় কবি। এই সে দিনও তিনি ছিলেন কম্যুনিষ্ট। মহান রাব্বুল আলামীন যে একমাত্র প্রভু, যার শরীক নেই মেনে, সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সম্ভবত পাপ, তাপ, দুঃখ, বিষাদ ভরা বাস্তব ছলনাময়ী নাট্যালয়ে এসে আল মাহমুদ আড্ডায় পড়ে তা ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু, তা বেশী দিনের জন্য নয়। তাগুতি জিঞ্জির তাঁকে বেশী দিন আবদ্ধ রাখতে পারেনি।

সন্ধ্যা তারা, অষ্টাদশী রূপালী চাঁদ, প্রত্যুষে পূর্বাকাশে নবোদিত লাল টুক টুকে অরুণ রবি–সবই অবলোকন করলেন আল মাহমুদও। না জানি, তিনিও একে একে সব গ্রহ–নক্ষত্রকে প্রভু মেনে নিয়ে ভুল করছিলেন। কিন্তু না– তিনি সে ভুল করেননি; বরং, অকুণ্ঠ চিত্তে তিনিও বলে উঠেছেন *"ইন্নিঅজ্জাহ্‌তু অজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন"।*

হ্যাঁ, মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'য়ালা আল মাহমুদকে সময়ের দাবীতেই সম্ভবত সাচ্চা মুসলমান হবার তাওফীক দিয়েছেন। প্রগতিবাদীদের দাঁত ভাঙা জবাব দেবার জন্যেই হয়তো আল্লাহ তা'য়ালার এই হেকমত। তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান। সময়ের তাকিদে, ইতিহাসের প্রয়োজনে তিনি সবকিছুই করে থাকেন। তাই তো আল মাহমুদের পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন তথাকথিত প্রগতি পূজারীদেরজন্যচপেটাঘাত।

সাচ্চা মুসলমান আল মাহমুদ এবার আর নিজকে ফাঁকি দেননি, জাতির সাথে গাদ্দারী করেননি, দু'হাতে লিখে যাচ্ছেন সমকালীন চাহিদার দাবীতে। কবি, প্রাবন্ধিক, আলোচক, সমালোচক, গল্পকার, অনুবাদক এ মৌলিক কবির জন্য সময়টা কারো কারো দৃষ্টিতে প্রতিকূল। মূলতঃ এটা যে সর্বৈব মিথ্যা তা–ই প্রমাণিত হলো আল মাহমুদের সাম্প্রতিক রচিত ও প্রকাশিত শিশু সাহিত্য–"মহানবী হযরত মুহাম্মদ *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম"* শীর্ষক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মূর্ত প্রতীক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর জীবন চরিত ছোটদের জন্য রচনার দ্বারা। তিনি কেয়ার করেননি, তোয়াক্কা করেননি কারো–

আর না করার কারণও হয়তো নিহিত থাকবে। আল মাহমুদ জীবনের সোনালী দিনগুলোর বেশীর ভাগ কাটিয়েছেন সম্ভবতঃ অবহেলায়। তাই তিনি এটাই সঙ্গতঃ মনে করেছেন যে, শিশুদের জীবন স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায়। তাদের বাল্যাবস্থা হতে যদি গড়ে তোলা যায় তাহলেই সম্ভব একটি আদর্শ জাতি গঠন। সেহেতু, তিনি শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী করে সহজ সরল ভাষায়, সচ্ছন্দ বাচনভঙ্গি, উপমা-উৎপ্রেক্ষার দ্বারা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পুণ্যময় জীবনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন। পনেরটি অনুচ্ছেদে স্বাভাবিক শব্দ উচ্চারণ করার উপযুক্ত যে-কোন শিশুই ৫১ পৃষ্ঠাসম্বলিত আলোচ্য নবী চরিতখানা যে পড়ে ফেলতে সমর্থ হবে এতে সন্দেহ নেই। ছোট অথচ সুন্দর, সাবলীল এই ঝকঝকে নবী চরিতখানা রচনা করায় আল মাহমুদ যে এদেশের শিশুদের প্রাণের চাইতে বেশী ভালবাসেন তা-ই প্রতিভাত হয়েছে। তিনি চান না, তাঁর মতো গড্ডালিকা প্রবাহে কোন শিশু-কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা গা ভাসিয়ে অমূল্য সময়ের খানিকটাও নষ্ট করুক। তাই তো তিনি গাইড লাইন দেয়ার চেষ্টা করেছেন এই নবী চরিতের মাধ্যমে। সাহিত্যাঙ্গনে আল মাহমুদের অবদান অনস্বীকার্য, শিশু সাহিত্যের ভান্ডারে আল মাহমুদের এ অবদান তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। দীর্ঘজীবী হোন আল মাহমুদ, বড়দের জন্য নবী চরিত রচনার তাওফীক আল্লাহ তাঁকে দান করুন-এ-ই কামনা করি।

ফররুখ আহমদ

সমালোচনাঃ শরীফুল মুজাহিদ

ফররুখআহমদ

রচনাঃ আবদুলমান্নানসৈয়দ

প্রথম প্রকাশঃ ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

প্রকাশকঃ বাংলা একাডেমী

পৃষ্ঠাঃ ১১৮

মূল্য ঃ ১৫ টাকা, দেড় মার্কিন ডলার,

"সম্ভবত প্রকরণগত নিষ্ঠার জন্যে ষাটের দশকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবদুল মান্নান সৈয়দ। যেমন গদ্যে, তেমন কবিতায়। শিল্প তার কাছে শুদ্ধ এবং পবিত্র। অতএব, ভাষা, যা কি-না অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়, তার বিবেচনায় অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। মান্নান ক্রমাগত ভাষার বিন্যাস বদল করেন, শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে দেখেন। উৎসারিত ধ্বনিকে কতোটুকু কাজে লাগাবেন-তা যাচাই করে নেন। উপরন্তু বাংলাদেশে পরাবাস্তব চেতনা, শামসুর রাহমানের কবিতায় মাঝে মধ্যে ঝলকে উঠলেও, মান্নান সৈয়দের সাথে অভিন্ন বলেই চিহ্নিত, অবশ্য কখনো কখনো তিনি উজ্জ্বল আলোকিত বাস্তবে ফিরে আসেন- এবং তখন যতোটুকু দেখেন ততোটুকুই অনুবাদ করেন অপরূপ চিত্রকল্পে, তার পর হয়তো আবার ফিরে যান কোন ধূসর বাড়িতে যার কাছাকাছি জলাশয়ে কালো দিন আর লাল রাত ভর খেলা করে'লালনীলমাছ'।"

কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কয়েকটি পত্রিকার একই সাথে সম্পাদক-আবদুল মান্নান সৈয়দ

সম্পর্কে কথাগুলো লিখে গ্যাছেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। মান্নান সৈয়দ সম্পর্কে এ কোটেশনের পর আমরা আর কিছু সংযোজন না করলেও এটাই বলতে হবে যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে মান্নান সৈয়দ আর আর কবি–সাহিত্যিকের চাইতে একটু ভিন্ন ধাঁচে কাজ করে যাচ্ছেন, কিছুটা নিরিবিলিতে। যখন অন্যবিধ অগ্রজ, অনুজ সাম্প্রদায়িক শ্লোগানে আদাজল খেয়ে পড়ছেন, ঠিক তখনই মান্নান সৈয়দ আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে রেনেসাঁস বিরোধীদের সমালোচনা করে যাচ্ছেন অকুতো ভয়ে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ–এই তো ১৯৮৮ সালে আমাদের মৌলিক কবি (কারো ভাষায় সাম্প্রদায়িক) ইসলামী রেনেসাঁস আন্দোলনের পুরোধা, নকীব–ফররুখ আহমদ সম্পর্কে রচনা করেছেন ১১৮ পৃষ্ঠাসম্বলিত একখানা ছোট অথচ তথ্যবহুল, মনোরম, ছিমছাম জীবনী গ্রন্থ। নয়টি শিরোনামের এ গ্রন্থখানা যে–কেউ এক নিমিষে পড়ার মতআকর্ষণীয়।

গ্রন্থখানায় যে শিরোনাম পত্রস্থ হয়েছে সেগুলো হলোঃ ১. *জন্ম ও বংশ পরিচয়(৯)* ২. *শিক্ষা জীবন, সংসার জীবন (১০)* ৩. *কর্ম জীবন (১৩)* ৪. *সাহিত্য জীবন (১৬)* ৫. *শেষ জীবন ও মৃত্যু (৩৭)* ৬. *রচনা পরিচিতি (৩৮)*, ৭. *সমকালীন প্রতিক্রিয়া (৭৩)*, ৮. *জীবন দর্শন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য (১০০)*, ৯. *রচনারনিদর্শন(১০১)।*

ফররুখের জন্ম ও বংশ পরিচয় উপস্থাপন করেছেন এভাবেঃঃ 'ফররুখ আহমদের জন্ম ১০ই জুন, ১৯১৮ সালে। জন্মস্থান যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার মাঝআইল গ্রাম। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হাতেম আলী, মাতা বেগম রওশন আখতার, দাদা সৈয়দ আব্বাস আলী।"

গ্রন্থকার বক্ষমান গ্রন্থে তথ্যবহুল উপমা–উৎপ্রেক্ষার উপস্থাপনা উপহার দিয়েছেন, সাথে সাথে প্রমাণস্বরূপ তথ্য নির্দেশও দিয়ে গ্যাছেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ফররুখ আহমদের বেতন সংক্রান্ত ঝামেলার পরিপ্রেক্ষিতে আহমদ ছাপার তীব্র তীক্ষ্ণ রিপোর্ট ফররুখের চাকরিতে পুনর্বহাল হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে। রিপোর্টের অংশবিশেষ গ্রন্থকার উপস্থাপন করেছেন নিম্নরূপঃ

আমরা কবি ফররুখ আহমদকে বাঁচাবার জন্যে, তাঁর পরিবারকে বাঁচাবার জন্যে 'ফররুখ আহমদ সাহায্য তহবিল' গঠন করতে কবির অনুরাগীজন এবং দেশপ্রেমিক ও সংস্কৃতি প্রেমিক জনগণের কাছে আবেদন রাখছি।"

এতে বোঝা যাচ্ছে ফররুখের জীবনে কিভাবে একের পর এক নেমে এসেছে মানব সৃষ্ট জাহেলিয়ার অমানিশা–আর তিনি তাঁর একমাত্র একনিষ্ঠতা, স্পষ্টবাদিতা ও আপোষহীনতার দ্বারাই তাগুতি শক্তিকে পদদলিত করে না খেয়ে, উপোস করে বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য যে মসীর জিহাদ করে গ্যাছেন আজ তার অনুসৃতির নিতান্ত সময় আমাদের দ্বারপ্রান্তে।

মান্নান সৈয়দ ফররুখ আহমদের কতিপয় চরিত্র–বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ *"ফররুখ আহমদ*

অনমনীয় ও নিরাপোষ, আদর্শবাদী, তোষামোদবিমুখ, সত্যবাদী, স্পষ্টবাদী, নির্লোভ, অবৈষয়িক, উদার, অতিথিবৎসল, আত্মপ্রত্যয়ী ও আনন্দময় ছিলেন।"

ফররুখের জীবন দর্শন ও সাহিত্য-বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যায় মান্নান সৈয়দ মতামত ব্যক্ত করেছেনঃ "....ফররুখ আহমদও এমন একটি পৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন যা অন্য সব কাব্য পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একক নিজস্ব আত্মক্রীড় স্বয়ংসম্পূর্ণ!.......নজরুল ইসলাম নন-ফররুখ আহমদই প্রথম আপাদমস্তক ইসলামী কবি, তার সাক্ষ্য দেবে তাঁর অসংখ্য কবিতাই নয়, এমনকি তাঁর গদ্য রচনাও। .....ফররুখ গদ্য লিখেছিলেন দু'জন কবিকে নিয়ে, ইকবাল ও নজরুলকে নিয়ে। মুসলমান কবি হিসাবেই এঁদের তিনি বিবেচনায় এনেছিলেন। তাঁর সমস্ত গদ্য রচনার কেন্দ্রে দেখা যাবে ইসলাম চিন্তা। ইকবাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ইকবালের কবিতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে-পৃথিবীর কাব্য ভান্ডারে ইকবাল যে বিশিষ্ট জাগরণের বাণী বয়ে এনেছেন তা সকল দেশ ও সকল কালের উপযোগী । হলেও আদর্শচ্যুত পরাধীন মুসলমান সমাজের জন্যই তার প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশী। .....ফররুখের গদ্য রচনার উপযুক্ত সারাংস থেকে এই তথ্য বেরিয়ে আসে যে, তিনি ইসলামকেই তাঁর কবিতার আত্মায় পরিণত করবেন, আর সে-ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্যে আত্মবিলোপ করতেও রাজি। ফররুখ তা-ই করেছিলেন। ....বস্তুত ব্যক্তিকে বা আত্মাকে সরিয়ে রেখে তিনি জাতিগত বেদনা ও আকাঙ্খার পরিচয়ই উথাপন করতে চেয়েছিলেন এবং এদিক থেকে তিনি এক একক পৃথিবী নির্মাতা.....ফররুখ আহমদ যে অজস্র ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন দুই হাতে, স্বনামে ও অজস্র ছদ্মনামে, তার পেছনে আছে জ্বলন্ত ক্রোধ। আদর্শবাদীর উজ্জ্বল ক্রোধ। .....ঐ ক্রোধ অবশ্য ক্ষতিও করেছিলো কবিতার-যেমন করেছিলো রোমান্টিক কবি অজিত দত্তকে। ফররুখ আহমদকেও করেছিল, প্রত্যেক কবি যুক্ত। তার অতীত ও বর্তমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগে, ফররুখ আহমদ তাঁর পূর্বজ মাইকেল, নজরুল, মোহিতলাল, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-র সঙ্গে যুক্ত। এই যুক্ততা ঠিক প্রত্যক্ষভাবে নয়-অনুরণনে। তার সমকালীন চল্লিশের কবি সংঘের সংগে ফররুখ যুক্ত, এই যুক্ততা কারো হাওয়ার যুক্ততা, ফররুখ আহমদ আবহমান বাংলা কবিতার সঙ্গে যুক্ত। যেমন যুক্ত প্রত্যেক বাঙালীকবি"।।

এখানে এসেই মান্নান সৈয়দ ফররুখ সম্বন্ধে তার অনিন্দ্যসুন্দর প্রয়াসের যবনিকা ঘটান।

যে আদর্শবাদী কবির লাশ দাফন করার মতো জায়গা ছিলো না, এদেশের মাটিতে যে কবি জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত ধুকে ধুকে মরেছেন, যে কবি মানবতার কথা বলায়, রেনেসাঁসের কথা বলায়, আদর্শের কথা বলায় 'সাম্প্রদায়িক' বলে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর নিকট অভিহিত হয়েছেন- সে কবির প্রতি স্বল্পপরিসরে অথচ তথ্যপূর্ণ মান্নান সৈয়দের আমরা বলবো কর্তব্য পালন সমগ্র জাতির প৯ থেকে আপাতত সফল প্রয়াস বৈকি। দেউলিয়া অপসংস্কৃতির করালগ্রাসে গ্রাসিত সমাজে সচেতন ব্যক্তিত্বের বড়ই অভাব। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে মান্নান সৈয়দের কলম আ-রো দৃঢ় হোক। এ-ই প্রত্যাশা করছি।

GIFT

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY.
Acc. No. 30997
LAHORE.

B 1 (4)

IQBAL ACADEMY PAKISTAN LAHORE
Acc. No......

বাহুতে তোমার নেইকো শক্তি হৃদয়ে নেইকো ঈমান-দীপ,
রসূলের ভালে পরায়েছ তুমি কলঙ্কময় কালিমা-টিপ,
মূর্তি-সূদন নেই কেহ আর, আছে তো কেবল মূর্তিকার,
বুত-বিক্রেতা আজর সেজেছে ইব্রাহীমের বংশধর
নূতন পাত্র মদ্য নূতন অভিনব সব দেখি যে আজ,
নূতন কতনা রচিয়াছ কা'বা, নূতন তোমার ভূষণ সাজ।

****

বুদ্ধি তোমার কঠিন বর্ম, প্রেম সে তীক্ষ্ণ কৃপান খান,
হে মোর প্রেমিক, খেলাফত তব বিশ্ব বিজয়ী অমর প্রাণ
আল্লা ব্যতীত সব কিছু লাগি তকবীর তব অগ্নিবান,
চেষ্টাই হবে ভাগ্য তোমার হও যদি তুমি মুসলমান।
হলে অনুসারী মুহম্মদের আমি হব চির সহায় তোর,
এ ধরণী সে তো তুচ্ছ জিনিস, 'লওহ' 'কলম' সকলি তোর।
আল্লামা ইকবালঃ মনীরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত

20/E 3

00030997